সংগীত বিচিত্রা

নারায়ণ চৌধুরী

সা হি ত্য লো ক
৩২/৭ বি ড ন স্ট্রী ট । ক লি কা তা ৬

প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১৩৬৭ । ডিসেম্বর ১৯৬০

প্রকাশক : শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ
সাহিত্যলোক । ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট । কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদ : অমিয় ভট্টাচার্য

মুদ্রক : শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিণ্টার্স । ৫৭এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন । কলিকাতা

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের

স্মরণে

গ্রন্থকারের নিবেদন

'সংগীত বিচিত্রা' প্রকাশিত হলো। এই গ্রন্থে ভারতীয় সংগীতের মূল আদর্শটিকে পৃষ্ঠভূমিতে রেখে বাংলা গানের বিভিন্ন শ্রেণী, গীতিকার ও সুরকার ভেদে গানের প্রকারভেদ, সুরের প্রকাশবৈশিষ্ট্য ও গায়নশৈলী প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। বাংলার জাতীয় সংগীত কীর্তন, শাক্ত সংগীত, প্রাচীন বাংলা গান, রবীন্দ্রসংগীত, কান্তকবি রজনীকান্ত ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গান, অতুলপ্রসাদের গান, নজরুলগীতি, আধুনিক বাংলা গান, রাগপ্রধান, সিনেমার গান, কোরাস ও গণসংগীত ইত্যাকার বাংলা গান সম্বন্ধীয় প্রায় সর্ববিষয়ের সমীক্ষণের দ্বারা গ্রন্থের কলেবর পুষ্ট করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। গ্রন্থের উপসংহার ভাগে ও পরিশিষ্টে কয়েকটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে লোকসংগীতের উপর বিশেষ মনোযোগ আরোপ করা হয়েছে এবং সেই সূত্রে মতভেদজনিত কিছু বিতর্কেরও অবতারণা করা হয়েছে। এমনতর বাদানুবাদের মধ্য দিয়ে পাঠকের স্বাধীন চিন্তাকে উদ্রিক্ত ও উদ্দীপিত করাই লেখকের উদ্দেশ্য।

আজ থেকে তিরিশ বছরেরও অধিককাল পূর্বে প্রকাশিত মদীয় 'সংগীত-পরিক্রমা' গ্রন্থে সম্পূর্ণ নূতন এক দৃষ্টিকোণের আলোকে রবীন্দ্রসংগীতের সুরভঙ্গী ও গায়নরীতি পুনর্বিচারের প্রসঙ্গের উত্থাপন করেছিলাম। তাতে তৎকালে সাংগীতিক মহলে যথেষ্ট আলোচনা-সমালোচনার সূত্রপাত হয়। সমালোচনা কখনও-কখনও বিরুদ্ধতায়ও পর্যবসিত হয়েছে। কিন্তু আমি আমার অবস্থান থেকে বিচ্যুত হইনি। বরং বয়োবৃদ্ধি ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে আমার এই সংক্রান্ত পূর্বমত আরও সুদৃঢ় হয়েছে। এই গ্রন্থে পাঠক রবীন্দ্রসংগীত সম্বন্ধে একাধিক প্রবন্ধ ও প্রাসঙ্গিক পর্যালোচনা সন্নিবিষ্ট দেখতে পাবেন। ওই রচনাগুলিতে আমার পূর্ব-প্রচারিত মত ও ধারণাকে যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সাহায্যে আরও বেশী বিশদীকৃত ও ঘাতসহ করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। পাঠকগণ নিজ নিজ রুচি প্রবণতা ও পছন্দ অনুযায়ী আমার বক্তব্য গ্রহণও করতে পারেন আবার অগ্রহণও করতে পারেন, এমনকি মতটি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেও আমার দুঃখবোধ করবার কারণ নেই। কেননা রবীন্দ্রসংগীত

সম্পর্কে একটা গতানুগতিবর্জিত নূতন মতের উপস্থাপনাই আমার অভিপ্রায়। এই উপস্থাপনার দ্বারা পাঠকবর্গের মধ্যে যদি সামান্য পরিমাণেও পুনর্ভাবনার সূচনা হয় তাহলেই আমার উদ্দেশ্য সার্থক।

রবীন্দ্রসংগীতের আলোচনার অনুষঙ্গে এ বইটিকে 'সংগীত-পরিক্রমা' গ্রন্থের সম্প্রসারক ও পরিপূরক জ্ঞান করলে অন্যায় হয় না। দুটি বই মিলে আমার এতদ্বিষয়ক ধ্যান-ধারণার বৃত্তটি পূর্ণ হয়েছে বলে মনে করি।

বইখানা আমি উৎসর্গ করেছি ভারতবিশ্রুত সংগীতকোবিদ্‌ ও যন্ত্রী ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে। আধুনিক কালে ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে এতবড় দুরূহের সাধক ও তথাকথিত 'সহজিয়া' তন্ত্রের বিরোধী সংগীতনায়ক বোধহয় আর কেউ ছিলেন না। খাঁ সাহেবের সেই কঠিনের পথে নিয়ত-অভিযানকারী অশ্রান্ত-অনলস সুরস্রষ্টার তপস্বী মূর্তির প্রতি আমার শ্রদ্ধাবিনম্র চিত্তের প্রণাম নিবেদন করবার আকুতি থেকেই এই উৎসর্গায়ণের জন্ম।

বইটির প্রকাশে 'সাহিত্যলোক'-এর উদ্যমী প্রকাশক শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ যথেষ্ট যত্ন ও শ্রম স্বীকার করেছেন। গভসাহিত্য-আশ্রিত সৎগ্রন্থপ্রচারণাকে তিনি নিছক ব্যবসায়িক প্রয়াসের মধ্যেই সীমিত রাখেননি, তাকে একটা নিষ্ঠা হিসাবেও গ্রহণ করেছেন। তাঁর এই আদর্শের উত্তরোত্তর সিদ্ধি ও সাফল্য কামনা করি।

নিবেদন শেষ করবার আগে একটি মারাত্মক ভুলের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ১৬৮ পৃষ্ঠায় 'কীর্তন'-এর আলোচনা প্রসঙ্গে লেখা ও ছাপা হয়েছে—'দুঃখহরণ চক্রবর্তী ও সম্প্রদায়'; হবে 'দুঃখভঞ্জন সান্যাল ও সম্প্রদায়'। এটা মুদ্রণপ্রমাদ নয়, আমারই বার্ধক্যজনিত স্মৃতিভ্রংশতার কারণে এমনতর বিভ্রাট ঘটতে পেরেছে। পাঠক যথাস্থানে ভুলটির সংশোধন করে নেবেন। এই অমার্জনীয় ভুলের জন্য আমি আন্তরিক লজ্জিত ও দুঃখিত।

নারায়ণ চৌধুরী

সূচীপত্র

পরিশিষ্ট

লেখকের অন্যান্য বই

সংগীত : সংগীত পরিক্রমা। রাগসংগীত ও লোকসংগীত। বাঙালীর গীতচর্চা। কাজী নজরুলের গান। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ও অন্যান্য। অজয়-গীতি সংগ্রহ।

সাহিত্য : লেখক, পাঠক ও সমাজ। লিও টলস্টয় : জীবন ও সাহিত্য। সমাজ-প্রবাহে সাহিত্য। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য মূল্যায়ন। বরণীয় লেখক, স্মরণীয় সৃষ্টি। সাহিত্য : দেশী ও বিদেশী। সাহিত্য-ভাবনা (নব পর্যায়)। সুকান্তের কথা। ইত্যাদি

ভারতীয় সংগীতের মূল আদর্শ

ভারতীয় সংগীতের মূল আদর্শ কী—এই প্রশ্নের যদি এক কথায় উত্তর দিতে হয় তো বলতে হয়, স্বরই হলো ভারতীয় সংগীতের মূল ভিত্তি বা আদর্শ। 'স্বর' কথাটার ইংরেজী প্রতিশব্দ হিসাবে আমরা ব্যবহার করতে পারি 'মেলডি'। এই স্বর বা মেলডিকে ঘিরেই ভারতীয় সংগীতের বিরাট-বিশাল আয়তন গড়ে উঠেছে। ওই আয়তন বা ইমারত বহুকক্ষবিশিষ্ট হতে পারে, থাকতে পারে তাতে নানা অলিন্দ বা বারান্দা বা পার্শ্বপথ, তার চূড়ায় বা শীর্ষদেশে তাবৎ বৈচিত্র্য ও বহুলতার সামঞ্জস্য ঘটিয়ে স্বর প্রায় ওঙ্কারধ্বনির মত একটিমাত্র অক্ষর-বিশিষ্ট ধ্বনিতে পর্যবসিত হতে পারে ; কিন্তু তার ভিত্তিগাত্রে মূলাশ্রয় হিসাবে যে স্বরসৌন্দর্য বা স্বরমাধুর্য থাকতেই হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কি যন্ত্রসংগীত কি কণ্ঠসংগীত—এই দ্বিবিধপ্রকার সংগীতেই যে স্বরকে বুনিয়াদী অবলম্বন রূপে গ্রহণ করে, ভারতীয় সংগীতের প্রাকার খাড়া করে তুলতে হবে, সে-কথা আলোচনার সূত্রপাতেই সকল প্রকার বক্তব্যের প্রারম্ভ-বিন্দু রূপে দাঁড় করিয়ে আলোচনায় অগ্রসর হওয়া ভাল।

যদি বলেন স্বর তো সব সংগীতেরই মূল ভিত্তি ; কি দেশী কি বিদেশী, কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্ত্য, কি প্রাচীন কি আধুনিক—সব ধরনের সংগীতেই তো স্বর ছাড়া এক পা এগোবার উপায় নেই ; তবে আর বিশেষ করে ভারতীয় সংগীতের বেলায় 'স্বর' কথাটার উপর এতটা জোর দেওয়ার কারণ কী ? কারণ অবশ্যই আছে, আর সেই কারণটি বিশ্লেষণ করে বোঝাবার জন্যই এই নিবন্ধের অবতারণা।

ভারতীয় সংগীতের অনুষঙ্গে 'স্বর' কথাটাকে একটা বিশেষ তাৎপর্যে অবধারণ করতে হবে। বলা যেতে পারে ভারতীয় সংগীতে স্বর একটা বিশেষ গুণগত অর্থে ব্যবহৃত। ভারতীয় সংগীতের স্বর উপকরণরিক্ত, আভরণবর্জিত, শান্তরসাস্পদ, বিশুদ্ধ। ওর ধারণার মধ্যে একটা ধ্যানগম্ভীর প্রশান্তির ভাব নিহিত আছে। স্থির-ধীর-অচঞ্চল তার মূর্তিরূপ। ভারতীয় সংগীতের ঐতিহাসিকেরা বলেন, বৈদিক যুগের সাম গানের ত্রিস্বর থেকে ভারতীয় সংগীতের উৎপত্তি (স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রমুখ)। এ কথা যদি সত্য হয় (সত্য

না হওয়ার কোন হেতু দেখা যায় না), তাহলে ভারতীয় সংগীতের মূলীভূত শান্তরসের একটা বস্তুগত ভিত্তি আপনা থেকেই মিলে যায়, কেননা প্রার্থনার স্তোত্রধ্বনি থেকে যে-সংগীতের উদ্ভব, তার রস আত্মসমাহিত, প্রশান্ত, গভীর-গম্ভীর হবে, সে তো একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধের মতই ধরে নেওয়া যায়।

এই ত্রিস্বর বিশিষ্ট সংগীত পরে অবশ্য একাধিক বিবর্তনের ধাপ বেয়ে সপ্তস্বর ও বাইশ শ্রুতির বৈচিত্র্য সমন্বিত রাগসংগীতে পরিণত হয়, কিন্তু তার অভ্যুদয়কালীন যে-বৈশিষ্ট্যে তার গোত্র পরিচয়—শান্তরসাস্পদতা—তা কিন্তু তার বিকাশ ও বৃদ্ধির কালেও তাকে ছেড়ে যায় না, একটা অপরিবর্তনীয় কৌলিক জন্মচিহ্নের মতই ভারতীয় সংগীতের দেহের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে থাকে। ভারতীয় নিবন্ধ সংগীত, প্রবন্ধ সংগীত, ধ্রুপদ, খেয়াল—উচ্চাঙ্গ ভারতীয় সংগীতের যতগুলি রূপের বিষয়ে আমরা জানি বা প্রত্যক্ষত পরিচিত আছি, দেখা যায় তার প্রত্যেকটিরই বুনিয়াদী রস হলো শান্ত রস—অধীর বা অস্থির স্বরচাঞ্চল্যে তার পরিচয় নয়। এই যে ভারতীয় সংগীতের প্রথাবদ্ধ আলোচকেরা স্বরের স্থির গম্ভীর ভাব বোঝাবার জন্য 'নাদব্রহ্ম' নামক একটি শব্দের প্রায়শঃ প্রয়োগ করেন, সেটির ধর্মীয় পৃষ্ঠপট আমরা মানি বা না মানি—এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, ভারতীয় সংগীতের মৌলিক প্রকৃতি পরিস্ফুট করে তোলবার জন্য 'নাদ' কথাটির চেয়ে সমধিক উপযুক্ত শব্দ আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। ভারতীয় সংগীতের স্বর আসলে এই নাদ-এর প্রতিরূপক। যখন কোন সংগীত-সভাগৃহে কোনও প্রসিদ্ধ কলাবিদ্ যন্ত্র বা কণ্ঠসংগীত পরিবেশন করেন, তখন একমাত্র সংগীতের অনুরণন ভিন্ন পরিপূর্ণ নিস্তব্ধ গৃহে আর কোন শব্দধ্বনি শ্রুত হয় না। সেই অবস্থায় মন্ত্রমুগ্ধবৎ শ্রোতার সচরাচর যে-অনুভব হয়, তা হলো পারিপার্শ্বিক আবহের সঙ্গে পরিবেশিত স্বরের সম্পূর্ণ মিলে যাওয়া, লীন হয়ে যাওয়া। চতুষ্পার্শ্বস্থিত আবেষ্টনীর অন্তর্নিহিত স্তব্ধতার সঙ্গে স্বরের এই যে একাত্মতা, একীভবন—এরই অন্য নাম 'নাদব্রহ্ম'।

নাদ দুই প্রকারের—অনাহত নাদ ও আহত নাদ। স্বর যখন শূন্যমণ্ডলের বায়ুতরঙ্গে অস্পৃষ্ট ও অগোচর রূপে ভেসে বেড়ায়, তখন তাকে বলে অনাহত নাদ। অনন্ত 'ইথার' তরঙ্গে এই স্বর সর্বদাই পরিব্যাপ্ত কিন্তু পরিব্যক্ত নয়। পরিব্যক্ত হয় তখন যখন বায়ুতরঙ্গে কোন কিছুর আঘাত এসে লাগে। আর সেই আঘাতের দ্বারা উৎপন্ন নাদ বা ধ্বনিকেই বলে আহত নাদ। কিন্তু তখন-

তখুনি তা সুরে রূপান্তরিত হয় না। সুরসৃষ্টির অপরিহার্য প্রাথমিক শর্ত হলো স্বরসংগতি অর্থাৎ উৎপন্ন স্বরগুলির ভিতর সামঞ্জস্য। এই সামঞ্জস্যকে ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করা যায় না, তাকে অনুভব করা যায় মাত্র। অনুভব করা যায় আরও সুষ্ঠুভাবে যখন বিপরীতের পিঠে তাকে স্থাপন করা যায়। স্বরের সমষ্টি মাত্রই সুর নয়, স্বরের সুসমঞ্জস ঐক্যই হলো সুর। যেমন, কণ্ঠ থেকে কোন কিছু উদ্‌গত হলেই তা সুর হয় না, কণ্ঠোত্থিত স্বর বা স্বর সমষ্টির ভিতর যখন দুর্জ্ঞেয় এক ছন্দ বা পরিমিতি বোধ প্রবেশ করে, তখনই কেবল সুরের জন্ম হয়। স্বরের কোলাহল আর স্বরের সংযমবদ্ধ রূপের ভিতর অনেক তফাৎ।

ভারতীয় সংগীতে স্বরসংগতি বা স্বরের ঐক্যের আদর্শ তার চূড়ান্ত উৎকর্ষের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সুরকে কত বিশুদ্ধ বা পবিত্রতম রূপে প্রকাশ করা যায়, তার বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা এদেশে হয়েছে যুগ থেকে যুগে। সংগীততাত্ত্বিকরা শিল্পকলাসমূহের ভিতর সংগীতকে সবচেয়ে 'অ্যাবস্ট্রাক্ট' বা বিমূর্ত শিল্পরূপে অভিহিত করেন। 'বিমূর্ত', কারণ সংগীতের রূপায়ণে সবচেয়ে স্বল্প উপকরণের প্রয়োজন হয়, কোনরূপ আয়োজন বা আনুষঙ্গিকের সাহায্য ছাড়াই সুরকে মূর্ত করে তোলা যায়। অন্যান্য শিল্পগুলির ক্ষেত্রে সংগীতের এই বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত। সুর ফোটাবার জন্য একটা সাদামাঠা যন্ত্র কিংবা খোলা কণ্ঠই (কণ্ঠও একপ্রকার যন্ত্র) যথেষ্ট, আর কিছুর দরকার হয় না। এমনকি কণ্ঠসংগীতের বেলায় বাণী বা কথার প্রয়োজনও অতিশয় গৌণ, কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারেই অবাস্তব। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতে পদের গৌরব খুবই সীমিত, সুরই সেখানে স্বমহিমায় স্বরাট্।

ত্রিস্বর বিশিষ্ট বৈদিক সংগীত ধীরে ধীরে স্বরসংখ্যাবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে সপ্তস্বরে গিয়ে দাঁড়ালো। প্রথমে চার স্বর, তার পরে পাঁচ স্বর, তার পর ছয় স্বর এই ভাবে বেড়ে সাতের কোঠায় উত্তীর্ণ হতে স্বরগ্রাম একটা পূর্ণ পরিণতি পেলো এবং এক আদর্শস্থানীয় (স্ট্যাণ্ডার্ড) স্বরসপ্তকের (অক্টেভ) জন্ম হলো। বিদেশী মতে সা থেকে আরেক সা পর্যন্ত স্বরের সংখ্যা আটটিই হয়, সুতরাং পাশ্চাত্ত্য সংগীতে 'সেপ্টেট' এর বদলে 'অক্টেভ' কথাটিরই সমধিক চলন, কিন্তু ভারতীয় সংগীতে এভাবে স্বর গণনা করা হয় না। এখানে তারার সা থেকে আরেকটি সপ্তকের আরম্ভ, অন্যপক্ষে খাদ বা উদারায় অন্য একটি সপ্তকের অবস্থিতি যার আরম্ভ সা তে ও শেষ নি তে। মধ্যবর্তী মুদারার সপ্তকটিই হলো আসল গ্রাম

বা স্কেল, যা সচরাচর ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। পণ্ডিতদের মতে তিন স্বর থেকে ভারতীয় সংগীতের সপ্তস্বরে পরিণতি লাভ করতে কমপক্ষে এক হাজার বছর লেগেছিল। ডবল্যু, ডবল্যু হাণ্টার মনে করেন পাণিনির আবির্ভাবের (খৃঃ পূঃ ৩২০) আগেই ভারতীয় সংগীত সপ্তস্বরে সুগঠিত হয়ে গিয়েছিল ও তার বিচিত্র বিকাশ ঘটেছিল।

ইতোমধ্যে আর একটি ব্যাপার সংঘটিত হয়, যার ফল ভারতীয় সংগীতের কাঠামোর নিয়ন্ত্রণে ও রূপান্তর সাধনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল। সেটি হলো এই, সপ্তস্বরে পরিণত হবার কালে ভারতীয় সংগীত দুটি সুস্পষ্ট ভাগে ভাগ হয়ে যায়—মার্গ সংগীত ও দেশী সংগীত। মার্গ সংগীত চিরায়ত সংগীতের স্বগোত্র, অন্যপক্ষে দেশী সংগীত আঞ্চলিক বা লৌকিক সংগীতের সঙ্গে জ্ঞাতিত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ। আজকের দিনের সাংগীতিক পরিভাষায় যদি এ দুটি কথাকে প্রকাশ করতে হয় তবে বলতে হয়—রাগসংগীত ও লোকসংগীত। প্রকৃতপক্ষে এ দুটি ধারাই হলো ভারতীয় সংগীতের মূল ধারা এবং তাদের ভিতর পারস্পরিক আদান-প্রদানের সম্পর্ক সেই খ্রীস্টপূর্ব প্রাচীন ইতিহাসের কালেও যেমন বিদ্যমান ছিল আজও সমান অব্যাহত আছে। এই দুই ধারা একে অন্যের কাছ থেকে দু-হাতে উপকরণ আহরণ করেছে, করে নিজেকে সমৃদ্ধ করেছে। মার্গ সংগীতের একাধিক সুরের গঠনে যে আঞ্চলিক সংগীতের সুরের প্রভাব রয়েছে, তা সেগুলির নামকরণ থেকেই বোঝা যায়—গুর্জরী, মুলতানী, বৃন্দাবনী সারং, পূরবী, বংগাল প্রভৃতি। পক্ষান্তরে লোকসংগীতের সুরের গঠনে পাই খাম্বাজ, কাফি, পিলু, তিলক-কামোদ, ভীমপলশ্রী, পটদীপ, মাঁঢ় প্রভৃতি রাগসংগীতের অন্তর্ভুক্ত অপেক্ষাকৃত হাল্কা রসের রাগিণীগুলির আমেজ। স্বর্গত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী শাস্ত্রীর মতে, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া প্রভৃতি পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের কিছুটা করুণ-রসাত্মক, কিছুটা কান্নাপ্রবণ লোকসংগীতের সুরের গঠনের ভিতর আছে 'কসৌলী-ঝিঁঝিট' রাগের প্রভাব। আবার পুরুলিয়ার করম, টুসু প্রভৃতি গানের সুরে পাই খাম্বাজের সুস্পষ্ট আমেজ।

এইখানেই দেওয়া-নেওয়ার প্রক্রিয়া থেমে থাকেনি। শিল্প-ঐতিহাসিক অর্ধেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে ভারতীয় মার্গ সংগীতের রাগের কাঠামো যে ক্রমান্বয়ে পাঁচ স্বর (ঔড়ব) থেকে ছয় স্বর (খাড়ব), ছয় স্বর থেকে সাত স্বরে (সম্পূরণ) রূপান্তর লাভ করেছে তার মূলে আছে দেশী সংগীতের ভূমিকা।

আবার দেশী সংগীতও মার্গ সংগীতের দৃষ্টান্ত থেকে আপন সমৃদ্ধি বিধানে কম মাল-মশলা রসদাদি সংগ্রহ করেনি। বিহারের কোনও কোনও লোকগীতি এখনও চার স্বরে গাওয়া হয় (হেমাঙ্গ বিশ্বাস-কৃত 'লোকসংগীত সমীক্ষা' দ্রষ্টব্য)। তার মানে ওই শ্রেণীর সংগীতের আর বিকাশ হয়নি, একই সীমিত স্বরসংখ্যার সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আজও আবদ্ধ হয়ে আছে। এই চার স্বর বিশিষ্ট বিহারী লোকগীতিই পরে আসামের চা-বাগানের সেই সব শ্রমজীবী নরনারীর কণ্ঠে উদ্‌গীত হয়, যাদের বিহার থেকে 'সংগ্রহ' (রিক্রুট) করা হয়েছিল।

ভারতীয় মার্গসংগীতের কতকগুলি সুস্পষ্ট ধাপ বিদ্যমান—নিবদ্ধগান, প্রবন্ধ সংগীত, আক্ষিপ্তিকা, ধ্রুবপদ বা ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী প্রভৃতি। এগুলির ভিতর প্রথম তিন শ্রেণীর গানের প্রচলন আজকাল আর নেই, সেগুলি কী ধরনের গীতরীতি ছিল তাও আজ আর অনুমান করবার উপায় নেই, তবে শাস্ত্রগ্রন্থাদির লিখিত পাঠ থেকে এরূপ প্রতীত হয় যে, ওই গীতিরূপগুলির ক্রম-বিবর্তনের ধাপ বেয়েই ধ্রুপদ গানের উৎপত্তি হয়েছিল এবং ভারতীয় ইতিহাসের মধ্যযুগের গোটা পরিধি জুড়ে ধ্রুপদের ব্যাপক চর্চা হয়েছিল উত্তর, মধ্য ও পশ্চিম ভারতে। পূর্ব ভারতের বিহার এবং বাংলায়ও ধ্রুপদ গানের কেন্দ্রীভূত চর্চার কয়েকটি পীঠ রচিত হয়েছিল। তার মধ্যে বিহারের গয়া ও বেতিয়া প্রভৃতি স্থান এবং বাংলার বিষ্ণুপুরের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ধ্রুপদের কাঠামোর মধ্যে নিবদ্ধ ও প্রবন্ধ গানের একাধিক অঙ্গ গ্রথিত হয়েছিল বলে জানা যায়। যেমন নিবদ্ধ গানের উদ্‌গ্রাহ, মেল্যপক, ধ্রুব, অন্তর ও আভোগ এই পাঁচ পর্ববিভাগই পরে ধ্রুপদের অস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ এই চার 'তুক' বা কলিতে রূপান্তরিত হয়। প্রবন্ধগানের দৃঢ়সংবদ্ধ আদি-মধ্য-অন্ত্যযুক্ত সংহত গীতরূপ ধ্রুবপদের স্থির-ধীর-শান্ত ভাবপ্রতিমায় প্রতিফলিত হয়। আক্ষিপ্তিকাকে বলা হয় তাল, স্বর ও সুরের পূর্ণ রচনা। তাও ধ্রুপদের পরিকল্পনার ভিতর পূর্ণ-পরিণত রূপ লাভ করে। মধ্য যুগে ধ্রুপদ সংগীতের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ প্রকাশক ছিলেন আমীর খস্রু, গোপাল নায়ক, বৈজু বাওরা, রাজা মানসিং তোমর, স্বামী হরিদাস, তানসেন প্রমুখ।

খেয়াল ধ্রুপদ থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু কে খেয়ালের স্রষ্টা এই নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলেন আলাউদ্দিন খিলজীর সভাগায়ক আমীর খসরু (ত্রয়োদশ শতক) খেয়াল গানের প্রবর্তক ; আবার কারও মতে জৌনপুরের

সুলতান হোসেন শাহ্ শরকী (পঞ্চদশ শতক) এই গানের জনক। কিন্তু যিনিই এর স্রষ্টা হোন, এ-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে, খেয়াল গান অনেকদিন পর্যন্ত জনজীবনে অপাংক্তেয় ছিল। কেন অপাংক্তেয় ছিল? অপাংক্তেয় ছিল এই কারণে যে, খেয়াল গানের রূপ ধ্রুপদের তুলনায় চঞ্চল, তার গতি দ্রুততর এবং তার ভিতর যে-রঙরসের দ্যোতনা আছে, তার মধ্যে একটা চটুলতার ভাব নিহিত রয়েছে। আমরা একালের শ্রোতারা খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী ইত্যাদি শ্রেণীর গানের যতই উৎসাহী পরিপোষক হই না কেন, মধ্যযুগের শ্রোতাদের কাছে খেয়ালের এই চটুল-চঞ্চল রূপ কমবেশী অগ্রহণীয় ছিল। পক্ষান্তরে ধ্রুপদের শান্ত-গম্ভীর বিশুদ্ধ স্বররূপ তাঁদের মনকে সমধিক আকৃষ্ট করতো। এক দিক থেকে দেখতে গেলে এটাকে রক্ষণশীলতার পরিচায়ক মনে করা যায়, কিন্তু অন্য আর এক দিক থেকে এ জিনিস ভারতীয় সংগীতের মূলীভূত আদর্শের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধার নিদর্শন গণ্য করলে অন্যায় হয় না। নিবন্ধের সূচনায় ভারতীয় সংগীতের শান্ত-স্থির-আত্মসমাহিত-ধ্যানগম্ভীর রূপের যে প্রশস্তি করা হয়েছে, সেই আদর্শকে মান্য করতে হলে খেয়াল, ঠুংরী প্রভৃতি গীতরূপের তুলনায় ধ্রুপদকে সমধিক আদর করা আমাদের অবশ্যকৃত্য হয়ে পড়ে।

খেয়াল জনসমাজে গৃহীত হবার আগে পর্যন্ত অনেকদিন যাবৎ তা কাওয়ালি, গজল, গীত প্রভৃতি হাল্কা সুরের গানের সঙ্গে সমার্থক ছিল। প্রকৃতপক্ষে আমীর খসরুর উদ্ভাবিত বলে কথিত খেয়াল গানের মধ্যে নাকি পারসিক গজলের প্রভাব ছিল, অর্থাৎ হালকা সুরের উপাদান ছিল; তাই তদানীন্তন কালীন শ্রোতৃসমাজ ওই শ্রেণীর গানকে স্বীকার করে নিতে অন্তরের বাধা অনুভব করেছে। খেয়াল অনেক দিন পর্যন্ত তার এই আপেক্ষিক চটুল-চঞ্চলতার জন্য উত্তর ভারতের স্ট্রিট-সিঙ্গারদের গাওয়া কাওয়াল, গীত, গজল প্রভৃতির প্রায় সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে অবজ্ঞার ধুলায় অবলিপ্ত ও অবলুণ্ঠিত হয়ে ছিল। জনসমাজে তা মোটেই কল্কে পায়নি। শোনা যায় অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে রাজত্বকারী শেষ মোগল বাদশাহদের অন্যতম মহম্মদ শাহ্ (১৭১৯-১৭৪৮ খৃঃ অঃ)-এর সভাগায়ক সদারঙ্গ ওরফে নিয়ামত খাঁ খেয়ালকে তার অবহেলার ধুলিশয্যা থেকে উদ্ধার করে তাকে বাদশাহের দরবারে পরিবেশনার যোগ্য সংগীতে রূপান্তরিত করেন। খেয়াল এই অর্থে সদারঙ্গেরই পাথিকৃত্যে আনীত এক নতুন শিল্পরূপ, যা পরে সবিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল।

কিন্তু সদারঙ্গ এবং তাঁর ভাই (মতান্তরে পুত্র) অদারঙ্গের দ্বারা প্রবর্তিত, প্রচলিত খেয়াল গান কি আজকের খেয়াল গানের স্বগোত্র ? মোটেই তা নয়। সদারঙ্গ যে-জাতীয় খেয়ালের জনপ্রিয়তা সাধন করেছিলেন তা স্বরবিশুদ্ধিতে ধ্রুপদের তুলনায় ন্যূনতর কিন্তু শান্ত-ভাবের পরিপ্রেক্ষিতে তা ধ্রুপদেরই স্বগোত্র। আমরা আজকের দিনে যাকে ঢিমা খেয়াল বলি সদারঙ্গ-অদারঙ্গের প্রবর্তিত খেয়াল ওই অঙ্গের গান ছিল, তার ভিতর চটুল-চঞ্চল বর্ণালীর এতটুকু লেশ ছিল না। ধ্রুপদের 'আওচার' বা আলাপ অংশ তাঁরা বর্জন করেছিলেন কিন্তু তাকেই ভিন্ন পরিচ্ছদে সজ্জিত করে ভিন্ন রূপে খেয়ালের ভিতর 'স্বরবিস্তার' নামে গ্রথিত করে দিয়েছেন। 'স্বরবিস্তার' বা 'স্বরপ্রস্তার' আসলে ধ্রুপদের আলাপেরই একটা যুগোচিত পরিমার্জনা মাত্র। তা ধ্রুপদেরই ছদ্মবেশ বলা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই-জাতীয় ঢিমা বা বিলম্বিত লয়ের খেয়ালের আজ আর তেমন কদর নেই—সকলেই গতির নেশায়, চঞ্চলতার টানে, দ্রুত খেয়ালের তানসর্বস্ব ঊর্ধ্বশ্বাস আদর্শের পিছনে ছুটছে—অন্তরের দুর্বার অস্থিরতায় এমনকি মধ্যলয়ের খেয়ালেও আর কারও মন ভরছে না। হয়ত এটা যুগেরই ধর্ম, তা বলে ভারতীয় সংগীতের মূলগত আদর্শকে বিস্মৃত হয়ে তো আর সততবিবর্তনশীল নিত্যনতুনের আলেয়ার পশ্চাদ্‌ধাবনকারী ফ্যাসানধর্মী চপল-চঞ্চল যুগ-চাটুল্যকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না।

ভারতীয় সংগীতের শান্ত-স্থির ধ্যানগম্ভীর রূপের পাশে পাশ্চাত্য সংগীতের স্বরাদর্শকে স্থাপন করে দেখলে দুইয়ের পার্থক্য প্রকট হয়ে চোখে লাগবে, কানে বাজবে। পাশ্চাত্ত্য সংগীতে ভারতীয় সংঘাতের স্বরপ্রশান্তি নেই, আছে সম ও বিরুদ্ধ স্বরের আঘাতে-সংঘাতে সৃষ্ট স্বরের প্রাণচাঞ্চল্যপূর্ণ সচল রূপ। প্রথমটি মেলডিধর্মী ; দ্বিতীয়টি হারমনিকস্-নির্ভর। প্রথমটিতে স্বরের মাধুর্য ও লাবণ্য ; দ্বিতীয়টিতে স্বরের উত্তাল-অস্থির-সংক্ষুব্ধ রূপ। ইউরোপীয় শিল্প সাহিত্যে সমাজে যেমন সংঘাতের চেহারাটা অতি-প্রবল তেমন তার সংগীতের পঞ্জরে পঞ্জরেও অস্থিরতার দ্যোতনা। সেখানে সমে ও বিষমে, point ও counter-point-এ ঘোঝাযুঝি, লড়ালড়ি লেগেই আছে। এটা কি ইউরোপীয় যন্ত্রসংগীত, কি ইউরোপীয় কণ্ঠসংগীত দুইয়ের বেলাতেই সত্য ; বোধহয় যন্ত্রসংগীতের বেলায় বেশী সত্য। বীটহোফেনের শ্রেষ্ঠ 'সিম্ফোনি' সংগীতগুলি সংগ্রামের মুখরতায় ভরপুর।

কিন্তু ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতির প্রকৃতি তেমন নয়। সংস্কৃত কাব্য নাটকাদির যেমন মূলরস শান্ত, তেমনি ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতেরও মূল ভাব অসীমের অভিসারী আত্মসমাহিত তদ্‌গতচিত্ততা। ভারতীয় সংগীত শিল্পী যন্ত্রে বা কণ্ঠে পারিপার্শ্বিক নিসর্গের সঙ্গে একাত্মরূপে লীন হয়ে যেতে পারলে আর কিছু চায় না। তাঁর শিল্প তো শিল্প নয়; সেটা একটা ধ্যান একটা প্রার্থনা। কখনও কখনও এই ধ্যান আর প্রার্থনা এতটাই সূক্ষ্মতা মণ্ডিত হয়ে প্রকাশ পায় যে, তার তাবৎ সুরমাধুর্য ও সুরৈশ্বর্য একীভূত হয়ে একাক্ষর বিশিষ্ট 'ওঁ' ধ্বনিতে বিগলিত হয়ে পড়ে। পাশ্চাত্য সংগীতে এ জিনিস কখনই পাওয়া যাবে না।

পরিষ্কার বোঝা যায়, দুই দেশের বস্তুগত অবস্থার মৌলিক ভিন্নতায় দুই দেশের সংগীত শিল্পের এই ভিন্নতা। এর কোনটা ভাল কোনটা মন্দ এই বিচারের প্রশ্ন আসে না, শুধু নিজ নিজ দেশের যুগ যুগ বাহিত শিল্প সংস্কারকে মান্য করার প্রশ্নটাই এক্ষেত্রে আসল। ভারতীয় সংগীত তার নিজ আদর্শে অবিচল থেকে উত্তরোত্তর বিকাশের পথে এগিয়ে চলবে, এইটেই কাম্য।

রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীত

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সংগীত রচনাবলীর আলোচক ও ঐতিহাসিকদের মধ্যে এই একটি মত প্রচলিত যে, রবীন্দ্র-সংগীত সৃষ্টির তিনটি স্তর। প্রথম স্তর ১৮৮০ সাল থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত কমবেশী দুই দশক কাল বিস্তৃত, এই স্তরে তিনি মুখ্যতঃ হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পা অঙ্গের গান 'ভেঙে' বাংলা ভাষায় স্বকীয় পদ রচনা করেছিলেন ও সেগুলি পরে ব্রহ্মসংগীত নামে পরিচিত হয়। এই গানগুলির ভিতর ধ্রুপদাঙ্গ পর্যায়ের গানই বেশী, তবে খেয়াল টপ্পা অঙ্গের গানও কিছু কিছু আছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের গান রচনার শুরু মোটামুটি ভাবে বলতে গেলে ১৯০০ সাল থেকে এবং তার পরিসমাপ্তি ১৯২০ সাল কি তার কাছাকাছি সময়ে। এই পর্যায়ের গানের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এতে হিন্দুস্থানী ধ্রুপদাঙ্গ বা খেয়ালাঙ্গ গানের কাঠামোটি মাত্র নেওয়া আছে, কিন্তু তাদের স্বরসংযোজনায় হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ বা খেয়াল-এর ভঙ্গীটি গ্রহণ না করে প্রায়শঃ তার জায়গায় বাংলার ঐতিহ্যাশ্রিত লৌকিক সুর, যথা বাউল, ভাটিয়ালি প্রভৃতি সহজগ্রাহ্য সুরগুলিকে ব্যবহার করা হয়েছে। তালপ্রকরণেও চৌতাল, ঝাঁপ, সুরফাঁক, তেওট, একতালা প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত দুরূহ তালগুলির বদলে সরল ত্রিতাল, কার্ফা, দাদরা, আদ্ধা, প্রভৃতি তালের প্রয়োগই বেশী দেখা যায়।

তৃতীয় পর্যায়ের গানে অর্থাৎ সর্বশেষ অধ্যায়ে (১৯২১-৪১) রচিত গানগুলিতে সুর-তাল-বাঁধুনি (বন্দেজ) প্রভৃতি বিষয়ে সর্বসংস্কারমুক্তির একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। সুরের বাঁধাবাঁধি, তালের বাঁধাবাঁধি, আস্থায়ী-অন্তরা-সঞ্চারী-আভোগ জাতীয় প্রচলিত কলিবিভাগ সম্পর্কে নিয়মের কড়াকড়ি, সুরের বিশুদ্ধতা রক্ষা বিষয়ে খুঁতখুঁতেপনা—এসব কোন বাধ্যবাধকতাই এই পর্বে আর রইলো না। শুধু তাই নয়, এই পর্বের গানে বিদেশী সুর এবং দক্ষিণ ভারতীয় সুরের আমেজ আখচার অনুভূত হতে লাগলো সুরের বাঁধুনিতে। প্রথম জীবনে 'বাল্মীকি প্রতিভা', 'মায়ার খেলা' প্রভৃতি অপেরাধর্মী গীতিনাট্যগুলিতে সুর রচনার মধ্যে যে-জাতীয় বিদেশী সুরের প্রভাব লক্ষ্য করা যেত, সর্বশেষ পর্যায়ের সুরসৃষ্টিতে পুনরায় সেসব যেন আবার ফিরে এলো নতুন আকারে, নতুন

ভঙ্গীতে। অন্যদিকে বাংলার জাতীয় সুর কীর্তন-এর ঝিলিকও যেন মাঝে-মধ্যেই উঁকিঝুঁকি দিয়ে উঠতে লাগলো গানগুলির স্বরপ্রকরণের ভিতর। এককথায় বাংলা গানের ধরাবাঁধা সংস্কার থেকে বিদায় নিয়ে রবীন্দ্রনাথ এ পর্যায়ের গানে সম্পূর্ণ নয়া সুরের লীলায় মাতলেন। সুরে মুক্তি, ছন্দে মুক্তি, তালে মুক্তি—মুক্তির আবেগের এক বন্যাপ্রবাহ যেন উন্মুক্ত হলো এই শেষ পর্যায়ের গানগুলির রচনার ধারায়।

রবীন্দ্র-সংগীত সৃষ্টির এই যে তিনটি মূল পর্ববিভাগের উল্লেখ করা হলো তার মধ্যে কোন্ পর্ববিভাগের গান সবচেয়ে ভাল ? এ বিষয়ে সর্বজনগ্রাহ্য একটিমাত্র উত্তর মেলা কঠিন। কেননা পাত্রভেদে, রুচিভেদে উত্তরও ভিন্ন ভিন্ন রকম হতে বাধ্য। শ্রোতাদের মধ্যে যাঁরা রাগসংগীতের সবিশেষ অনুরাগী, গানের বাঁধুনিতে রাগ-রাগিণীর প্রত্যক্ষ আমেজ না থাকলে যাঁদের গান শুনে প্রকৃত অর্থে মন ভরে না, তাঁদের কানে প্রথম পর্যায়ের হিন্দুস্থানী গান-ভাঙা ব্রহ্মসংগীতগুলিই বেশী ভাল লাগবে—এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। পক্ষান্তরে যে-সব শ্রোতা বাংলা গান বাংলা গানের চালে রচিত হোক—এইটে সমধিক আকাঙ্ক্ষা করেন এবং কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালি প্রভৃতি বাংলার নিজস্ব সুরের জারক রসে গানের সুর রসায়িত হওয়াটা বেশী পছন্দ করেন, তাঁরা রবীন্দ্রসৃষ্টির মধ্যপর্বের গানগুলির দিকেই বেশী ঝুঁকবেন, সেকথা সহজেই বোঝা যায়। বাংলার জাতীয় সংগীত প্রতিভার সার্থক অভিব্যক্তির নিদর্শন হিসাবে এই গানগুলির দিকেই তাঁদের পক্ষপাত সমধিক হওয়াটাই বুঝি স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত।

আবার সংগীতে যাঁরা কোনরূপ বাঁধাবাঁধিই পছন্দ করেন না, কী সুরে, কী তালে, কী অন্যবিধ লক্ষণায় স্বাধীনতা তথা সর্বসংস্কারমুক্তির পক্ষপাতী, তাঁরা যে শেষ পর্যায়ের গানগুলিকেই বেশী তারিফ করবেন, সে কথা ঘোষণা করতে খুব বেশী অনুমান শক্তির প্রয়োজন হয় বলে মনে করি না।

আমার নিজের কথা যদি জিজ্ঞাসা করা হয় তাহলে আমি বলব, আমার প্রথম পর্যায়ের গানগুলিই সমধিক পছন্দ। অর্থাৎ ব্রহ্মসংগীতগুলির প্রতিই আমার অন্তরের স্বাভাবিক পক্ষপাত। সে এজন্য নয় যে, ব্রহ্মসংগীতগুলির অন্তর্নিহিত ভগবদ্‌ভক্তির আবেগ আমাকে খুব বেশী আপ্লুত করে; সে এই কারণে যে, ওই সব গানের বাঁধুনির ভিতর আমি হিন্দুস্থানী রাগ-রাগিণীর আমেজ খুব ধরাছোঁয়াভাবে অনুভব করতে পারি, তাই আমার পক্ষপাত স্বভাবতঃই সেইদিকে

বেশী আকৃষ্ট হয়। আবাল্য আমার মন ও কান রাগসংগীতের আবহে পুষ্ট, তাই যেসব বাংলা গানে রাগসংগীতের প্রভাব বেশী লক্ষ্যগোচর হয়, সেইদিকে কান· মন স্বতঃই প্রধাবিত হয়। ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা প্রভৃতি গানের শ্রেণীরূপগুলির গঠনের মধ্যেই সুরের এমন সব বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে যা অন্যবিধ গানে দুর্লভ। রাগরূপের পর্যায়ক্রমিক উন্মোচন, স্বরবিস্তার, তান, গমক, মূর্ছনা প্রভৃতি স্বরালংকারগুলির রসই যেন আলাদা।

অবশ্য এ কথা বলার অর্থ এ নয় যে, আমার অন্য ধরনের গান ভাল লাগে না। লাগে, তবে রাগসংগীতের ভাল-লাগার তুলনায় সে ভাল-লাগা অনেক কম। গানের জগতে ক্লাসিকাল ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে না রেখে কেবল হাল্কা লৌকিক সুর নিয়ে মাতামাতি করতে আমার প্রাণ চায় না। শিল্পের জগতে যেটাকে অনায়াসগ্রাহ্য সহজিয়া সাধনা বলে, সেই ধারার আমি নিতান্ত বশংবদ শ্রোতা নই। সংগীত হোক, সাহিত্য হোক, কি আর কোন প্রকার শিল্পকলাই হোক, যে শিল্পের চর্চায় অনুশীলনের কোন স্থান নেই, নেই জ্ঞান ও মননের পৃষ্ঠপট, তা যতই আপাতহৃদয়গ্রাহী হোক, তা আমার মনকে অপ্রতিরোধ্য টানে টানে না। সুরের সহজিয়া লীলায় আর যাঁদের মন মজে তো মজুক আমার মন মজে না। সাধনার অনুষঙ্গ বর্জিত সংগীত-চর্চার বিশেষ কোন মূল্য আমার কাছে নেই।

এই সব নানা দিক্ বিবেচনায় রবীন্দ্র-ব্রহ্মসংগীতগুলিই সবচেয়ে বেশী আমার প্রাণমন আকর্ষণ করে। কেননা ওই সব গান আয়ত্ত করতে রাগ-রাগিণীর মৌলিক জ্ঞানের প্রয়োজন হয়, কণ্ঠ-সাধনা ও কণ্ঠ-মার্জনার প্রয়োজন হয়, প্রয়োজন হয় পাখোয়াজ কিংবা তবলার সঙ্গে প্রণালীবদ্ধ দীর্ঘকালীন তাল অভ্যাসের ; শুধুমাত্র স্বরলিপি দেখে শেখা মুখস্থ বিদ্যার উপর ভর করে এ ক্ষেত্রে পার পাওয়ার উপায় নেই। কণ্ঠ সাধনা তথা রাগজ্ঞান রবীন্দ্র-ব্রহ্মসংগীতগুলির একেবারে মৌলিক ভিত্তি। এই দুটি অত্যাবশ্যক প্রাথমিক প্রয়োজন পূরণ করতে না পারলে ব্রহ্মসংগীত চর্চায় সিদ্ধিলাভ দুরাশা মাত্র। এগুলি মুখ্যত পূজা পর্যায়ের গান বলে কিংবা ভগবদ্‌সংগীতবিষয়ক গান বলে আমার চোখে তাদের আলাদা বিশেষ কোন মূল্য নেই ; আমি একান্তভাবে সুরের মাপকাঠিতে ফেলেই গানগুলিকে বিচার করতে চাইছি। বিশুদ্ধ সুরের মানদণ্ডেই ব্রহ্মসংগীত-গুলি বিচার্য এবং সেই বিচারেই অনবদ্য। তাদের ভগবদ্ভক্তিমূলক বাণী বা পদ

সুরের বিচারে অবান্তর। ওই সব পদ ভগবদ্‌বিষয়ক না হয়ে প্রকৃতি কিংবা পার্থিব বিষয়ক হলেও তাদের সুরের আবেদন একইরূপ অপ্রতিরোধ্য থাকত।

এ কথা বলছি এজন্য যে, গানের জগতে কথার তাদৃশ দাম নেই, সুরটাই হলো আসল। কথার দাম কবিতায়, গানে নয়। বরং অনেক সময় গানের পরিপ্রেক্ষিতে সুসংবদ্ধ সুললিত পদ বা বাণী সুরের সুষ্ঠু লীলায়নের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। গানে কথা সুরের যথাযথ বিকাশের জন্য, লতার পক্ষে যেমন বেড়া, তেমনি একটা অবলম্বন মাত্র, তার বেশী মর্যাদা কথার প্রাপ্য নয়। এমনকি সচরাচর কাব্যসঙ্গীতের এলাকা বলে কথিত বাংলা গানের বেলাতেও নয়। সকল প্রকার গানেই কথা অন্যতর উপাদান মাত্র, কিন্তু সুরই প্রধান।

২

রবীন্দ্রনাথ বালককাল থেকেই ধ্রুপদাঙ্গ সংগীতের আবহে লালিত বর্ধিত হয়েছিলেন। ঠাকুরবাড়ীতে বিষ্ণুপুরী ঘরানার ধ্রুপদ গানের বিলক্ষণ চর্চা ছিল। রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালে যদুভট্ট, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শেষোক্তের তিন পুত্র রামপ্রসন্ন, গোপেশ্বর ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিষ্ণুপুরের সংগীতগুণীদের ঠাকুরবাড়ীতে যাতায়াত ছিল। অন্যদিকে আদি ব্রাহ্ম সমাজের গায়ক নদীয়ার বিষ্ণু চক্রবর্তী প্রথমে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, পরে রবীন্দ্রনাথকে গুরুপরম্পরাক্রমে আগত ধ্রুপদ গানের ঐতিহ্যের সঙ্গে সবিশেষ পরিচিত করান। এই সমস্ত বিভিন্ন বিশিষ্ট সাংগীতিক ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসে রবীন্দ্রনাথ ধ্রুপদের উত্তরাধিকার বেশ ভালভাবেই আত্মসাৎ করতে সমর্থ হন। ঠিক বিধিবদ্ধভাবে, অর্থাৎ ওস্তাদের কাছে 'নাড়া' বেঁধে শিষ্য যেমনভাবে গুরুর কাছ থেকে সংগীতাভ্যাস করেন, ঠিক সেইভাবে রবীন্দ্রনাথ যে ধ্রুপদ গান অনুশীলন করেছিলেন তা নয়; তবে তৎকালীন উত্তর কলকাতার আকাশে বাতাসে পরিব্যাপ্ত, বিশেষ করে ঠাকুরবাড়ীর আবহাওয়ায় নিয়ত-সঞ্চরমান ধ্রুপদ সুরের প্রভাবে কবির মনে ওই গানের সংস্কার বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল বলা চলে। বাল্য-কৈশোরের এই অধ্যায়ে খেয়াল, টপ্পা প্রভৃতি গানও যে তিনি না শিখেছিলেন তা নয়, তবে ধ্রুপদের সংগ্রহই তাঁর সঞ্চয়ের ঝুলিতে তুলনায় অনেক বেশী ছিল। সে সময়ে উত্তর কলকাতায় ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী এবং তাঁর দুই প্রধান

শিষ্য পাথুরিয়াঘাটার জমিদার রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও 'গীতসূত্রসার' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের প্রণেতা কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখরা শাস্ত্রীয় সংগীত বিদ্যার কতিপয় স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। তাঁদের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে না এলেও এঁদের অনুশীলন ও সংগীতাদির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে যথেষ্ট পরিচয় ছিল, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকলেও পরোক্ষ প্রমাণ আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী সংকলিত 'কণ্ঠকৌমুদী' নামক দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপি সংবলিত সংগীত সংগ্রহ পুস্তকের অন্তত বারোটি গানের ভিত্তিতে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ব্রহ্মসংগীত রচনা করেছিলেন, তার মুদ্রিত সাক্ষ্য আছে। রবীন্দ্রনাথের এই বারোটি ব্রহ্মসংগীত হলো—এখনো তারে চোখে দেখিনি (ইমন), পান্থ এখনো কেন (ললিত), তুমি আপনি জাগাও মোরে (রামকেলী), দেখা যদি দিলে (বেলাবলী), ওই পোহাইল তিমির রাতি (আলাহিয়া), কার মিলন চাও বিরহী (শ্রীরাগ), সংশয় তিমির মাঝে না হেরি গতি হে (দেশ-সিন্ধু), তোমা লাগি নাথ (পূরবী), শোন তাঁর সুধাবাণী শুভমুহূর্তে শান্ত প্রাণে (ইমনকল্যাণ), এ মোহ আবরণ (ইমন), সুমধুর শুনি আজি (শঙ্করাভরণ) এবং তোমারি মধুর রূপে ভরেছ ভুবন (ঝিঁঝিট)। [কম্পাস পত্রিকার ৬ই জুলাই ১৯৮৫ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীঅমলকুমার মিত্র সংকলিত তালিকা দ্রষ্টব্য।]

কণ্ঠকৌমুদী ও স্বরবিতানের স্বরলিপিতে উল্লেখিত রাগনামগুলিতে কোথাও কোথাও ফারাক দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, পান্থ এখনো কেন-এর মূল গান রঙ্গ মুখত সোঁ ললিত-রাগ ধৃত ছিল। কিন্তু স্বরবিতানে পান্থ এখনো কেন গানটি যোগিয়া বলে বিজ্ঞাপিত হয়েছে। কাঙালীচরণ সেন-কৃত স্বরলিপিতেও একদা এই গানটি ললিত বলে উল্লেখিত ছিল। ইদানীং কেন যোগিয়ায় রূপান্তরিত হলো, তার কারণ বোঝা যায় না।

কবি রচিত ব্রহ্মসংগীতের সংখ্যা অগণন বললে চলে। তার মধ্যে থেকে বাছাই করে কিছু সংখ্যক প্রসিদ্ধ তথা জনপ্রিয় ব্রহ্মসংগীতের নাম নীচে উল্লেখ করছি—তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে (ইমনকল্যাণ, তেওরা), তাঁহারে আরতি করে চন্দ্র তপন (বড়হংস সারঙ্গ, চৌতাল), অন্তর মম বিকশিত কর অন্তরতর হে (ভৈরবী, একতাল), আনন্দধারা বহিছে ভুবনে (মালকোষ, কাওয়ালি), জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে (বেহাগ, রূপকড়া), আজি প্রণমি তোমারে চলিব নাথ (বিভাস, একতাল), দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া (সুরট-মল্লার,

একাদশী তাল), প্রথম আদি তব শক্তি (সোহিনী, সুরফাঁক তাল), নিবিড় ঘন আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা (সাহানা, নবতাল), হৃদয়-নন্দন বনে নিভৃত এ নিকেতনে (ললিতা-গৌরী, ঝাঁপতাল), তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ (ভৈরবী, একতাল), আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে (মহীশূর ভজন, একতাল), আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে (মিশ্র হাম্বির, তালফেরতা), আকাশভরা সূর্যতারা (কেদারা), বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা (লচ্ছাশাখ বিলাবল, ঝাঁপতাল), বীণা বাজাও হে মম অন্তরে (পূরবী, ধামার), ইত্যাদি।

উপরে যে-সব গানের উল্লেখ করা হলো, তার সুর সবই একরাগভিত্তিক রচনা, কণ্ঠের উপর যথেষ্ট অধিকার ও স্বর স্ববশ না থাকলে এসব গানের যথার্থ রূপায়ণ সম্ভব নয়। শুধুমাত্র স্বাভাবিক কণ্ঠমাধুর্য কিংবা সহজপটুত্বের সংস্কারকে আঁকড়ে ধরে থাকলে বড়জোর এইসব রচনাকে সাদামাঠাভাবে গলায় ফুটিয়ে তোলা যাবে, কিন্তু সেগুলির অন্তর্নিহিত গাম্ভীর্য, শিল্পসৌন্দর্য, রাগধ্যান অ-ধরাই থেকে যাবে। লয়ের সূক্ষ্মবিচারও এ-সব গানে কমবেশী অত্যাবশ্যক। কারণ তেওট, তেওড়া, সুরফাঁক, ঝাঁপ, মধ্যমান যৎ প্রভৃতি বিষমপদী ছন্দের বেলায় মাত্রার অসমানতাকে সামগ্রিক লয়ের সমানত্বের মধ্যে মিলিয়ে আনার ক্ষমতা থাকা দরকার। ঝাঁপ, সুরফাঁক, তেওট প্রভৃতি তালের লয় ভুলকি চালে চললেও এক এক ও গোটা আর্বর্তনের মধ্যে যখন সেটা পরিপূর্ণতা পায়, তখন ছন্দ রসমসৃণ হয়ে কানে বাজে। তাছাড়া আড়ি-কোয়াড়ি দুন-চৌদুন লয়ের সৌন্দর্য তো আছেই।

রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মসংগীত রচনা করতে গিয়ে কতকগুলি নতুন তালেরও সৃষ্টি করেছেন—যথা ষষ্ঠী, নবতাল, একাদশী, রূপকড়া প্রভৃতি। উপরে উদ্ধৃত গানগুলির দু'তিনটিতে এগুলির প্রয়োগ হয়েছে দেখা যাবে। অসামান্য মাত্রাজ্ঞান অধিগম্য না থাকলে কোন সুর রচয়িতার পক্ষে এই সমস্ত অসম মাত্রার তালের গানে সাফল্য লাভের কথা ভাবাই যায় না। কবির বিস্ময়কর মাত্রাজ্ঞানই শুধু এর থেকে প্রমাণ হয়। মাত্রাজ্ঞান কথাটা এখানে আক্ষরিক ও প্রতীকী—এই দুই অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে।

আজকের দিনের অধিকাংশ রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীই দেখা যায় ব্রহ্মসঙ্গীতগুলিকে সযত্নে পাশ কাটিয়ে অপেক্ষাকৃত সহজ সুরের রবীন্দ্রসংগীতগুলির পরিবেশনায় প্রায়শঃ মনোনিবেশ করেন। এটা তাঁদের রাগ-রাগিণীর প্রতি অবহেলার

লক্ষণ অথবা শ্রমবিমুখতার লক্ষণ, বলা বড় শক্ত। অথবা সহজের প্রতি অনায়াসসাধ্যের প্রতি মজ্জাগত ঝোঁকও এই অনুচিত পক্ষপাতের মূলে সক্রিয় থাকা সম্ভব। কিন্তু বলাই বাহুল্য, এই দৃষ্টিভঙ্গী ঠিক নয়। ব্রহ্মসংগীতগুলিকে যথাযোগ্য মর্যাদা না দিলে রবীন্দ্রসংগীতকেও মর্যাদা দেওয়া হয় না—এ কথাটা বোঝা প্রয়োজন।

রবীন্দ্র-সংগীতের নবমূল্যায়ন

রবীন্দ্র-সংগীত রবীন্দ্রনাথের সৃজনী-প্রতিভার এক বিস্ময়কর দিক। তাতে যেমন আছে বাণীর অফুরন্ত প্রাচুর্য, তেমনি সুরের নানা বৈচিত্র্য। রবীন্দ্র-সংগীতের বাণীমূর্তি শুধু প্রাচুর্য লক্ষণাক্রান্তই নয়, তার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বাণীর অন্তহীন সৌন্দর্য, যা কোনো কোনো দিক দিয়ে রবীন্দ্র-কাব্যের সৌন্দর্যসুষমাকেও ছাড়িয়ে গেছে। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের গানে যে সূক্ষ্ম সংবেদনশীলতা, অনুভবের তীক্ষ্ণতা ও ঋতু-সময়-ক্ষণ-অনুযায়ী মেজাজ (মুড) ও ভাবের বিচিত্র পথগামিতা আছে, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় তা আছে কিনা সন্দেহ। কবিতার ভাষা আর গানের ভাষার মধ্যে একটা পার্থক্য এই যে, কবিতায় ভাষা চলে মোটামুটি শব্দের প্রচলিত ধ্বনির পথ ধরে ; কিন্তু গানের ভাষায় ধ্বনির গুণগত পরিবর্তন হয়। কবিতার ভাষা ব্যঞ্জনাশ্রিত আর সুরময় হলেও তা কখনো ভাষার নিজস্ব যে পৃথুলতা আর ভার আছে, তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারে না। কিন্তু গানের ভাষার সে অসুবিধা অনেক কম। গান তৈরির মানসে যখনি কেউ কোনো গানের পদ রচনা করতে আরম্ভ করেন, অমনি শব্দের ভার কমে যেতে আরম্ভ করে এবং তাতে সুরময় ধ্বনির সঞ্চার হয়। এ হল পয়লা প্রস্থ সুরময়তার পালা। দ্বিতীয় সুরসমৃদ্ধি ঘটে যখন সত্যি সত্যি গানটিতে সুরযোজনা করা হয়। তার অর্থ গানের বেলায় সুরের খেলা ঘটে দু'বার—যখন পদ রচিত হয় তখন একবার ; যখন পদে সুর দেওয়া হয় তখন আর একবার।

রবীন্দ্রনাথের গানেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হবার কোনো কারণ নেই, হয়ওনি। বরং রবীন্দ্রনাথ যেহেতু অসাধারণ প্রতিভাশালী কবি, সেই কারণে তাঁর গানের বাণীতে সুরারোপের আগেই ধ্বনির বা সুরের আশ্চর্য বিস্ফার ঘটেছে। রবীন্দ্র-সংগীতের পদ বা বাণী বিস্ময়কররূপে মেদভারবর্জিত, সাবলীল-গতি, ধ্বনিময়। ভাবের দিক দিয়ে বিচিত্র রসের সেখানে আনাগোনা। অনু-ভবের, কল্পনার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তন্তু দিয়ে সে সকল গানের দেহ গঠিত। রবীন্দ্র-কাব্য আর রবীন্দ্র-সংগীতের যদি তুলনামূলক বিচার হয়—যদিও খতিয়ে দেখলে, দুই একই বৃহত্তর সৃষ্টি-প্রতিভার এপিঠ-ওপিঠ—, তা হলেও বলতেই হবে যে, নিছক বাণীর সৌন্দর্যে রবীন্দ্র-সংগীতের স্থান রবীন্দ্র-কাব্যের উপরে। আর রবীন্দ্র-

সংগীতে যখন সুর আরোপিত হয় এবং বাণী ও সুর মিলিয়ে যখন রবীন্দ্র-সংগীতকে অখণ্ডভাবে দেখা হয়, তখন তো দুইয়ের ভিতর প্রতিতুলনার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না ; রবীন্দ্র-সংগীত সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রকাব্যকে ছাড়িয়ে বহুদূর অগ্রগামী হয়ে পড়ে।

এই কারণে আজকাল কোনো কোনো সমালোচক রবীন্দ্র-সংগীতকে রবীন্দ্র-কাব্যের দীর্ঘ ভূমিকার ছায়ায় গড়ে-ওঠা একটি প্রক্ষিপ্ত বা গৌণবস্তু মনে না করে তার সম্পূর্ণ আলাদা মূল্যায়নের পক্ষপাতী। রবীন্দ্র-কাব্যের অনুষঙ্গ হিসেবে দেখলে, রবীন্দ্র-সংগীতের মর্যাদা কমে যায় বলে এঁদের ধারণা। বরং প্রচলিত ধারণার ব্যত্যয় ঘটিয়ে এতদূর পর্যন্ত এঁরা বলতে চান যে, রবীন্দ্র-সৃষ্টির কোনো কোনো পর্বে বরং সংগীত-সাধনার দ্বারাই কাব্য-সাধনা প্রভাবিত হয়েছে। "এমন প্রমাণ সহজেই তুলে ধরা যায় যাতে মনে হবে তাঁর জীবনের বহু সময়েই তাঁর সঙ্গীতসাধনই প্রভাবিত করেছে তাঁর কাব্যচর্চাকে। গীতাঞ্জলি গীতালি গীতিমাল্যের যুগকে আমি তো মনে করি মূলত সাংগীতিক প্রতিভার যুগ—যখন তাঁর কাব্যচর্চা গীতিময়তায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে।" (সঙ্গীত চিন্তা : শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্য, পৃ ২৫)। "রবীন্দ্র-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি রবীন্দ্রসংগীতে।" (রবীন্দ্র-সংগীত প্রসঙ্গ, প্রথম খণ্ড : শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস, পৃ ১৪৩)। এই মন্তব্য বা এই জাতীয় মন্তব্যের মধ্যে রবীন্দ্র-সংগীতের অনুকূলে কিছুটা পক্ষপাতী মনোভাব থাকলেও তার ভিতর যে অনেকখানি সত্য আছে তা অস্বীকার করা যায় না। বাস্তবিকই, রবীন্দ্র-সংগীতকে রবীন্দ্রকাব্য-নিরপেক্ষ একটি আলাদা এবং বিশেষ মর্যাদায় গরীয়ান্ সৃষ্টি হিসেবে বিচারের সময় হয়েছে।

আমার নিজের কথা বলতে গেলে আমি বলবো, রবীন্দ্র-সংগীতের বাণীকে রবীন্দ্র-কাব্যের বাণী অপেক্ষা আমার বরাবর অনেক বেশি ভাবগাঢ়, অনেক বেশি তাৎপর্যবহ বলে মনে হয়েছে। কেন এমনটা মনে হয়, তার সঠিক কারণ বলতে পারবো না ; কিন্তু প্রকৃত তথ্য হচ্ছে এই যে, দু'এর প্রতিতুলনায় এই রকমেরই একটা প্রতিক্রিয়া বরাবর আমার মনে সৃষ্টি হয়েছে। হয়তো সেটা অযৌক্তিক, হয়তো সেটা যথেষ্ট পরিমাণে ঘাতসহ নয় ; কিন্তু মনে স্বাভাবিক যে ভাবের উদয় হয় তার আর কোনো চাপা নেই। রবীন্দ্রনাথের এমন বহু গান আছে যার প্রথম লাইন বা চরণ গীত হওয়ারও অপেক্ষা রাখে না, আবৃত্ত হওয়া-মাত্র হৃদয়তন্ত্রীতে ধ্বক্ করে গিয়ে বাজে। এমনটা অনুভব কবিতার ক্ষেত্রে হওয়ার

নজীর খুব বেশি নেই। এর একটা কারণ সম্ভবত এই হতে পারে যে, আপাতত সুরের অনুষঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও গানের প্রথম চরণ—বা যে কোনো চরণ—সুরের স্মৃতি থেকে বিমুক্ত নয়। অতীতে একাধিকবার শোনা সুরের অনুরণন তখনো ওই চরণকে ঘিরে মথিত হতে থাকে যখন চরণটিকে সাদামাঠাভাবে কেবল চোখের ওপর দেখছি বা আক্ষরিকভাবে আবৃত্তি করছি। 'এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর', 'ঘরেতে ভ্রমর এলো গুনগুনিয়ে' দুটি ইতস্তত মনে হওয়া গানের প্রথম চরণ। এক কথায় অনবদ্য,—আক্ষরিক দিক থেকেই অনবদ্য। তাদের সেই রসের অনির্বচনীয়তার রহস্য ব্যাখ্যা করে বোঝানো সম্ভব নয়। কিন্তু যতোই তাদের আক্ষরিক আবেদনের কথা বলি, মনে হয় তাদের অনির্বচনীয়তার মূলে অনেকখানি কাজ করছে ওই দুটি গানের স্মৃতি। এই মুহূর্তে হয়তো গান দুটি গাওয়া হচ্ছে না ; কিন্তু এককালে গীত হওয়ার স্মৃতি তাদের চরণের মধ্যে অন্তর্লীন আছে। অর্থাৎ আপাতত সুরযুক্ত না হলেও তারা এক অদ্ভুত সূক্ষ্ম উপায়ে সুরের ব্যঞ্জনাময়। কবিতা কখনো এই প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে যায় না, যাওয়ার তার সুযোগ হয় না ; ফলে যে কথা বলেছি, অন্যসব উপকরণ সমান-সমান বা অন্যসব ব্যাপারে শক্তিসাম্য থাকলেও গানের সঙ্গে কবিতার তুলনা হয় না। বিশেষত, রবীন্দ্র-সংগীতের সঙ্গে রবীন্দ্র-কাব্যের তুলনা হয় না।

কিন্তু এ-কথা বলার অর্থ এই নয় যে, রবীন্দ্র-সংগীত সম্পর্কে কারো মানসিক দ্বিধা থাকতে নেই বা তেমন দ্বিধা থাকলে তার আদৌ কোনো যৌক্তিকতা নেই। এইমাত্র রবীন্দ্র-সংগীতের বাণীর সৌন্দর্য নিয়ে কথা হচ্ছিলো। রবীন্দ্রনাথের গানের বাণীতে মুগ্ধ হন না এমন শ্রোতা বা পাঠক খুঁজে পাওয়া ভার। রবীন্দ্রনাথের গানের সুর সম্বন্ধেও একই কথা বলতে পারলে খুশী হওয়া যেতো। কিন্তু মনে হয় এ ক্ষেত্রে মতের ভিন্নতার অবকাশ আছে। এই মতভেদের উদ্ভব কিছুটা রুচিভেদ থেকে, কিছুটা ভারতীয় সংগীতের প্রকৃতি বিচারজনিত প্রত্যয়ভেদ থেকে। আমার নিজের রুচির কথা যদি ধরা যায় তো আমি অসংকোচেই বলতে পারি যে, আমার সাংগীতিক রুচি আজন্ম লালিত হয়েছে রাগসংগীতের আবহাওয়ায়। এবং যেহেতু তা রাগসংগীতের পরিমণ্ডলের মধ্যে পুষ্ট-বর্ধিত হয়েছে সেই কারণে তা সুরের অবাধ স্বচ্ছন্দ-বিকাশের সবিশেষ পক্ষপাতী এবং যে-কোনোরূপ বাঁধাবাঁধিতেই তা ক্লিষ্ট হয়। ভারতীয় রাগসংগীতের ঐতিহ্যে সুরের স্বাধীন বিকাশের তত্ত্ব একটি বড় স্থান জুড়ে আছে।

সুরের এই স্বাধীন বিকাশ বা 'সুরবিহার', ধ্রুপদের আলাপ-অংশকে কেন্দ্র করে সম্পাদিত হয় আর খেয়ালে বিহিত হয় স্বরবিস্তারের মধ্যে দিয়ে। আর টপ্পা এবং ঠুংরীর বাঁধুনির মধ্যেই বলা যেতে পারে এই সুরের স্বচ্ছন্দ বিকাশের ধারণা অনুস্যূত হয়ে আছে।

রবীন্দ্র-সংগীতের বাণীর আমি একান্ত মুগ্ধ ভক্ত। এই প্রবন্ধের ভূমিকায় সেই মুগ্ধতার কথা সবিস্তারে বলা হয়েছে—, টুকরো-টুকরো ভাবে তাঁর গানের অনেক সুরাংশও আমার মনকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে। কিন্তু সব ছাড়িয়ে রবীন্দ্র-সংগীতের সুরের কাঠামোর পর্যালোচনার কথা যদি আসে তা হলে বলতেই হয় যে, রবীন্দ্র-সংগীতের সুরভঙ্গি সম্পর্কে কানের প্রত্যাশা কখনো সম্পূর্ণ তৃপ্ত হয় না। এই অতৃপ্তির একটা কারণ সম্ভবত এই যে, রবীন্দ্র-সংগীতের একটা উল্লেখযোগ্য অংশের সুরের কাঠামোয় সুরের বড্ড বাঁধাবাঁধি। সুরের সেখানে হাত-পা মেলে ছড়িয়ে বসবার সুযোগ বড়ো কম। সুর যতোটা আছে তা বাণীর সুরময় উচ্চারণেই নিঃশেষিত, তার বাইরে সুরের আর কোনো ভূমিকা নেই। ফলে গায়কের স্বাধীনতা রবীন্দ্র-সংগীতে নির্মমভাবে সংকুচিত ; সুরকারের বা কম্পোজারের ইচ্ছাটাই সেখানে চরম এবং পরম।

যতদূর আমার জানা, এ-জিনিস পাশ্চাত্য-সংগীতের সংস্কারের অনুগত, ভারতীয়-সংগীতের চিরাচরিত ঐতিহ্যের সঙ্গে তার বিশেষ কোনো মিল নেই। একাধিক রবীন্দ্র-সংগীতোৎসাহী ব্যক্তি রবীন্দ্র-জীবনের মধ্য ও শেষ-পর্বের গান-গুলিতে 'সুরের মুক্তি' সাধিত হয়েছে মনে করে উল্লসিত বোধ করেন। কিন্তু সুরের এই মুক্তি ভারতীয় সংগীতের মজ্জাগত আদর্শের ব্যত্যয় ঘটিয়ে সাধন করা হয়েছে কিনা, সে-কথা কেউ তলিয়ে দেখেন না। অনেকের এ-রকম ভাবতে ভালো লাগে যে, রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে সুরযোজনার আদর্শের ক্ষেত্রে হিন্দুস্থানী রাগ-সংগীতের নিতান্ত বশংবদ ছিলেন ; পরে তিনি সজ্ঞানে সেই ক্ষেত্র থেকে সরে গিয়েছিলেন এবং রাগরাগিণীর সঙ্গে দেশজ সুরের মিশ্রণজাত নতুন-নতুন সুর রচনার পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে স্বকীয় স্টাইল খুঁজে পেয়েছিলেন। তালের ব্যাপারেও লয়ের অতিরিক্ত বাঁধাবাঁধি থেকে তিনি তাঁর গানকে মুক্তি দিয়েছিলেন। এটাকে রবীন্দ্র-সংগীতের বিবর্তনের একটা বড়ো দিক্‌চিহ্ন বলে মনে করা হয় এবং প্রশংসার ঝোঁক এরই উপর পড়তে দেখা যায়। সুপরিচিত রবীন্দ্র-সংগীতজ্ঞ শ্রীযুক্ত শুভ গুহঠাকুরতা তাঁর 'রবীন্দ্র-সংগীতের ধারা' বইটিতে

বস্তুত এই ভিত্তিতেই রবীন্দ্র-সংগীতের পর্বভাগ করেছেন। কবির কমবেশী ৬০ বছরের সংগীত-জীবনে তিনি তিনটি সুস্পষ্ট স্তরের সন্ধান পেয়েছেন। ১৮৮০ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ যে-সকল গান রচনা করেছেন তার মধ্যে তিনি দেখেছেন 'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষানবিশকাল'। ১৯০০-১৯২০ সালের অন্তর্বর্তী সময়কালকে তিনি বলেছেন 'রবীন্দ্র-সংগীতের মধ্যযুগ', কারণ, "এই সময়কালের রচনার মধ্যে রাগরাগিণীর উপাদানগুলি গ্রহণ করলেন মাত্র অর্থাৎ হিন্দুস্থানী সংগীতের কেবল কাঠামোটি বজায় রেখে আতিশয্য ও অলঙ্কার-বাহুল্যকে বর্জন করলেন এই মধ্যযুগের রচনার মধ্যে, গানের কাব্যাংশ যেখানে সুরকে প্রভাবিত করতে সুরু করেছে।" এর পর থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুকাল (১৯৪১) পর্যন্ত একুশ বছরের সংগীতরচনার কালকে তিনি বলেছেন : 'রবীন্দ্র-সংগীতের স্বরূপ'-এর কাল, যে সময়ের সংগীত "নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের দাবীতে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।" (পৃ ৩, ৪, ৭)

এই পর্ববিভাগ অতিশয় উত্তম, এর মধ্যে সবিশেষ বিচারপ্রবণতা চোখে পড়ে। কিন্তু যে কথাটা এই পর্ববিভাগের মধ্যে বলা হয়নি তা হল এই যে, রবীন্দ্রনাথের শেষ একুশ বছরের গানে যে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে বলা হয়েছে তা একটা মূল্যের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সে মূল্য আর কিছু নয় ; ভারতীয় রাগ-সংগীতের বৈদগ্ধ্য বা দরবারী সংস্কার বর্জন এবং তার স্থলে লোকসংগীতসুলভ সুরের সহজিয়া-চাল গ্রহণ। বাঙালী আমরা, জাতি হিসেবে মনেপ্রাণে রোমান্টিক, সহজিয়া প্রীতি আমাদের মজ্জানিহিত। সহজের একটু স্বাদ পেলেই আমরা গদগদ হয়ে পড়ি। কি সংগীতে কি সাহিত্যে কি শিল্প-কলায় সর্বত্র আমাদের ক্লাসিক সংস্কারের প্রতি অনীহা এবং যে-পরিমাণে এই অনীহা আমাদের জীবনে বলবৎ, সেই পরিমাণেই সাধনার দৃঢ়তায়, শৃঙ্খলাচরণে, প্রযত্নের একাগ্রতায় আমরা বীতরাগ। রবীন্দ্রনাথ ধ্রুপদের স্টাইলে প্রথম জীবনে অজস্র ব্রহ্মসংগীত বেঁধেছিলেন, হিন্দী গান ভেঙ্গে কিছু কিছু বাংলা খেয়াল আর টপ্পাও রচনা করেছিলেন এই পর্বে। কিন্তু সেসব গান অত্যুৎকৃষ্ট হয়েও আমাদের মনোহরণ করতে পারেনি, কারণ তাতে নাকি পরবশ্যতা ছিলো। কিন্তু যেই তিনি দৃশ্যত হিন্দুস্থানী রাগসংগীতের সংস্কার বিসর্জন দিয়ে বা খর্ব করে সুরের তথাকথিত সহজ লীলার ক্ষেত্রে নেমে এলেন, অমনি বাংলাদেশে ধন্য ধন্য রব পড়ে গেলো। বাংলাদেশের মানুষ তাঁর গান প্রাণ-মনের সম্পদ

করে নিলো। এ-কথা কারো মনে হল না, হিন্দুস্থানী গান হিন্দুস্থানী বলেই বর্জনীয় নয়, পরন্তু তা ভারতীয় সংগীতের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রায় সমার্থ বলা চলে।

অবশ্য যে-স্বরবিস্তারের প্রতি আমি আমার পক্ষপাত ঘোষণা করেছি তা রবীন্দ্র-সংগীতের কোনো পর্বেই নেই—না ব্রহ্মসংগীত-রচনার অধ্যায়ে, না মধ্য বা শেষ বয়সের সুর রচনায়। (ব্রহ্মসংগীতের সুরের কাঠামোয় তা থাকার কথাও নয়, কারণ সেসব গান একান্তভাবে ধ্রুপদের কাঠামোয় রচিত আর ধ্রুপদ-অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন যে ধ্রুপদে একমাত্র আলাপ-অঙ্গ ছাড়া—যা রবীন্দ্র-ধ্রুপদে অনুপস্থিত—স্বরবিস্তারের কোনো অবকাশ নেই। খেয়াল বা খেয়ালভঙ্গিম গানে এবং টপ্পা ও ঠুংরী গানেই একমাত্র স্বরবিস্তার লক্ষণীয়।) কিন্তু রবীন্দ্র-ধ্রুপদের এই অপূর্ণতা মেনে নিয়েও বলা যায় সেখানে রাগরসের যে আমেজ আছে, তার সিকির সিকি আমেজও পাওয়া যায় না মধ্য বা উত্তর-জীবনেব গানে, যে পর্বের গানে অত্যুৎসাহী রবীন্দ্র-সংগীতামোদীরা রবীন্দ্র-সংগীতের 'স্বরূপের' সন্ধান পেয়ে থাকেন। যে সব গানে সুরের ও তালের মুক্তি সাধিত হয়েছে বলে বলা হয়, সেগুলির সুরের বাঁধুনি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সেগুলি সহজ সুরারোপের নামে একধরনের সুরের সাবলীল আবৃত্তিমাত্র, যার ভিতর না আছে রাগসংগীতসুলভ সুরের গাম্ভীর্য, না আছে সুরের 'ধুন', আর স্বরবিস্তার যে নেই সে তো আগেই বলেছি।

সুরের এই অতিরিক্ত সহজিয়া চালে আর যারই মন ভরুক, রাগসংগীতের জটিলতা, অলংকার তথা বৈদগ্ধ্যের সংস্কারে, এককথায় সংগীতের দরবারী সংস্কারে অভ্যস্ত শ্রোতার কানমনের কোনোমতেই পূর্ণ তৃপ্তি হতে পারে না। এমন শ্রোতার প্রাণ ভরলেও মন কিছুতেই ভরবে না, কেননা শ্রেষ্ঠ সংগীত মাত্রেরই রসের আবেদন ছাড়াও একটা intellectual আবেদন আছে, যে-আবেদন কেবলমাত্র শিল্পের নাগরিক বৈদগ্ধ্যের মধ্যেই লভ্য। সংগীত-রচনার প্রাথমিক পর্ব থেকে শুরু করে মধ্য বয়সের স্তর পেরিয়ে পরিণত জীবনের স্তর পর্যন্ত রবীন্দ্র-সংগীতের যে বিবর্তন, তা আসলে সুরের নাগরিকতা থেকে লৌকিকতায় ক্রমবিবর্তন। রবীন্দ্রনাথের মধ্য ও শেষ বয়সের গানে বাউল সুরের সবিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃতপক্ষে মধ্যবয়সের স্বদেশী গানের একটা বড়ো অংশে ("আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি" "ও আমার দেশের

মাটি তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা" "বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এতই শক্তিমান তুমি কি এতই শক্তিমান" "মোদের বাঁধন যত শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে" ইত্যাদি) ও পরিণত জীবনের একাধিক গানে বাউল সুরের ঝিলিমিলি অতি-প্রকট। এই তথ্যটি মনে রাখলে নাগরিকতা থেকে লৌকিকতায় বিবর্তন বলতে আমি কী বোঝাতে চাইছি তার ধারণা স্পষ্ট হবে।

রুচিভেদে কেউ কেউ এটাকে বলবেন সুরের উত্তরণ, কেউ কেউ বলতে চাইবেন অবতরণ। আমার নিজের কথা যদি বলেন তো অকপটেই আমি কবুল করবো আমার সুস্পষ্ট পক্ষপাত রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীত-অধ্যায়ের গান-গুলির প্রতি। সে এজন্য নয় যে, আমি খুব ধর্মপ্রবণ ব্যক্তি বা আমার ভিতর দৃষ্টিগ্রাহ্য ভক্তিব্যাকুলতা আছে ; সে এজন্য যে, ওইসব গানে আমি রাগসংগীতের এমনএকটা আমেজ পাই যা পরবর্তী স্তরের গানগুলিতে পাই না। যে যাই বলুন, সংগীতের বেলায় অন্তত সহজিয়া সংস্কার মন ভোলায় না। আমি বা আমার মতো আর যাঁরা, তাঁরা দুরূহেরই পক্ষপাতী এবং সাধনার দীর্ঘস্থায়ী একাগ্রতায় বিশ্বাসী। সহজের লীলায় মেতে উঠবার নামে, ঠুন্‌কো খেলনা নিয়ে মেতে উঠতে আমাদের মন চায় না। যে-সংগীত আয়াস দ্বারা আয়ত্তগম্য নয়, সযত্ন অভিনিবেশের ভূমিকা যাতে কমবেশী অনুপস্থিত, সে-সংগীত সাধারণের গ্রাহ্য হতে পারে, কিন্তু নিশ্চয়ই তা বিচক্ষণের ভোগ্য নয়। ব্রহ্মসংগীতের ধ্রুপদাঙ্গ কাঠামোর মধ্যে সুররচনার যে দৃঢ়বদ্ধ আদর্শ ক্রিয়াশীল, তথাকথিত স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যবিশিষ্ট স্বরূপচিহ্নিত রবীন্দ্র-সংগীতের বাঁধুনিতে তার বিশেষ কোনো প্রভাব দেখতে পাওয়া যায় না। শেষ পর্যায়ের রবীন্দ্র-সংগীতে সুরের সরলীকরণের নীতিকে কার্যকর করতে গিয়ে সুরকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে বলা চলে, এবং কার্যত সেসব গান সুরের একপ্রকার আবৃত্তিতে পর্যবসিত হয়েছে। রবীন্দ্র-সংগীত প্রসঙ্গে বরাবর যা আমার মন টানে তা হল তার সৃষ্টির প্রাচুর্য (কবি গোটা জীবনে প্রায় আড়াই হাজারের মতো গান রচনা করেছিলেন ; এ এক অত্যাশ্চর্য সংঘটন—এরপর কে বলবে যে রবীন্দ্র-সংগীত রবীন্দ্র কাব্য-জীবনের এক প্রক্ষিপ্ত অংশ ?) আর তার বাণীর অপরূপ সম্পদ। সে এমন বাণী যে, সুর বাদ দিয়েই তা চেখে চেখে উপভোগ করা যায়, সুরের প্রয়োজন হয় না। ফলত, শেষের দিকের এমন অনেক অতি-সরলীকৃত গান আছে যেগুলির বাণী, সুর-ব্যতিরেকেই সমধিক ভোগ্য বলে মনে করি। "প্রাণ চায়, চক্ষু না চায়, মরি একি

তোর দুস্তর লজ্জা" কিংবা "আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে চাও কি"—জাতীয় গান সুর ছাড়াই অবধান.করতে বেশি ভালো লাগে।

মনে হয় রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁর গানের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে বিলক্ষণ অবহিত ছিলেন, অন্তত যখন থেকে তাঁর গান লৌকিকতার দিকে ঝুঁকলো তখন থেকে তিনি তাঁর গানকে জ্ঞানতই লোকজীবনের স্তরে নামিয়ে আনবার সাধনায় নিয়োজিত হয়েছিলেন, এরূপ অনুমান করলে ভুল হয় না। সংগীত-সম্পর্কে চিঠিতে ভাষণে প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের বহু উক্তি আছে। বিভিন্ন সময়ে কৃত বলে তাদের মধ্যে অনেক পরস্পরবিরোধিতা বিদ্যমান। কাজেই কোনো একটি উক্তিকে চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করবার অসুবিধা থাকলেও, লেখকের নিজ বক্তব্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এরূপ সাময়িক এক একটি উক্তি নজীর হিসেবে গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নেই। এই প্রকারের একটি রবীন্দ্র-জবানী হল— "যারা খেটে খায়, আপিসে যায় তাদের পক্ষে এসব গান (ওস্তাদি) হয়ে উঠে না ; তাদের পক্ষে ওস্তাদদের মতো গলা সাধা শক্ত। সেইজন্যে এখানকার গান ব্যবসায়ীদের বাইরে থাকাই ভালো। গান হবে যাতে যারা আশেপাশে থাকে তারা খুশি হয়······বাইরে হাততালি পাবার জন্যে নয়।······আমার গান যদি শিখতে চাও, নিরালায় স্বগত নাওয়ার ঘরে কিংবা এমনি সব জায়গায় গলা ছেড়ে গাবে। আমার আকাঙ্ক্ষার দৌড় এই পর্যন্ত, এর বেশি ambition মনে নাই রাখলাম।"

এই কথাগুলি যে তিনি মধ্য ও শেষ পর্বের গানগুলির কথা মনে রেখে বলেছিলেন তা বুঝতে কষ্ট হয় না, কেননা প্রথম দিকের গানে ওস্তাদি গানের সুস্পষ্ট রেশ ছিলো ; সেসব গান ছিলো রাগরাগিণীভিত্তিক এবং ত্রিতাল, একতাল, আড়াঠেকা, যৎ, তেওট, ঝাঁপতাল, সুরফাঁকতাল প্রভৃতি সমপদী-বিষমপদী উচ্চতাললয়ে ছিলো তাদের কলেবর বাঁধা। ধ্রুপদের চার কলি বা 'তুক'-এর রেওয়াজ সেসব গানে সচেতনভাবে অনুসরণ করা হত। মধ্য ও শেষ বয়সের গানে যদিও চার-কলির এই বহিরঙ্গ রূপ অব্যাহত আছে, কিন্তু সুরভঙ্গি ও তালভঙ্গির দৃষ্টিগ্রাহ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তাছাড়া, প্রথম দিকের গান ছিলো শুদ্ধ রাগরাগিণীর ভিত্তিতে গঠিত। কিন্তু পরবর্তী স্তরের গানগুলিতে জেনেশুনেই দুই বা ততোধিক সুরের মিশ্রণে এক-একটি গানের দেহ গড়ে তোলা হয়েছে। যাকে সাংগীতিক পরিভাষায় ছায়ালগ বা সালংক (দুই রাগের মিশ্রণে

গঠিত রাগ) এবং সংকীর্ণ (দু'এর অধিক রাগের মিশ্রণে গঠিত রাগ) রাগ বলে, তার রীতি অবলম্বন করে হিন্দুস্থানী ও দেশজ (যথা বাউল, কীর্তনের সুর, ভাটিয়ালি ইত্যাদি) সুরের মিশ্রণে নতুন নতুন যৌগিক সুর সৃষ্টি করে তাকে এক-একটি গানের ভিত্তি করা হয়েছে। এই যৌগিক প্রক্রিয়া যে সবসময় শুভফলদায়ক হয়েছে এমন কথা বলতে পারিনে। বরং অনেক সময় দেখা গেছে, তাতে সুর জটিলতার পথে না-গিয়ে অতি-সরলীকরণের দিকে ঝুঁকেছে। শুদ্ধ রাগরাগিণীর আদর্শের মধ্যে এমন একটা ঋজুতা আছে, একরাগভিত্তিক গানের বাঁধুনির মধ্যে এমন একটা রসের কৌলীন্য আছে যা নানা জাতের সুরের মিশোলের মধ্যে সহজেই হারিয়ে যায়। কবি অবশ্য নিজে এই মিশ্রণ-প্রক্রিয়াকে বাংলা গানের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে চিহ্নিত করেছেন, ["বাংলা পদগান জলেরই মতো যৌগিক সৃষ্টি—দুইয়ে মিলে তবে অখণ্ড। হিন্দুস্থানী গান রূঢ়িক, তা একাই বিশুদ্ধ। (শ্রীদিলীপকুমার রায় রচিত 'সাঙ্গীতিকী' গ্রন্থে উৎকলিত)] কিন্তু শ্রুতির সাক্ষ্য এই যে, রসের শুদ্ধতার দিক দিয়ে অনেক সময় যৌগিক থেকে রূঢ়িক বেশী গ্রহণযোগ্য হয়, যেমন ঠুংরীর মিশ্ররস অপেক্ষা খেয়ালের একরাগাশ্রয়ী শুদ্ধরস প্রায়শ অনেক বেশি শ্রুতিমধুর মনে হয়।

যাই হোক, এসব হল রুচিভিন্নতার প্রশ্ন। কার কোন শ্রেণীর গান ভালো লাগবে তা ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ওপর নির্ভর করবে, এ-নিয়ে বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়ে লাভ নেই। তবে কবিগুরুর একটা কথায় আমার সবিনয় আপত্তি, যা এ-প্রসঙ্গে না জানিয়ে পারছি না। কবি বলেছেন, "ওস্তাদ মানুষটাই মাঝারি ; এবং মাঝারির প্রভুত্বই জগতে সবচেয়ে বড়ো দুর্ঘটনা। এই জন্যে ভারতের বৈঠকী-সংগীত কালক্রমে সুরসভা ছেড়ে অসুরের কুস্তির আখড়ায় নেমেছে। সেখানে তাল-মান-লয়ে তাণ্ডবটাই প্রবল হয়ে ওঠে, আসল গানটা ঝাপসা হয়ে থাকে।" (ছন্দ) মনে হয় ওস্তাদি গানের বিরুদ্ধে কবির মনে বরাবর কেমন যেন একটা বিরূপতামূলক বদ্ধ ধারণা ছিলো, যার অভিব্যক্তি ঘটেছে এই কয়টি ছত্রের মন্তব্যে। মন্তব্যটির যৌক্তিকতা মেনে নিতে পারা যায়-না। "ওস্তাদ মানুষটা মাঝারি" এমন ঢালাও উক্তি মোটেই যুক্তিসহ নয়। পরলোকগত আবদুল করিম খাঁ, ফৈয়াজ খাঁ, কেশরবাই কারকার, গোলাম আলি খাঁ, আমীর খাঁ, পালুস্কর কিংবা জীবিত গায়ক-গায়িকাদের মধ্যে মল্লিকার্জুন মনসুর, ভীমসেন যোশী প্রমুখ সেরা কলাবৎদের অপূর্ব সুরসৃষ্টির কৌশল যাঁরা প্রত্যক্ষ

করেছেন তাঁরা "ওস্তাদ মানুষটা মাঝারি" কিংবা "বৈঠকী সংগীত কালক্রমে সুরসভা ছেড়ে অসুরের কুস্তির আখড়ায় নেমেছে" এমন আপ্তবাক্য কোনোমতেই মানতে চাইবেন না। বৈঠকী সংগীতে কখনো কখনো তাল-মান-লয়ে তাণ্ডব প্রবল হয়ে ওঠে না এমন নয়, কিন্তু তার জন্যে দায়ী অপকৃষ্ট ওস্তাদের দল—অপকৃষ্টের দায়ে উৎকৃষ্টকে অপরাধী করা কোনোক্রমেই উচিত হয় না। শ্রেষ্ঠ ওস্তাদেরা কণ্ঠে অথবা যন্ত্রে প্রায়ই যে অপূর্ব স্বরলহরী সৃষ্টি করেন, তাকে অন্য কোনো ভাবপ্রকাশক ভাষার অভাবে এককথায় 'স্বর্গীয়' বলা চলে। এমনতরো নজীর চোখের ওপর থাকা সত্ত্বেও ওস্তাদি জিনিসটাকে 'মাঝারি' বলে নির্দেশ করা মনের কোনো মজ্জাগত বিমুখতাকে ভাষা দেওয়া ছাড়া আর কিছু নয়, বিনম্র অথচ দৃঢ়স্বরে এ কথা বলবো।

বর্তমান উপলক্ষে উপরের প্রসঙ্গ উত্থাপনের একটা উদ্দেশ্য আছে। অকারণে সে কথার অবতারণা করিনি। আমার মনে হয়, ওস্তাদ বা ওস্তাদি গান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই আপাতযুক্তিহীন বৈরূপ্যই তাঁকে ধীরে ধীরে রাগসংগীতের জগৎ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে এবং যাকে আমরা সুরের সহজিয়া সাধন বলি, তার চর্চায় উদ্বুদ্ধ করেছে। ব্রহ্মসংগীতের মাধ্যমে তিনি আমাদের সামনে গানের এক শুদ্ধ-পবিত্র আদর্শ ধরে দিয়েছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে নিজেই সে আদর্শের খণ্ডন করেছিলেন। 'সংগীতের মুক্তি' বিধানের নামে তিনি সংগীতকে নিতান্তই সাধারণগ্রাহ্য তথা অনায়াসলভ্য করে তুলেছিলেন, এমন সংগীত যা মামুলি গায়ক-গায়িকাদেরই শুধু চর্চার বিষয় হয়েছে এবং স্বাধীন সুরসৃষ্টির কৌশল সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ও রাগরাগিণীর জ্ঞানবর্জিত মাঝারি শিল্পীদেরই কেবল খ্যাতি কুড়নোর ক্ষেত্র হয়েছে। রাগজ্ঞান তথা সুরবিস্তার ব্যতিরেকে কখনো ভারতীয় সংগীত হয় না—এই প্রত্যয়ের বোধ উত্তর-জীবনের রবীন্দ্র-সংগীতে প্রবলভাবে অনুপস্থিত ; আর তা অনুপস্থিত বলেই সৃষ্টির এত প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য সত্ত্বেও মধ্য ও শেষ-পর্বের বহুসংখ্যক রবীন্দ্র-সংগীত বিচক্ষণ শ্রোতার প্রত্যাশাকে বহুলাংশে অপূর্ণ রাখে। প্রভূত-অনুশীলনসাপেক্ষ ধ্রুপদাঙ্গ ব্রহ্মসংগীতের চর্চা সযত্নে একপাশে সরিয়ে রেখে যেসব জনপ্রিয়তাসন্ধানী স্থূলভযশোপ্রার্থী গায়ক-গায়িকার দল রবীন্দ্রনাথের উত্তরকালীন সৃষ্টির ফসল, লৌকিক সুরের আমেজযুক্ত সুরে-তানে-লয়ে অজটিল গানগুলি নিয়ে মাতামাতি করেন, তাঁদের সুরের স্বাধীন বিকাশের তত্ত্ব সম্পর্কে কোনো ধারণা আছে কিনা সন্দেহ। 'গীতবিতান' বা

'স্বরবিতান' পাশে রেখে গান গাওয়া মানে গানের কথা ও সুর মুখস্থ বলে যাওয়া—এ অভ্যাস ভারতীয় সংগীতের ঐতিহ্যের একেবারেই বিরোধী। যেসব গায়ক-গায়িকার স্বকীয় স্বাধীনতা সম্পর্কে মর্যাদাবোধ নেই তাঁরাই শুধু এ-জাতীয় অনুকরণাত্মক ক্রিয়ায় আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারেন।

বলা হবে, ব্রহ্মসংগীতের সুরও তো বাঁধা, সেখানেও তো সুরকারের অভিপ্রায়ের চৌহদ্দির বাইরে গায়কের স্বাধীন বিচরণের অবকাশ কড়া হস্তে সংকুচিত—তবে এই শ্রেণীর গান সম্পর্কে এই-প্রবন্ধে এত সহর্ষ মনোভাব প্রকাশ করা কেন? এর উত্তরে বলবো, ব্রহ্মসংগীতের সুরও পরবর্তীকালীন গানগুলির সুরের মতো বাঁধা, অর্থাৎ পূর্বনির্ধারিত ঠিক কথা, কিন্তু সেখানে বিশেষভাবেই রাগের রস পাওয়া যায়, আর পাওয়া যায় সুরের ঋজুবদ্ধ আদর্শের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। পরবর্তী গানে এ-জিনিস পাইনে। সেসব গানের ঢিলে-ঢালা বাঁধুনিতে কেমন যেন রস থেকে থেকে এলিয়ে পড়তে চায়। আমার মনে হয়, রবীন্দ্র-সংগীতের মর্যাদা যদি স্থায়ী ও অবিকৃত রাখতে হয় তাহলে ব্রহ্মসংগীতের সবিশেষ চর্চা বাঞ্ছনীয়। ব্রহ্মসংগীত-পর্যায়ের এক-একটি গান যে এক-একটি হীরের টুকরো। "জগতে আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ" (সরফরদা, একতাল), "আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে" (মিশ্র হাম্বীর, ফেরতা), "আজি প্রণমি তোমারে চলিব নাথ সংসার কাজে" (বিভাস, একতাল), "আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর" (মহীশূর ভজন, একতাল), "এ ভারতে রাখো নিত্য, প্রভু তব শুভ আশীর্বাদ" (সুরট, চৌতাল), "এবার নীরব করে দাও হে তোমার মুখর কবিরে" (দরবারী কানাড়া, ত্রিতাল), "অন্তর মম বিকশিত করো অন্তরতর হে" (ভৈরবী, একতাল), "নিবিড় ঘন আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা" (সাহানা, নবতাল), "দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া নিত্য কল্যাণ-কাজে হে" (সুরট-মল্লার, একাদশীতাল), "যে কেহ মোরে দিয়েছ সুখ, দিয়েছ তাঁরি পরিচয়" (কাফি, তেওরা)—অগণিত ব্রহ্মসংগীতের মধ্যে ইতস্তত মনে আসা অনেকগুলি গানের প্রথম পদ এখানে বসিয়ে গেলাম, গানগুলি সম্পর্কে একটা প্রত্যক্ষ ধারণা জন্মাবার জন্যে। ইতস্তত মনে এসেছে বটে তাই বলে গানের পদ বা সুর কোনোটাই স্বল্পমূল্যের নয়, বরং সব ক'টিই অত্যুৎকৃষ্ট পর্যায়ের সৃষ্টি। এর ভিতর আবার দুটি গান আছে, যাতে রবীন্দ্রনাথ নতুন তালযোজনা করেছেন, যা তাঁরই সৃষ্টি। এর একটি নবতাল—

নয় মাত্রার সমষ্টি ; অন্যটি একাদশী—এগারো মাত্রার সমষ্টি। এমন সব অনন্য-সুন্দর, নতুন নতুন তাল সৃষ্টি করবার পরে-পরেই ধরাবাঁধা শাসন থেকে গানকে মুক্ত করতে যাওয়া, আর যাই হোক সংগীতের প্রগতির সূচক নয়। এর একমাত্র মানেই হয়, এবং তা হল সংগীতকে তার কৌলীন্য থেকে ভ্রষ্ট করে লোকায়ত করবার ব্যগ্রকামনায় সংগীতের জাতিচ্যুতি।

রবীন্দ্রনাথ অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত এক পত্রে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেছিলেন—"প্রথম বয়সে আমি হৃদয়ভাব প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি গানে, আশা করি সেটা কাটিয়ে উঠেছি পরে। পরিণত বয়সের গান ভাব বাৎলাবার জন্যে নয়, রূপ দেবার জন্যে।" ('সুর ও সঙ্গতি', ধূর্জটি-প্রসাদ মুখোপাধ্যায়)। অর্থাৎ পরবর্তী গানগুলি রূপ সৃষ্টির ফলশ্রুতি, নিছক ভাবপ্রকাশের ফসল সেগুলি নয়। আর্টের ক্ষেত্রে রূপকলার সর্বৈব মূল্য, তাই এই উক্তির নিহিতার্থ হল এই যে, পরিণত বয়সের গানগুলি প্রথম বয়সের গান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কবি-কৃত এই অভিমতেরই সূত্র ধরে প্রখ্যাত রবীন্দ্র-সংগীতবিদ্ শ্রীশান্তিদেব ঘোষ তাঁর 'রবীন্দ্র-সংগীত' গ্রন্থে লিখেছেন—"তবুও জনসাধারণের কাছে এই অল্প বয়সের গানগুলি ভালো লাগে কেন? বিশেষ করে বলতে পারি যে, আমাদের জীবনে এই-সব গানের ভাব ও ভাষা, সুরে মিশে আমাদের মনে যত সহজে ধাক্কা দেয় তেমন সহজে পরবর্তী জীবনের গানগুলি মনে জায়গা পায় না। তার জন্য নিজেকে তৈরি করার প্রয়োজন হয়, সেগুলি সংস্কৃতিমান মনের খোরাক।" (পৃ ৫৯)

বক্তব্যের প্রথমাংশ সম্পর্কে মতভেদ হওয়ার কোনো কারণ নেই যেহেতু এটি আমাদেরও মত। কিন্তু বক্তব্যের শেষাংশের বিষয়ে স্পষ্টতই মতভেদের অবকাশ আছে। যদি এমন বলা হত যে, রবীন্দ্রনাথের গানের ভাব ও কল্পনা, অভিজ্ঞতা ও বয়ঃপ্রভাবে ক্রমোৎকর্ষলাভের মধ্যে দিয়ে উত্তর জীবনের গানগুলির পদের মধ্যে সবিশেষ উজ্জ্বল বাণীরূপ প্রাপ্ত হয়েছে এবং সেগুলি সংস্কৃতিমান মনের খোরাক তাহলে বিশেষ কিছু বলবার থাকতো না। কিন্তু এ তো তা নয়, এ যে ক্রমবিবর্তিত সেই সুরের বিষয়েই নিজেকে তৈরি করার প্রয়োজনের কথা বলা হয়েছে এবং সেই বিবর্তিত সুরকেই সংস্কৃতিমান মনের খোরাক বলে নির্দেশ করা হয়েছে। এমনতরো বক্তব্য মানতে পারা যায় না। এই প্রবন্ধে এতক্ষণ ধরে যা বলবার চেষ্টা করা হয়েছে উদ্ধৃত অংশের বক্তব্য তার বিরুদ্ধে

যায়। কিন্তু শ্রীশান্তিদেব ঘোষ মহাশয়ের স্বকীয় শিল্পীসত্তা ও সাংগীতিক অভিজ্ঞতার ব্যাপকতার প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা রেখেই বলতে পারি, তিনি তাঁর আলোচ্য অভিমতের দ্বারা ব্রহ্মসংগীতসমূহের প্রতি যথোচিত সুবিচার করেননি। এটাকে শান্তিদেববাবু আশা করি তাঁর প্রতি ব্যক্তিগত কটাক্ষ বলে ধরে নেবেন না যদি বলি, রবীন্দ্র-সংগীতশিল্পীরা সাধারণভাবেই রাগসংগীত-সম্বন্ধে কিছুটা অচেতন —তাঁদের এই অচেতনতার প্রতিফলন ঘটে ব্রহ্মসংগীত-সম্বন্ধে অল্পাধিক অনাগ্রহের মধ্যে। রেডিও আর গ্রামোফোনের বেশির ভাগ রবীন্দ্রসংগীতশিল্পীই দেখি ব্রহ্মসংগীতকে সযত্নে বর্জন করেন এবং তাঁদের সবটুকু ঝোঁক প্রকাশ করেন মধ্য বা শেষ বয়সের গানগুলির ওপর। তাঁরা নিজেরা উচ্চ সংস্কৃতিমান বা সংস্কৃতিমান মনের খোরাক জোটাবার জন্যে এই গানগুলি বেছে নেন, এ-কথা ভাবতে পারলে সন্তোষ লাভ করা যেত, কিন্তু তেমন ভাবতে পারার পক্ষে একান্তই বাস্তব প্রমাণাভাব।

আসলে সহজ ও সুলভের প্রতি মজ্জাগত আকর্ষণবশেই এইসব রবীন্দ্র-গায়কগায়িকারা পরবর্তী জীবনের গানগুলির পাশে গিয়ে ভিড় করেন। এসব গানে রাগের প্রণালীবদ্ধ জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না, তালের নিয়মানুবর্তিতারও তেমন প্রয়োজন হয় না,—শুধু সুমিষ্ট একটি কণ্ঠ থাকলেই হল, যার সাহায্যে সংশ্লিষ্ট গানকে মুদ্রিত বইয়ের পৃষ্ঠা থেকে হুবহু কণ্ঠধৃত করা সম্ভব। এই আবৃত্তিকরণের প্রক্রিয়ায় কণ্ঠের কারুকার্যেরও প্রয়োজন নেই ; বরং ও বালাই না থাকাটাই রেওয়াজ। প্রচলিত রবীন্দ্র-সংগীতের জগতে যাঁর কণ্ঠস্বর যতো বেশী 'লেপাপোঁছা' অর্থাৎ সরল ও অলঙ্কাররিক্ত, তাঁর বাজারদর তত বেশি।

এসব কথার দ্বারা রবীন্দ্র-সংগীতের অপূর্ব সৃষ্টির মহিমাকে খাটো করা আমার অভিপ্রায় নয়—তার নবমূল্যায়নের উদ্দেশ্যেই এতো কথা বলা। অতিরিক্ত রবীন্দ্রোন্মাদনার প্রবাহে যখন কালপ্রবাহেই ভাটা পড়বে তখন নতুন নিরিখে রবীন্দ্র-সংগীতের পুনর্বিচারের প্রয়োজন দেখা দেবে বলে মনে হয়। তারই খানিকটা ভূমিকা এখানে আমি করে রাখলুম। আমার এই প্রবন্ধের যুক্তিক্রম থেকে এমন ধারণা যেন কারো মনে না জাগে, রবীন্দ্রনাথের তুঙ্গস্পর্শী সাংগীতিক প্রতিভার বিশালতা ও উচ্চতা সম্পর্কে আমার চেতনা দুর্বল। মোটেই তা নয়। রবীন্দ্র-সংগীতের সৃষ্টিপ্রাচুর্য ও বৈচিত্র্যের প্রশংসা শতমুখে করেও শেষ করা যায় না। পূর্বেও বলেছি আবারো বলি, একজন মূলত সাহিত্য-

শিল্পীর পক্ষে একজীবনে ন্যূনাধিক আড়াই হাজার গান রচনা করা ও তাতে স্বয়ং স্বরারোপ—এ এক বিস্ময়কর ব্যাপার। পৃথিবীর শিল্পের ইতিহাসে এমন-তরো ঘটনার নজীর খুবই বিরল। রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীত, স্বদেশী গান, বিচিত্র ভাবপ্রকাশক ঋতুসংগীত এ সবের তুলনা নেই। পূজা, প্রকৃতি ও প্রেম—এই তিন মূল ভাগে গানগুলিকে ভাগ করা চলে। এর ভিতর পূজা ও প্রকৃতির গানগুলিতেই রস অধিক গভীরে গিয়ে পৌঁছেছে। 'প্রেম'-পর্যায়ের গানগুলির মধ্যে যে-সব গানের বাঁধুনিতে রাগের আমেজ আছে, সেগুলি সমধিক মর্মগ্রাহী হয়ে উঠেছে। স্বদেশী গান এক স্বতন্ত্র পর্যায়ের সৃষ্টি। এসব কটি পর্যায়ের গানেরই সম্যক্ মূল্যায়ন হওয়া দরকার এবং যেখানে ন্যায্যভাবে ঝোঁক পড়া উচিত সেখানে সেই ঝোঁক ন্যস্ত হওয়া আবশ্যক। এক্ষেত্রে আমরা যেন পূর্ব-স্বীকৃত মতের দ্বারা চালিত না হই।

অতুলপ্রসাদের গান

সুরকার অতুলপ্রসাদ

গীতিকার ও সুরকার অতুলপ্রসাদ সেন বাংলা গানের জগতের একটি বিশিষ্ট নাম। বাংলা গান সম্পর্কে আমরা যখনই আলোচনা করি তখনই রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলাল-রজনীকান্ত ও কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর নাম সমসারে উচ্চারণ করা হয়। বলতে গেলে বাংলা গানের এঁরাই হলেন পঞ্চপ্রধান রচয়িতা —এককালীন গীত ও সুরের স্রষ্টা। অথচ অতুলপ্রসাদ তাঁর গোটা জীবনে মাত্র ২০৬টি গান রচনা করেছিলেন। আরও গান হয়ত তাঁর থাকা সম্ভব, কিন্তু অতুলপ্রসাদের গীতিসঞ্চয় 'গীতিগুচ্ছ' এবং পাঁচখণ্ডে সমাপ্ত স্বরলিপি পুস্তক 'কাকলি' (দুটি বইয়েরই প্রকাশক সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ, কলকাতা)-তে মাত্র এই দুশো ছয়টি গানেরই সংগ্রহ ধরা আছে। স্মরণ করা যেতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথ এক জীবনে গান লিখেছিলেন সোয়া দু'হাজার আর নজরুল সাড়ে তিন হাজারের মত। সেইস্থলে এত অল্পসংখ্যক গানের সঞ্চয় নিয়ে অতুলপ্রসাদ কেমন করে পূর্বোক্ত পঞ্চপ্রধানের পংক্তিভুক্ত হলেন? নিশ্চয়ই তাঁর গানের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যাতে তাঁর গান লক্ষণীয় এবং বাংলা গানের অন্যান্য দিক্‌পাল সুরকারদের রচনার পাশে একই সঙ্গে গণনীয় হয়ে উঠেছে।

কী সেই বৈশিষ্ট্য? আর কেমন তার ধরন?

বাংলা গানের সুরের বাঁধুনিতে ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পার সবিশেষ প্রভাব থাকলেও অতুলপ্রসাদ সেনের আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত সে গানে ঠুংরীর তেমন প্রভাব ছিল না। বাংলা গানে এই বিশেষ প্রভাবটির আমদানী করেন অতুল-প্রসাদ এবং পরে তাঁর দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং যুগরুচির কারণেও অনেকাংশে, নজরুল এই বিশেষ ধারার আরও সম্প্রসারণ ঘটান। রবীন্দ্র-সংগীতের মূলভিত্তি হলো ধ্রুপদ। দ্বিজেন্দ্রলালের গানের পটভূমিতে আছে ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পার এককালীন প্রভাব। কান্তকবি রজনীকান্তের গানের কাঠামোও গড়ে উঠেছে ধ্রুপদ ও খেয়াল গানের যুগ্ম আদর্শে। কিন্তু অতুলপ্রসাদ কমবেশী এঁদের সমসময়ের মানুষ হলেও (জন্ম ২০শে অক্টোবর, ১৮৭১) সুররচনায় সম্পূর্ণ ভিন্নপথ অনুসরণ করেছেন। তিনি তাঁর গানে ধ্রুপদকেও

গ্রহণ করেননি, খেয়াল-টপ্পাকেও নেননি—গানের ভিতরূপে ব্যবহার করেছেন এমন এক সুরভঙ্গি, যার পূর্ব নজীর বাংলা গানে ছিল না। তিনি তাঁর গানের সুরের অবয়বনির্মাণে একান্তভাবে ঠুংরীকেই আশ্রয় করেছেন বরাবর। ঠুংরীর ছোটখাট সূক্ষ্ম সুরের কারুকার্যে তাঁর গান ভরপুর। ঠুংরীর সুরমিশ্রণ বা সুরবিস্তার তিনি নেননি, হয়ত বাংলা গানের প্রকৃতির সঙ্গে তা খাপ খাবে না মনে করেই ওই পথে ঘেঁষেননি, তবে ঠুংরীর সুরের অলঙ্করণের দিকটির প্রতি যথোচিত অবহিত হয়ে ওই অলঙ্করণ-রীতিকে তার গানে সম্যক্ মর্যাদা দিয়েছেন। অতুল-গীতির মণ্ডনকলা তারিফ করবার মত এক শিল্পকৃতি।

সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন পরিবেশের দ্বারাই মানুষের জীবন বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়। মানুষের শিক্ষাদীক্ষা রুচি বিশ্বাস গঠনের ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিকের প্রভাব অপরিসীম বলা চলে। একথা যে কতদূর সত্য তা অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয়ের ব্যক্তিজীবন বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে। তাঁর লেখাপড়া কলকাতায় ও বিলেতে। বিলেত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরে আসেন। আইন-ব্যবসায়ী-রূপে তাঁর জীবনের একটা মোটা ভাগ উত্তরপ্রদেশের লক্ষ্ণৌ শহরে অতিবাহিত হয়। লক্ষ্ণৌ শুধু তাঁর জীবিকার ক্ষেত্রই ছিল না, বিচিত্র কর্মকাণ্ডেরও ক্ষেত্র ছিল। স্বীয় ব্যক্তিত্বপ্রভাবে ও চারিত্রগুণে তিনি এই শহরের একজন বিশিষ্ট নাগরিকের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন। শহরের প্রধান প্রধান বিদ্বজ্জন ও সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলির সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠরূপে জড়িত ছিলেন। এক পর্বে তিনি লক্ষ্ণৌ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্যও নিযুক্ত হয়েছিলেন।

লক্ষ্ণৌ শহরের সঙ্গে বিচিত্র সূত্রে যোগাযোগ অতুলপ্রসাদের সাংস্কৃতিক দৃষ্টি-ভঙ্গীর আমূল রূপান্তর সাধন করে। বিশেষ করে সংগীতের ক্ষেত্রে তিনি নতুন দিগ্‌দেশের সন্ধান পান। লক্ষ্ণৌ শহর ঠুংরী গানের জন্য বিখ্যাত। কদরপিয়া থেকে শুরু করে একালের তরুণ প্রজন্মের কলাবৎ পর্যন্ত বহু প্রসিদ্ধ ঠুংরী গায়কের ও রচয়িতার জন্ম এই শহরে। উত্তরপ্রদেশে ধ্রুপদ-খেয়ালের বহু প্রসিদ্ধ কেন্দ্র আছে, যেমন আগ্রা, ফররুখাবাদ, বুলন্দসর, কিরানা, সাজাহানপুর, ইত্যাদি। কিন্তু ঠুংরীচর্চার কেন্দ্র বলতে বিশেষভাবে লক্ষ্ণৌকেই বুঝিয়ে থাকে। লক্ষ্ণৌর ঠুংরীর লৌকিক নাম 'লচা ঠুংরী'—শহরের নামের ব্যুৎপত্তি থেকেই এরূপ নামকরণ হয়েছে মনে হয়। অতুলপ্রসাদ লক্ষ্ণৌ প্রবাসকালে 'লচা ঠুংরী'র রস নিঃশেষে পান করেন। শুধু পান করেই ক্ষান্ত থাকেননি, তাকে ব্যবহারেও

পর্যবসিত করেছেন। তিনি যে সব গান লিখেছেন তার অধিকাংশেরই সুরের গঠনে ঠুংরীর আমেজ লক্ষ্য করা যায়। আমেজটি কোথাও সরবে উচ্চারিত নয়, ফল্গুপ্রবাহের মত নিঃসাড় লীলায় বহমান। আর সেই কারণেই ওই ধরনের স্বরক্রিয়ার মাধুর্য আরও বেশী করে অনুভূত হয় শ্রোতার কানে। অতুলগীতির ঠুংরী অলংকরণের বৈশিষ্ট্য এখানে যে, তা কোথাও স্পষ্ট-প্রত্যক্ষ নয়, প্রায়-নিঃশব্দ তার ক্রিয়া। ওই জন্যই তার আবেদন আরও মধুর মনে হয়।

অতুলপ্রসাদ প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন। পরেও তিনি এই যোগ রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু লক্ষ করলে দেখা যাবে, অতুলপ্রসাদ তাঁর গানের বাণী অংশে যদিও একজন অনুগত ভক্তের মত রবীন্দ্রনাথের ভাবাদর্শের দ্বারা আপনাকে প্রভাবিত হতে দিয়েছেন, সুরের নির্মিতিতে কিন্তু লক্ষ্ণৌর ঠুংরী ঢঙয়েরই প্রাধান্য। এটা মূলত সংগীতের মুসলমানী ঢঙ, যার সংস্কার গড়ে উঠেছে প্রথমে মুঘল দরবারের আবহাওয়ায়, পরে উত্তর ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়ানো আমীর-ওমরাহ ও নবাব-নাজিমদের দরবারসভায়। অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় একে বলেছেন 'আমীরী সংগীত'। বলা আবশ্যক যে, এই 'আমীরী' বা মুসলমানী সংগীতের প্রভাব রবীন্দ্র-সংগীতে খুব কম, অনুপস্থিত বললেই চলে। সুতরাং ভাবজীবনে রবীন্দ্রনাথ ও অতুলপ্রসাদ সহপথের পথিক হলেও সুররচনায় তাঁদের দুয়ের পথ দৃষ্টিগ্রাহ্যভাবেই ভাগ হয়ে গিয়েছে। অতুল-প্রসাদের গানের ভক্তিভাব অতি গভীর। এই ক্ষেত্রে কবিগুরুর কাছে তাঁর ঋণ অপরিশোধ্য। বস্তুত, কবির ভাগবত অনুভূতির প্রগাঢ়তা দৃষ্টান্ত প্রভাবে জ্ঞাতসারেই হোক আর অজ্ঞাতসারেই হোক অতুলপ্রসাদের গানের কথাংশের উপর স্পষ্ট ছায়া বিস্তার করেছে। কিন্তু সুর সম্বন্ধে সে কথা বলা চলে না। সেখানে অতুলপ্রসাদ স্বতন্ত্র, অনন্য, অঋণী। অন্তত রবীন্দ্র-সুরের সঙ্গে সে-সুরের মোটেই মিল নেই। একমাত্র অতুলপ্রসাদের বাউল কীর্তন ও কোরাসের ঢঙয়ের মধ্যে চেষ্টা করলে কিছুটা রবীন্দ্র-ভঙ্গি আবিষ্কার করলেও করা যেতে পারে কিন্তু সাধারণ বর্গের গানগুলির সুরে রবীন্দ্র-প্রভাব ছিঁটেফোঁটাও নেই। তাতে ঠুংরীরই মধুর লীলা। আর ঠিক এই কারণেই প্রসিদ্ধ সংগীতসমালোচক ধূর্জটিপ্রসাদ অতুলপ্রসাদকে এক ব্যক্তিগত পত্রে যথার্থই লিখেছিলেন—"অতুলদা, আপনি বাংলা ভাষায় ঠুংরী এনেছেন। হিন্দুস্থানী সংগীতের সঙ্গে আপনি

যোগসূত্র বজায় রেখেছেন।...আপনার গানে খুব বেশী মুসলমানী চালের আমেজ আছে।"

তবে অতুলপ্রসাদের ঠুংরীভঙ্গিম বাংলা গানে সুরবিস্তার বা সুরমিশ্রণ নেই। এটা তাঁর গানের একটা বড় অপূর্ণতা। এই ক্ষেত্রে রাগমনস্ক শ্রোতার প্রত্যাশা স্পষ্টতই ক্ষুন্ন হতে দেখা যায়। এ বিষয়ে পরের প্রবন্ধে ("আধুনিক বাংলা গান") বিস্তৃত আলোচনা আছে।

অতুলপ্রসাদের ঠুংরী সুরভিত্তিক যেসব গান সমধিক প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে তার কয়েকটি উল্লেখ করছি। কে আবার বাজায় বাঁশী এ ভাঙা কুঞ্জবনে (পিলু বারোয়াঁ), যাব না যাব না যাব না ঘরে। বাহির করেছে মোরে পাগল ক'রে (নটমল্লার), ওগো আমার নবীন সাকি ছিলে তুমি কোন্ বিমানে (মিশ্র পিলু), ডাকে কোয়েলা বারে বারে (গৌড় মল্লার), তুমি মধুর অঙ্গে নাচো তো রঙ্গে, নূপুর ভঙ্গে হৃদয়ে (গুজরাটী খাম্বাজ), চাঁদিনী রাতে কে গো আসিলে (মিশ্র দেশ-পিলু), কত গান তো হলো গাওয়া, আর মিছে কেন গাওয়াও (গজল), শ্রাবণ-ঝুলাতে বাদল-রাতে তোরা আয় গো, কে ঝুলিবি আয় (পিলু), মোরা নাচি ফুলে ফুলে দুলে দুলে (নটমল্লার), নিদ্ নাহি আঁখিপাতে (বেহাগ), কে তুমি বসি নদীকূলে একেলা (কালেংড়া), একা মোর গানের তরী ভাসিয়েছিলেম নয়নজলে (বেহাগ), পাখীরা দল বেঁধে যায় কোনখানে ও আকাশ বল্ আমারে (খাম্বাজ), পাগলা, মনটারে তুই বাঁধ (ভৈরবী), ইত্যাদি। পিলু, খাম্বাজ, বারোয়াঁ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত হাল্কা সুরের রাগগুলি ঠুংরীর প্রকৃতির সঙ্গে বিশেষভাবে মেলে। এই কারণে দেখা যায় অতুলপ্রসাদ তাঁর গানের সুররচনায় বারেবারেই এই রাগগুলির দ্বারস্থ হয়েছেন। ভৈরবীতেও তাঁর একাধিক গান আছে। এর ভিতর শ্রীমতী রেণুকা দাশগুপ্ত কর্তৃক হিন্দুস্থান গ্রামোফোন রেকর্ডে গাওয়া 'পাগলা মনটারে তুই বাঁধ' গানটির উল্লেখ আগেই করেছি, অন্য গানের মধ্যে আছে—সবারে বাস্‌রে ভালো, নইলে মনের কালো ঘুচবে না রে, তাহারে ভুলিব বলো কেমনে, মা তোর শীতল কোলে তুলে নে আমায়, প্রভু মন নাহি মানে, ওগো সুখ নাহি চাই, ইত্যাদি।

বাউল ও কীর্তনাঙ্গ গানের কয়েকটি নমুনা : যদি তোর হৃদ্-যমুনা হলো যে উছল রে ভোলা, আমার চোখ বেঁধে ভবের খেলায়, ওগো সাথী, মম সাথী, আমি সেই পথে যাব সাথে, আর কত কাল থাকব বসে দুয়ার খুলে, ইত্যাদি।

অতুলপ্রসাদ কিছু-কিছু খেয়ালভঙ্গিম গানও রচনা করেছিলেন। যথা, তব চরণতলে সদা রাখিয়ো মোরে (জৌনপুরী), নবরূপ হেরি আজি বিশ্ব বিমোহিত (বসন্ত), গায় পঞ্চম রাগে মুক্ত গগন মুগ্ধ ভুবন (পঞ্চম) ইত্যাদি। এর ভিতর প্রথমোক্ত গানটিতে তিনি শাস্ত্রের নিয়মের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ না রেখে স্থলবিশেষে আপন মর্জি অনুযায়ী নবত্বের সঞ্চার করেছেন—সুরে মৌলিকত্বের আরোপ করেছেন। জৌনপুরী রাগে কোমল নিখাদের প্রয়োগ হয়, শুদ্ধ নিখাদ সেখানে বর্জিত। কিন্তু অতুলপ্রসাদ এই গানে জেনে-শুনে শাস্ত্রবন্ধন অস্বীকার করে স্থানবিশেষে শুদ্ধ নিখাদ ব্যবহার করেছেন। তাতে হয়ত শাস্ত্রের পান থেকে চুন খসে পড়েছে কিন্তু গানের আবেদন হয়েছে অনেক বেশী মনোগ্রাহী। সংগীত মনুর সংহিতা নয় যে তার সুরের একটু এদিক-ওদিক হলেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে।

অতুলপ্রসাদ কোরাস গান অল্পই লিখেছেন কিন্তু যে কটি লিখেছেন তার শিল্পোৎকর্ষ অনস্বীকার্য। যেমন বাণী অংশে দেশাত্মবোধক ভাবাবেগের গভীরতা, তেমনি সুরাংশে মেলডির সহজ স্বাচ্ছন্দ্য। কয়েকটি দেশাত্মবোধক কোরাসের উল্লেখ করছি—বল বল বল সবে শত বীণা বেণুরবে/ভারত আবার জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে ; হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর/হও উন্নত-শির—নাহি ভয় ; উঠগো ভারত-লক্ষ্মী, উঠ আদি-জগত-জন-পূজ্যা ; ভারত-ভানু কোথা লুকালে ? পুনঃ উদিবে কবে পূরবাকাশে ? ; মোদের গরব মোদের আশা/আ মরি বাংলা ভাষা/তোমার কোলে তোমার বোলে/কতই শান্তি ভালবাসা, ইত্যাদি।

অতুলপ্রসাদের গানের ভক্তিভাব গভীর। ভক্তিগীতিগুলির ছত্রে ছত্রে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণের আকুলতা ফুটে উঠেছে। গানগুলির আন্তরিকতা মর্মস্পর্শী। মর্মস্পর্শিতার একটা বস্তুগত ভিত্তি রয়েছে। অতুলপ্রসাদের অন্তরঙ্গ মহল জানতেন, কবির ব্যক্তিজীবন বেদনায় পরিপূর্ণ ছিল। দাম্পত্য জীবনের ট্র্যাজিডি থেকে ওই বেদনার উদ্ভব। পত্নী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবনের দীর্ঘকাল তিনি নিঃসঙ্গতায় অতিবাহিত করেছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিগত বেদনাকে তিনি ব্যক্তিক স্তরে নিঃশেষ হয়ে যেতে দেননি, তাকে রূপান্তরিত করেছিলেন ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির ঐকান্তিক আকুতিতে। প্রতি মুহূর্তে প্রতি দণ্ডে পলে হৃদয়ের ক্ষত থেকে যে-রক্ত ঝরেছে তাকে রক্তোৎপলে পরিণত করে ভগবানের চরণে অঞ্জলি

দিয়েছেন। অতুলপ্রসাদের ভক্তিসংগীতগুলিকে এই দৃষ্টিতে দেখলে তবেই তাদের ঠিকভাবে দেখা হয়। সেগুলিতে ঠুংরীর সুর লেগেছে কি আর কোন সুরের খোঁচ লেগেছে সেটা বড কথা নয়, বড কথা হলো তাদের বাণীতে সর্বচেতনা-আচ্ছাদনকাবী বেদনার প্রলিপ্ততা। সেগুলি যেন গানের এক একটি বিষাদের প্রতিমা। দুই-একটি নমুনা নীচে উদ্ধৃত করছি :

দুঃখেরে আমি ডরিব না আর
কণ্টক হোক কণ্ঠের হার ;
জানি তুমি মোবে করিবে অমল
যতই অনলে দহিবে !

কিংবা, যখন তুমি গাওয়াও গান তখন আমি গাই।
গানটি যখন হয় সমাপন তোমাব পানে চাই।
আরও কি মোর গাইতে হবে ?
নয়নজলে নাইতে হবে ?
আরও কি মোর চাইতে হবে—
দিলে না যা তাই ?

অথবা, কুসুম লয়ে গন্ধ বরণ
নিতি নিতি যাঁবে করেছি বরণ,
এ কণ্টক বনে কি করি চয়ন,
কোন্ ফুলে বলো সে পদ ঢাকি ?
নিশার আঁধারে ডাকিব তোমারে যখন গাবে না পাখি,
কণ্টক দিব চরণে যবে কুসুম মুদিবে আঁখি ॥

এসব গানে অতুলপ্রসাদের কবি-পরিচয়টাই মুখ্য, সুরকার-পরিচয় এখানে গৌণ হয়ে গেছে। গীতিকার এখানে সংগীতকারের উপরে স্থান দখল করেছে। অথবা সুর আর বাণী ভাব-ব্যঞ্জনায় এক হয়ে মিশে গেছে।

অতুলপ্রসাদের গানের শিল্পীদের মধ্যে একদা সুখ্যাত ছিলেন সুরসুধাকর দিলীপকুমার রায়, শ্রীমতী সাহানা দেবী, শ্রীমতী রেণুকা দাশগুপ্ত, পাহাড়ী সান্যাল, প্রমুখ। ইদানীং যাঁরা এক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ও আছেন শ্রীমতী মঞ্জু গুপ্ত, শ্রীমতী কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়, নিশীথ সাধুখাঁ প্রভৃতি।

গীতিকার অতুলপ্রসাদ

স্বরকার অতুলপ্রসাদ সেন সম্পর্কে সংগীত গ্রন্থাদিতে ও সাময়িক পত্র-পত্রিকায় একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। স্বরসুধাকর শ্রীদিলীপকুমার রায় তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থের রচনায়, শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র তাঁর 'বাংলার গীতিকার' বইয়ে, শ্রীঅরুণ বসু সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র 'তত্ত্বকৌমুদী'র এক প্রবন্ধে এবং বেশ কিছুকাল আগে শ্রীসোমেন্দ্রনাথ গুপ্ত আনন্দবাজার পত্রিকার এক বিস্তৃত নিবন্ধে অতুলপ্রসাদের স্বরযোজনার কৃতিত্ব সম্বন্ধে অতি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বর্তমান প্রবন্ধের লেখকও তাঁর 'সংগীত-পরিক্রমা' গ্রন্থে অতুলপ্রসাদের স্বররচনার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা করেছেন। কিন্তু মনে হয় অতুলপ্রসাদের স্বররচনাকারী ব্যক্তিত্বের উপর আলোচকদের মনোযোগ যতটা আপতিত হয়েছে তাঁর গীতরচনাকারী ব্যক্তিত্বের উপর এখনও মনোযোগ ততটা পড়েনি। অর্থাৎ স্বরকার অতুলপ্রসাদকেইআমরা সমধিক চেনবার চেষ্টা করেছি, গীতিকার অতুল-প্রসাদের সঙ্গে পরিচয় সাধনের জন্য অদ্যাবধি আশানুরূপ যত্নবান হইনি।

শেষোক্ত অপূর্ণতার চেতনা থেকেই বর্তমান নিবন্ধের সূচনা। পূর্ব-অধ্যায়ে স্বরকার অতুলপ্রসাদ নিয়ে লিখেছি, বর্তমান অধ্যায়ে গীতিকার অতুলপ্রসাদ নিয়ে লিখছি। গীতিকার হিসাবেও অতুলপ্রসাদের দান বড় কম নয়। এইখানে একটি ব্যক্তিগত কথার অবতারণার প্রয়োজন বোধ করছি। আজ থেকে অনেক বৎসর আগে ছাত্র বয়সে, প্রথম যখন অতুলপ্রসাদের গান শুনি, তখন অতুল-প্রসাদের গানের স্বররূপটিই আমাকে বেশী আকর্ষণ করেছিল, তাঁর গানের বাণীর মাহাত্ম্যে তেমন বিমোহিত হতে পারিনি। লক্ষ্ণৌ প্রবাসী অতুলপ্রসাদ তাঁর রচিত বাংলা গানে লক্ষ্ণৌ অঞ্চলের ঠুংরীর—যাকে চলতি কথায় বলে 'লছা ঠুংরী' ধরনের স্বরারোপ করেছেন এবং কখনও কখনও অপূর্ব দেশাত্মবোধক কোরাস গান এবং গজল রচনা করছেন—এই তথ্যটাই তখন আমাদের চোখে সবিশেষ হয়ে দেখা দিয়েছিল। তাঁর গানের যে একটা বাণীর দিক্ থাকতে পারে এবং সে বাণী যে তাঁর স্বরবৈশিষ্ট্যের মতই কমবেশী সমান মনোযোগ লাভের যোগ্য, সে কথাটা তেমন ভাবে মনে উদয় হয়নি। তখন তরুণ বয়সের আত্যন্তিক সাংগীতিক মনস্কতার ফলে ধারণা হয়েছিল, অতুলপ্রসাদ মূলত স্বরকার, স্বরকার রূপেই তাঁর আসল প্রতিষ্ঠা; নিজে তিনি গান বাঁধেন বটে তবে সে সব গানের

স্বতন্ত্র কোন পরিচয় নেই, সুরের অবলম্বন রূপেই সেই সকল গানের পদ গণনীয় —লতার অবলম্বন যেমন বেড়া, তেমনি তাঁর গানের কথা তাঁর সুরের অবলম্বন ও আশ্রয় মাত্র, তার বেশী কিছু নয়। অতুলপ্রসাদের কোনো কোনো গানের ছন্দোশৈথিল্যে এই ধারণা আরও জোরদার হয়েছিল, মনে হয়েছিল তিনি সুরের সার্থক রূপায়ণের জন্যই পদ রচনা করেন, পদের নিজস্ব উৎকর্ষের মুখ চেয়ে পদ রচনা করেন না। ফলে সুরের প্রয়োজনে পদ কোথাও হ্রস্ব হয় কোথাও দীর্ঘায়িত হয়, পরিণামে কবিতার ছন্দে দেখা দেয় অসমতা, অসংগতি। কাব্যছন্দের এই বিচ্যুতি গান গাইবার সময় টের পাওয়া যায় না, কারণ সুরের লয় ইচ্ছামতো বাড়িয়ে-কমিয়ে ছন্দের এই অপূর্ণতাকে ঢেকে দেওয়া হয়।

সুরের লয়ের ঐচ্ছিক সংকোচন-প্রসারণের দ্বারা কাব্যচ্ছন্দের ত্রুটী ঢেকে দেওয়ার প্রয়াস শুধু অতুলপ্রসাদের গানেই লক্ষ্যগোচর এমন নয়, কাজী নজরুল, দিলীপকুমার প্রমুখ সুরকারদের গানেও লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ প্রথমত এবং প্রধানত যারা সুরকার তাঁদের সকলেরই গানের কথাভাগে এই বিচ্যুতি চোখে পড়ে। তাঁরা যে এই বিচ্যুতি সম্বন্ধে অচেতন তা নয়, সুরেব প্রয়োজনে নিতান্ত সজ্ঞানেই তাঁবা এই-জাতীয় বিচ্যুতির প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন।

অতুলপ্রসাদ মূলত সুরকার, গীতিকার হিসাবে তেমন উল্লেখযোগ্য নন, এই ধারণা বেশ কিছুকাল আমার মনে শিকড় গেড়ে ছিল। কিন্তু একদিন দিলীপ-কুমারের সঙ্গে আলোচনায় এই ভুল ধারণায় চিড ধরে। তিনি আমার ধারণার প্রতিবাদ করে বেশ জোরের সঙ্গেই সেদিন বলেছিলেন যে, অতুলপ্রসাদের গানের সুরটাই শুধু বৈশিষ্ট্যময় নয়, তাঁর গানের পদযোজনাও সমান বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, এমনকি খতিয়ে দেখলে, তাঁর বাণীর আবেদন তাঁর সুরের আবেদনের চেয়েও বেশী। দিলীপকুমাবের কথায় সেদিন পুরাপুরি সায় না দিতে পারলেও পরে এই নিয়ে চিন্তা করে দেখেছি দিলীপকুমারের কথায় যথেষ্ট সারবত্তা আছে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অতুলপ্রসাদের সংগীতের বাণী-অংশ (সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত 'গীতিগুঞ্জ' ও 'কাকলি' দ্রষ্টব্য) যত বেশী অনুশীলন করবার অবসর হয়েছে তত এই প্রতীতি মনে বদ্ধমূল হয়েছে যে, শুধুমাত্র সুরকার হিসাবে দেখাটাই অতুলপ্রসাদকে যথার্থ দেখা নয়, তাঁকে কবি-গীতিকার হিসাবেও তুল্য মর্যাদা দিতে হবে এবং কবি ও সুরকারের মিলিত পরিচয়েই অতুলপ্রসাদের প্রকৃত পরিচয়।

উত্তর-জীবনের পরিণত চিন্তার আলোকে স্রষ্টা অতুলপ্রসাদের যে ছবিটি আজ মনের পটে প্রতিভাত তা আমার প্রথম জীবনের গড়া ছবির আদল থেকে কতই না পৃথক। আজ যে অতুলপ্রসাদকে আমি জানি তিনি একজন সার্থক সুরকার, একজন বিশিষ্ট কবি। তাঁর কবি-ব্যক্তিত্বের মধ্যে অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য এক আধারে এসে বিধৃত হয়েছে: তিনি গভীর ঈশ্বরভক্ত, মরমী-আকুতিযুক্ত, স্বদেশপ্রেমিক ও মানবপ্রেমিক। খতিয়ে দেখতে গেলে তাঁর স্বদেশপ্রেম ও মানব-প্রেম তাঁর নিবিড় ঈশ্বরপ্রেম থেকেই উৎসারিত হয়েছে। ভারতীয় সাধনার পরিভাষায় ঠিক যাকে আধ্যাত্মিক পিপাসার কবি বলা হয় তিনি হয়তো সেই স্তরের কবি নন, কিন্তু তাঁর সেই অসম্পূর্ণতার স্খালন হয়েছে তাঁর নিবিড়-গভীর ভক্তির আকুলতার দ্বারা। এমন ভক্তির আন্তরিকতামণ্ডিত কবি রবীন্দ্রনাথ ও কান্তকবি রজনীকান্তের দৃষ্টান্ত বাদ দিলে আধুনিক বাংলা কাব্যের জগতে আর আবির্ভূত হয়েছেন কিনা সন্দেহ। কী প্রসন্ন সুন্দর বিনম্র তাঁর আত্মনিবেদনের ভঙ্গী, কত অনাবিল তাঁর নিজ জীবনে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে সত্য করে তোলবার অভীপ্সা। কি দেশপ্রেমের কবিতায় কি মানবদরদের কবিতায়, এমন কি প্রেম-মূলক গজল গানেও, তাঁর এই নিবিড়-গভীর ঈশ্বরানুভূতি বারেবারেই আপনাকে অভিব্যক্ত করেছে।

অথচ অতুলপ্রসাদের এই ভক্তিভাবকে ঠিক অন্যান্য কবির ভক্তিভাবের সঙ্গে এক করে মিশিয়েও ফেলা চলে না। রবীন্দ্রনাথ ও রজনীকান্তের ও অন্যান্য ভক্ত কবিদের ভক্তির প্রকৃতি থেকে তাঁর ভক্তির প্রকৃতি কিছু স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির গানের ভাববৈচিত্র্য অতুলপ্রসাদের গানে নেই, মননশীলতাও বহুল পরিমাণে অনুপস্থিত, কিন্তু ভক্তির আন্তরিকতায় তাঁর কাকলি গীতাঞ্জলির সম-পর্যায় ভুক্ত হবার যোগ্য। বরং অতুলপ্রসাদের আকুতি ও অভীপ্সা গীতাঞ্জলির কবির মতো বহুমুখী না হওয়ায় এবং তার সমস্ত ভাবপ্রবাহ অনন্যপরতন্ত্র হয়ে কেবলমাত্র ভক্তির খাতে প্রবাহিত হওয়ায় তার আবেদন আরও যেন বেশী প্রত্যক্ষ, আশুস্পর্শগ্রাহ্য ও অধিকতর লক্ষ্যভেদী বলে মনে হয়। রজনীকান্তের গানেও ভাববৈচিত্র্য কম, তাঁরও মূলত ভক্তির সরণীতেই বিচরণ, তবে ভক্তি-সংগীতে তাঁর অনন্যতা সর্বথা স্বীকৃত। রজনীকান্তের ভক্তিসংগীতের আন্তরিকতার কোন তুলনা নেই। ঈশ্বরের প্রতি আত্মসমর্পণের আকুতির ঐকান্তিকতায় তাঁর গান মর্ম স্পর্শ করে। অবশ্য রজনীকান্ত ও অতুলপ্রসাদ, দুইয়ের তুলনামূলক

বিচারে অতুলপ্রসাদের গানের বাণীতেই যেন আত্মসমাহিতি ও সংহতি বেশী। তাঁর কবিতার এই আত্মসমাহিত প্রশান্তির মূলে তাঁর আবাল্যের ব্রাহ্ম শিক্ষাদীক্ষা ও জীবনাচরণ বিশেষ কাজ করেছে বলে মনে হয়। কাজী নজরুল ইসলামও ভক্তির গান একাধিক লিখেছেন, কিন্তু সে সব গানে ভাবের উচ্ছলতা বড়ো বেশী প্রকট। কাজী সাহেবের স্বভাবসুলভ আবেগোদ্বেলতার জোয়ারে অনেক সময় ভক্তির পরিচ্ছন্ন রূপটি ডুবে গেছে। কিন্তু অতুলপ্রসাদের গানে আর যা-ই থাকুক আর না-থাকুক আবেগোচ্ছ্বাস নেই। তাঁর ভক্তি ঐকান্তিক আন্তরিকতা ও কোমলতা মণ্ডিত হয়েও সংযমশাসনে শাসিত—তাঁর ভক্তির রূপ পরিচ্ছন্ন, দৃঢ়-সংবদ্ধ ও সংহত।

এইটে খুব আশ্চর্য মনে হয় যে, অতুলপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথের অতি নিকট সান্নিধ্যে এসেও রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসী প্রভাবের দ্বারা নিজেকে প্রভাবিত হতে দেননি। না সুরের ভঙ্গীতে না কাব্যকৃতিতে রবীন্দ্র-প্রভাব অতুল-গীতিতে লক্ষণীয়। অতুল-প্রসাদ তাঁর গীতরচনায় রবীন্দ্র-আবহের মধ্যে থেকেও সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলেছেন। এটা সম্ভব হয়েছে তাঁর ব্যক্তিত্বের বিশেষ গড়নের জন্য, রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্বের সঙ্গে যার সামান্যই মেলে। অতুলপ্রসাদে মননজীবী লেখকের বৈশিষ্ট্য কম ছিল, সমালোচনা-প্রবণতা তার চেয়েও ছিল কম। কৌতূহলের বহুমুখী ব্যাপ্তি ছিল এমন কোনো প্রমাণ তাঁর জীবন বা লেখা থেকে তেমন পাওয়া যায় না। তিনি পেশায় আইনজীবী হলেও এবং লক্ষ্ণৌর সমাজ জীবনের বহু হিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ থাকলেও তাঁর জিজ্ঞাসার বহুপথচারিতার নজীর অন্তত বাংলা কাব্যসাহিত্যের পাঠকের গোচরীভূত নয়। তাঁর যে ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আমরা পরিচিত তা হল একজন সুরপ্রেমী সংগীতসাধক ও ভক্ত কবির ব্যক্তিত্ব—একবর্গাভিমুখী, সীমিতকৌতূহল, ভাবুক ও বিষাদযুক্ত। তিনি অন্য কোনো ভূমিকায় বাঙালী পাঠকের কাছে আত্মপ্রকাশ করেননি। তাঁর গদ্য রচনাও খুব কম। এ ক্ষেত্রে কয়েকটি অভিভাষণের সমষ্টিমাত্র চোখে পড়ে আর দু'-একটি রবীন্দ্র-স্মৃতিচারণ। আসলে তিনি সুরে আর কাব্যকথায়ই সমর্পিতপ্রাণ এবং কথা ও সুর এই দুইকেই তিনি ব্যবহার করেছেন ঈশ্বরোপলব্ধির উপায় হিসাবে। তাঁর দেশপ্রেম ও মানবপ্রেম তাঁর ঈশ্বরপ্রেম থেকেই উচ্ছ্রিত।

এবার অতুলপ্রসাদের কয়েকটি রচনাংশ উৎকলন করে দিচ্ছি। তা থেকে

পাঠক কবির ভক্তির গভীরতার ও আন্তরিকতার নিঃসংশয় পরিচয় পাবেন। গীতিরচনায় অতুলপ্রসাদের মিলের হাতও যে কত চমৎকার ছিল তারও প্রমাণ এই সকল উদ্ধৃতি থেকে পাওয়া যেতে পারে।

প্রথমে ঈশ্বরাকৃতির উদাহরণ :

আমারে এ আঁধারে এমন ক'রে চালায় কে গো ?
আমি দেখতে নারি, ধরতে নারি, বুঝতে নারি কিছুই যে গো !
নয়নে নাহি ভাতি মনে হয় চির-রাতি,
মনে হয় তুমি আমার চির-সাথি ;
একবার জ্বালিয়ে বাতি, ঘুচিয়ে রাতি, নয়ন ভ'রে দেখা দে গো !

এটি দাদরা তালে গেয় বাউল সুরের গান। অতুলপ্রসাদের বাউল সুরের গান আরও আছে, তার মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ হল এই গানটি—'যদি তোর হৃদ্‌যমুনা হল রে উছল রে ভোলা।' কিংবা,

আমারে ভেঙে ভেঙে কর হে তোমার তরী,
যাতে হয় মনোমত তেমনি ক'রে লও হে গড়ি' ॥
এ তরুতে নাই ফুল-ফল, শিকড়গুলি বাড়ছে কেবল,
দিয়ে আঘাত জীবন-মূলে লও হে তারে ছিন্ন করি ॥

এটি একতালে গেয় ঝিঁঝিট-খাম্বাজ সুরাশ্রিত একটি গান। অতুলপ্রসাদের ঈশ্বরারাধনামূলক একটি গোটা গান এখানে তুলে দিচ্ছি তা থেকে কবির সুষ্ঠু শব্দনির্বাচনক্ষমতা, মিলনৈপুণ্য, ছন্দোঝঙ্কার ইত্যাদির অসংশয় পরিচয় মিলবে —ভাবের আন্তরিকতা তো আছেই।

এ মধুর রাতে বল কে বীণা বাজায়।
আপন রাগিণী আপন মনে গায়।
নাচিছে চন্দ্রমা সে গীত-ছন্দে, গ্রহ গ্রহেরে ঘিরি নাচে আনন্দে,
গোপন গানে হেন কে সবে মাতায়।
যাঁর মন্ত্র হেন মোহন তন্ত্র, যাঁর কণ্ঠে হেন মোহন মন্ত্র,
না জানি সুন্দর সে কী শোভায় !
কোথা সে বীণা, কোথা সে বাণী, কোথা সে শতদল ফোটে না জানি,
প্রাণ-মরাল চাহে ভাসিতে তাঁর পায় ॥

এটি মিশ্র খাম্বাজ সুরের একটি গান কাহারবা তালাশ্রিত। এ গানটির নৈশ

অনুষঙ্গ তাঁর আর একটি বিখ্যাত রাত্রির গান—যা শ্রীযুক্তা সাহানা দেবী গ্রামোফোন রেকর্ডে গেয়েছেন—'চাঁদিনী রাতে কে গো আসিলে'-এর কথা মনে করিয়ে দেয়। দেশ রাগিণীর আশ্রয়ে রচিত এমন চমৎকার বাংলা গান খুব কমই শুনতে পাওয়া যায়।

ঈশ্বরপ্রেমমূলক গানের আর একটি নমুনা :

ওগো সাথি, মম সাথি, আমি সেই পথে যাব সাথে,
যে পথে আসিবে তরুণ প্রভাত অরুণতিলক মাথে ॥
যে পথে কাননে আসে ফুলদল, যে পথে কমলে পশে পরিমল,
যে পথে মলয় আনে সৌরভ শিশিরসিক্ত প্রাতে।
আমি সেই পথে যাব সাথে ॥

এটি কীর্তনাঙ্গ গান—ত্রিতালে গেয়। সাহানা দেবীর কণ্ঠে এই বিখ্যাত গানটি অনেকেই শুনে থাকবেন।

অতুলপ্রসাদের আর একটি বিখ্যাত গান :

তব চরণতলে সদা রাখিয়ো মোরে।
দীনবন্ধু করুণা সিন্ধু, শান্তিসুধা দিয়ো চিত্ত-চকোরে।
কাঁদিছে চিত 'নাথ নাথ' বলি, সংসার-কান্তারে সুপথ ভুলি ;
তোমার অভয় শরণ আজি মাগি, দেখাও পথ অন্ধ তিমিরে।

ইত্যাদি

এটি জৌনপুরী সুরের আশ্রয়ে রচিত একটি ভজন গান। কিন্তু এর সুরের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, যেখানে জৌনপুরীতে সচরাচর কোমল নিখাদের ব্যবহার হয় সেখানে সেই নিয়মের ইচ্ছাকৃত ব্যত্যয় ঘটিয়ে অবরোহণের সময় এতে শুদ্ধ নিখাদ ব্যবহার করা হয়েছে—এতে একটা চমৎকার 'এফেক্ট'-এর সৃষ্টি হয়েছে। পরলোকগত হিমাংশু দত্ত (সুরসাগর) 'বিচিত্রা' মাসিক পত্রিকায় এই অপূর্ব গানটির স্বরলিপি প্রকাশ করেছিলেন।

গজল গান সাধারণত নরনারীর প্রেমমূলক গান—কিন্তু গজলের সুরে ঈশ্বরাকুতিও যে কত নিবিড়ভাবে ফুটতে পারে তার প্রমাণ অতুলপ্রসাদের 'কত গান তো হল গাওয়া আর মিছে কেন গাওয়াও' গানটি। এই গানটিও সাহানা দেবীর কণ্ঠে অনেকে শুনে থাকবেন।

আমি অতুলপ্রসাদের বিষাদময় ভাবুকতার কথা বলেছি। সেরকম গানের

একটি নমুনা :

তবু তোমারে ডাকি বারে বারে ;
কত যে পেয়েছি ব্যথা না বুঝে তোমারে।
জানি না কেন যে দাও, কাঁদায়ে ফিরায়ে নাও,
তুমি তো ভোল না, বিধি, নয়ন-আমারে।

*　　*　　*

বুঝেছি সুখ যে মায়া, বুঝাও দুখও যে ছায়া,
তুমি যে রয়েছ সুখ-দুঃখেরও ওপারে।
মনে হয় তব কাছে　　সব হারাধন আছে,
তাই তো এসেছি হে নাথ তোমার দুয়ারে॥

ঐশী অভীপ্সাপূর্ণ গানের অনেকগুলি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল। তার থেকে পাঠক কবির মানসিক গড়নের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পেয়েছেন আশা করি। সে বৈশিষ্ট্য আর কিছু নয়—ঈশ্বরের প্রতি সর্ব কার্যে সর্ব অবস্থায় একান্ত নির্ভরতা। তাঁর ঈশ্বরে আত্মসমর্পণের বিনম্র ভঙ্গীটি যে কত সুন্দর তা বোঝাবার জন্য আর একটি গীতাংশ এখানে উৎকলিত হল।

তোর কাছে আসব মা গো শিশুর মতো।
সব আবরণ ফেলব দূরে, হৃদয় জুড়ে আছে যত।
দৈন্য যে মা মনের মাঝে, ঘুচবে না তা মিথ্যা সাজে।
সব আভরণ করব খালি, দেখবি মাগো মনের কালি,
শূন্য যে মোর প্রেমের থালি, তাই চরণে করব নত।

এটি কালাংড়া সুরের গান। তাল দাদরা। দাদরা ও কাহারবা তালে অতুলপ্রসাদ অনেক গান রচনা করেছেন। দাদরা-কাহারবার তালভঙ্গি একটু চটুল, কিন্তু ওই চটুলতার সীমাবদ্ধতার মধ্যেই কবি অপূর্ব ভাবব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছেন।

ঈশ্বরানুভূতিমূলক গানের দৃষ্টান্তের পরে মানবপ্রেমমূলক গান। তার দু' একটি নমুনা এখানে তুলে ধরছি :

আমায় রাখতে যদি আপন ঘরে,
বিশ্ব-ঘরে পেতাম না ঠাঁই।
দুজন যদি হত আপন, হত না মোর আপন সবাই।

কিংবা,

সবারে বাস রে ভালো, নইলে মনের কালো ঘুচবে না রে
আছে তোর যাহা ভালো, ফুলের মতো দে সবারে।
করি তুই আপন-আপন, হারালি যা ছিল আপন ;
এবার তোর ভরা আপন বিলিয়ে দে তুই যারে-তারে।

এটি ভৈরবী সুরের গান—একতালায় গেয়। অতি চমৎকার এই গানটির আবেদন।

আর একটি উদাহরণ :

নীচুর কাছে নীচু হতে শিখলি না রে মন !
তুই সুখী জনের করিস পূজা দুখীর অযতন (মূঢ় মন)।
লাগে নি যার পায়ে ধূলি, কী নিবি তার চরণ ধূলি,
নয়রে সোনায়, বনের কাঠেই হয় রে চন্দন (মূঢ় মন)।

*　　　*　　　*

বৃথা তোর কৃচ্ছ্রসাধন,　　সেবাই নরের শ্রেষ্ঠ সাধন !
মানবের পরম তীর্থ　　দীনের শ্রীচরণ (মূঢ় মন)।

আর বোধহয় উদ্ধৃতির প্রয়োজন নেই। যে সকল উদাহরণ উৎকলন করা হয়েছে অতুলপ্রসাদের কাব্যবৈশিষ্ট্য বোঝাবার পক্ষে তা-ই পর্যাপ্ত বলে মনে করি। কবির স্বদেশপ্রেমমূলক কোরাসগুলি (যথা, 'বল বল বল সবে শতবীণা বেণুরবে, ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে', 'হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর, হও উন্নত শির, নাহি ভয়', 'উঠ গো ভারতলক্ষ্মী ! উঠ আদি-জগতজনপূজ্যা') এতই সুপরিচিত ও বহুলগীত যে সেসব গানের বিস্তৃত উদ্ধৃতি দেবার আবশ্যকতা আছে বলে মনে করিনে। অতুলপ্রসাদের এই সব দেশাত্মবোধক কোরাস গান যেমন সুরভঙ্গিতে অতুলনীয় তেমনি বাণীসম্পদে অপূর্ব সমৃদ্ধ। সুর ও ভাবের উৎকর্ষে একমাত্র দ্বিজেন্দ্রলালের কোরাস গানগুলির সঙ্গেই সেগুলি তুলনীয়।

আধুনিক বাংলা গান

'আধুনিক বাংলা গান' নামধেয় সংগীত নানা বিবর্তনের স্তর বেয়ে বর্তমান পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে। এর পিছনে আছে কীর্তন, শ্যামাসংগীত, রামপ্রসাদী, 'প্রাচীন বাংলা গান' বর্গের একরাগভিত্তিক খেয়াল অঙ্গের গান; লোক সংগীত, যাত্রা ও থিয়েটারের গান; রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলাল-রজনীকান্ত-অতুলপ্রসাদ-কাজী নজরুল-দিলীপ রায় প্রমুখ বিশিষ্ট সুরকারদের গান; অজয় ভট্টাচার্য-সুবোধ পুরকায়স্থ-শৈলেন রায়-প্রণব রায় প্রমুখ গীতিকারদের রচিত কথায় হিমাংশু দত্ত, শৈলেশ দত্ত, শচীন দেববর্মণ, কমল দাশগুপ্ত, অনুপম ঘটক প্রমুখ সুরকারদের সুরারোপিত গান; কৃষ্ণচন্দ্র দে, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, তারাপদ চক্রবর্তী, শচীন দেববর্মণ প্রমুখ প্রসিদ্ধ কণ্ঠশিল্পীদের গাওয়া রাগাশ্রিত গান, 'মুক্তি' 'ডাক্তার' 'সোনার সংসার' 'শেষ উত্তর' প্রভৃতি জনপ্রিয় ছায়াছবির বাংলা গান; ইত্যাদি বহু প্রকার গানের স্তর পরম্পরা। সমীক্ষার সাকুল্য পরিসংখ্যান প্রায় এক নিঃশ্বাসে এখানে উচ্চারণ করলেও এক নিঃশ্বাসে সারবার বিষয় এটা নয়। উল্লিখিত গানের শ্রেণীগুলির প্রায় প্রত্যেকটি সম্বন্ধেই সবিস্তার বলবার অবকাশ রয়েছে এবং সেটা বলা যায়। কিন্তু এই প্রবন্ধ সমীক্ষামূলক প্রবন্ধ নয়। এতে প্রধানত আধুনিক বাংলা গানের রূপ ও রীতি, কথা ও সুর পরিবেশনের প্রণালী প্রভৃতি বিষয়গুলি নিয়েই পর্যালোচনা করা হবে। তবে যেহেতু আধুনিক বাংলা গানের পদ্ধতি-প্রকরণ বুঝতে হলে বাংলা গানের পৃষ্ঠপটের অর্থাৎ পূর্বতন ইতিহাসের কিছুটা ধারণা থাকা আবশ্যক, সেই কারণে উপরের প্রকারভেদগুলির সব কয়টির না হলেও কয়েকটির অন্তত কিছু-কিঞ্চিৎ আলোচনা করার প্রয়োজন হতে পারে প্রবন্ধের অগ্রগতির ফাঁকে ফাঁকে। বাংলা গানের আধুনিক পর্যায়কে বুঝতে হলেও তার মৌলিক প্রকৃতিকে বোঝা প্রয়োজন।

প্রথম কথা বাংলা গানে কথা বা বাণী অংশ গানে একটি মুখ্য স্থান জুড়ে আছে। বাঙালী কাব্যপ্রবণ জাতি, সহজাতভাবে কথার প্রেমে মুগ্ধ। শুধু সুরে তাকে ভোলানো যায় না, সুরের পাশে পাশে কথারও একটা যথোচিত ভূমিকা

সে আশা করে। সুরের সঙ্গে কথার উপযুক্ত সংমিশ্রণ হলে তবেই গান তার নিকট গান-পদবাচ্য হয়ে·ওঠে, নচেৎ নয়। এ জিনিস বাংলা গানের একেবারে গোড়াকার পর্ব অর্থাৎ কীর্তনের আমল থেকেই গড়ে উঠেছে, আজ পর্যন্ত বাংলা গানের সেই বৈশিষ্ট্য কমবেশী সক্রিয় রয়েছে যুগধর্মসুলভ কথার নানা বিকৃতি সত্ত্বেও। বাংলা গানে কথার ভূমিকা যে কত বড় সেটা বোঝা যায় পদাবলী কীর্তনের 'আখর' যোজনার সংস্কারের দৃষ্টান্ত থেকে। কীর্তন গায়ক কীর্তনের মূল কথাগুলি গেয়েই সন্তুষ্ট থাকেন না, তার উপর আবার স্থানে স্থানে আপন প্রাণের তাগিদে আখর বা অক্ষর সংযোজনা করেন। তার দ্বারা কথায় কথায় গান আরও কথাময় হয়ে ওঠে। এ এক প্রকার কথার বিস্তার। রাগসংগীতে যেমন সুরের বিস্তার পদাবলী কীর্তনে তেমনি কথাকে অবলম্বন করে সৃজনী স্ফূর্তির বিস্তার। বিদেশী সাংগীতিক পরিভাষা ব্যবহার করে বলি রাগসংগীতে improvisation of tunes ; পদাবলী কীর্তনে improvisation of words.

বাংলা গানের এই যে বৈশিষ্ট্য—এ সম্পূর্ণ হিন্দুস্থানী রাগসংগীতের ঐতিহ্যের বিপরীত। বিশেষ করে হিন্দুস্থানী রাগসংগীতের খেয়াল-টপ্পা-ঠুংরী বর্গের গানের অভ্যাস থেকে এই গানের অভ্যাস খুবই স্বতন্ত্র। হিন্দুস্থানী সংগীতপদ্ধতির সঙ্গে বাংলা গানের মিল যদি কিছু থাকে তো তা আছে তার ধ্রুপদ অঙ্গের গানের ধারার সঙ্গে, যে গানে সুরের পাশে পাশে কথাও একটি বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত। আর মিল আছে হাল্কা ক্লাসিকাল ধারার একাধিক গীতরীতির সঙ্গে। যথা, কাজরী, হোরী, গীত, ভজন, নাত, কাওয়ালি, গজল প্রভৃতি। এসব উত্তর ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমানী ধারার লোকপ্রিয় গানে সুরের আবেদনের পাশে কথারও একটা বিশেষ আবেদন আছে। বাংলা গানে বোধগম্য কারণেই এই শ্রেণীর গানের বেশ কিছুটা প্রভাব পড়েছে। খেয়াল ঠুংরীর প্রভাব সেই তুলনায় অনেক কম। মোট কথা, বাংলা গান কথাকে বাদ দিয়ে করা যায় না। এর পরিকল্পনায় কথার উচ্চমূল্য বরাবর স্বীকৃত—সেই কীর্তনের যুগ থেকে। এমনকি বলা যায়, সুরের অবমূল্যায়ণ ঘটিয়েও এই গানে কথার প্রাধান্য। কথার এই অতিপ্রাধান্য বাংলা গানের অগ্রগতির পক্ষে পুরাপুরি মঙ্গলকর হয়েছে কিনা সেটা একটা প্রশ্ন হতে পারে, বস্তুত এই প্রশ্ন বাংলা গানের আলোচনা প্রসঙ্গে বারেবারেই উঠেছে, কিন্তু এ জিনিস আমরা পছন্দ করি বা না করি, এইটেই হলো বাংলা গানের স্বভাব। স্বভাবের সমালোচনা করা চলে, কিন্তু স্বভাব

বদলানো সহজ ব্যাপার নয়।

তবে স্বভাবের একেবারে যে কখনও ব্যত্যয় ঘটেনি তা নয়। কিছু-কিছু ব্যতিক্রম দৃষ্টান্তের সাক্ষাৎ মেলে। যেমন, 'প্রাচীন বাংলা গান' নামধেয় যোগানের শ্রেণীর উল্লেখ করেছি, ওই গানে কিন্তু কথাকে ছাপিয়ে সুরের আধিপত্য লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন বাংলা গান আসলে হিন্দুস্থানী খেয়ালের বাংলা গীতরূপ—প্রায় খেয়ালের বাংলা তর্জমা বলা যায়। কয়েকটি এই জাতীয় গানের প্রথম পদের উল্লেখ করছি—তারে ভোলা হলো এ কি দায়, প্রাণ যায় (হাম্বীর), বাজে শ্যামের মোহন বেণু / বেণুরব শুনে জুড়ালো তনু (পূরবী), বাঁধ না তরীখানি আমারি নদীকূলে (ছায়ানট), কে রে হৃদয়ে জাগে শান্তশীতল রাগে, মোহতিমির নাশে, প্রেমমলয় বয় (দেশ), আজ কেন সই হলো এত বেলা নাইতে যাবিনে (ভৈরোঁ), ইত্যাদি। এসব গান হুবহু রাগসংগীতের ছাঁচে গড়া এবং রাগসংগীতের ধ্রুপদ খেয়াল অঙ্গের গানের মতো একরাগভিত্তিক। কথা এখানে কথার মূল্যে ততটা নয়, যতটা সুরের মূল্যে বরণীয়। সুরের অবলম্বন রূপে এ সব গানে কথার সার্থকতা। সুরের লীলায়িত হয়ে ওঠার জন্য একটা কিছু শব্দের আশ্রয় তো চাই, কথা এখানে সেই আশ্রয়। তার বাড়তি গুরুত্ব কথার নেই।

আমাদের বাল্যকালে এই শ্রেণীর গান আমরা কত শুনেছি, শুনে মুগ্ধ হয়েছি। আজকাল আর তেমন শুনতে পাইনে। বরং এই ধারার গানের চর্চা এক প্রকার উঠে গেছে বললেই ঠিক বলা হয়। সেটা বাংলা গানের সুস্থ বিকাশের পক্ষে কল্যাণকর হয়নি। কেন হয়নি সে আলোচনা পরে করবো। মাঝে অবশ্য প্রধানত কাজী নজরুল ইসলামের উদ্যোগে এই জাতীয় গানের পুনঃপ্রবর্তনের একটা চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু পরিতাপের বিষয় সে গান আজকাল আর তেমন প্রচলিত নেই। 'আধুনিক বাংলা গান' নামের অতিআধুনিক গীতরীতির ঘোলাজলের বন্যাপ্রবাহে ওই সুরসম্পদে সমৃদ্ধ সুন্দর গানের শ্রেণীরূপ বাংলার সুরের মাটিতে নতুন করে শেকড় গাড়বার আগেই বোধহয় ভেসে গেছে। এই শ্রেণীর গানের শিল্পরূপ শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি লাভ করেছিল প্রোফেসর জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর কণ্ঠে, গ্রামোফোন রেকর্ডে যাঁর গাওয়া এই রকম অনেকগুলি গান বিধৃত আছে। যেমন, শূন্য এ বুকে পাখি মোর আয় ফিরে আয় (ছায়ানট), আনমেব আঁখি আমার (বাগেশ্রী), এ কি

তন্দ্রাবিজড়িত আঁখিপাত (মালকোষ), দামিনী দমকে (জয়জয়ন্তী), আজি নিঝুম রাতে কে বাঁশী বাজায় (দরবারী-কানাড়া), লীলায়িত চঞ্চল অঞ্চল পরশনে (বাগেশ্রী), শ্মশানে জাগিছে শ্যামা অন্তিমে সন্তানে দিতে কোল (কৌশিকী-কানাড়া), ইত্যাদি। বেশীর ভাগ গানেরই কথা নজরুলের, তবে তুলসী লাহিড়ী মহাশয়েরও কিছু কিছু কথা আছে। এই ধরনের বাংলা খেয়াল বর্গীয় গান পরে তারাপদ চক্রবর্তী, নলিনচন্দ্র মালাকার, শচীন দেববর্মণ, ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট গায়কদের কণ্ঠে রূপায়িত হয়ে সকল শ্রেণীর শ্রোতাদের না হলেও রাগামোদী বাংলা গানের শ্রোতাদের মনোহরণ করেছিল।

কিন্তু বাংলা ভাষায় নাকি খেয়াল গান হয় না, হওয়া উচিত নয়—এই রব তুলে এই ধারার গানকে অবলুপ্ত করবার একটা পরিকল্পিত প্রয়াস চলেছে আজ বেশ কিছুকাল ধরে বাংলা গানের জগতে। এমনকি রেডিও-ও এই পরিকল্পনার অংশীদার, যে-রেডিও তাঁদের ন্যাশানাল ও অন্যান্য প্রোগ্রামে রাগসংগীতকে খুবই গুরুত্ব দিয়ে থাকেন সচরাচর। বাংলা ভাষায় যদি খেয়াল গান নাই হবে তো যে সব প্রাচীন বাংলা গানের নমুনার উল্লেখ করেছি, আজ থেকে ষাট সত্তর বছর কি তারও আগে সে সব গানের উদ্ভব হলো কী করে? পরে পরে দ্বিজেন্দ্রলাল, কান্তকবি রজনীকান্ত, কাজী নজরুল ইসলাম, হিমাংশুকুমার দত্ত প্রমুখ সুরকারগণ তবে এই বিশেষ গীতরীতিটির আদলে নতুন নতুন গান ও সুর বাঁধবার প্রয়োজন অনুভব করলেন কেন? রবীন্দ্রনাথ খেয়ালভঙ্গিম গান খুব বেশী রচনা করেননি, তবে ধ্রুপদাঙ্গ গান রচনা করেছেন অজস্র। সেসব গান মূলত হিন্দুস্থানী রাগসংগীতের আদর্শেই রচিত। তাই যদি হয় তো আধুনিক বাংলা গানের এলাকা থেকে রাগের আদর্শ ও ঐতিহ্যকে বিসর্জন দেবার এত তোড়জোড় পড়ে গেছে কেন চারদিকে হঠাৎ? বাংলা গানের সুরকে সরল ও সাদামাঠা করবার অত্যুৎসাহে তাকে প্রায় আবৃত্তির কোঠায় নামিয়ে আনার ব্যস্ততা দেখা দিয়েছে কেন চারদিকে? আসলে সস্তা সুরের কারবারীরা হাল্কা গানের মোহাতিশয্যবশত বাংলা গানকে সর্বপ্রকার আভরণ ও অলংকার-রিক্ত করতে বদ্ধপরিকর। বাংলা গানকে নিছক পদ্যরচনার সানুনাসিক উচ্চারণ-প্রক্রিয়ায় পর্যবসিত না করা পর্যন্ত তাঁদের শান্তি বা স্বস্তি নেই। সুর মাত্রেই তাঁদের চোখে বিভীষিকা স্বরূপ।

কথাটা যখন উঠলোই তখন এই প্রসঙ্গে 'রাগপ্রধান' গানের বিষয়ে কিছু

বলি। বাংলা খেয়াল আর বাংলা রাগপ্রধান গান একই গোত্রের গান—তবে কথাংশে কিছু পার্থক্য আছে। বাংলা খেয়াল গানে কথার ভূমিকা গৌণ, রাগপ্রধান গানে তেমন নয়। রাগপ্রধান গানে কথা ও সুরের যৌগিক রূপ। ক্লাসিক আর রোমান্টিকের মধুর সমন্বয় হয়েছে এই বর্গের গানের কাঠামোয়। এই গানকে বলা হয় classico-modern song—ঠিকই বলা হয়। তার modernism-এর মধ্যে আছে তার রোমান্টিকতার ইসারা। এই গানের একদা সিদ্ধশিল্পী ছিলেন শচীন দেববর্মণ। তাঁর গ্রামোফোন রেকর্ডে গাওয়া 'মম মন্দিরে এলে কে তুমি' (আড়ানা), 'আলোছায়া দোলা উতলা ফাগুনে' (বাহার), 'যদি দখিনা পবন আসিয়া ফিরে গো দ্বারে' (গান্ধারী টোড়ী), 'নতুন ফাগুনে যবে আজি ধরা চঞ্চল' (রাগেশ্রী) প্রভৃতি গান একদা (তিরিশের দশকে) বাংলার সুরের আকাশ ভরে রেখেছিল গানগুলির কথার লীরিকাল মাধুর্য আর সুর-বিস্তারের আকর্ষণের যুগ্ম সম্মোহনের দ্বারা। সুরে আছে খেয়াল গানের সংহতি, কথায় আছে গীতিকবিতার আবেদন—এ এক আশ্চর্য যোগাযোগ। এই শ্রেণীর রাগপ্রধান গান বেশীর ভাগই লিখেছিলেন অজয় ভট্টাচার্য। শৈলেন রায়, বিনয় মুখোপাধ্যায় ('দৃষ্টিপাত' খ্যাত যাযাবর)—এঁরাও কিছু কিছু লিখেছিলেন। সুর-সংযোজনা প্রধানত হিমাংশু দত্তের, তবে শচীন দেবের দেওয়া সুরও দু-একটি গানে পাওয়া যায়। পরে এই ধারার গানের কণ্ঠরূপায়ণে আর যেসব শিল্পী খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন বা আছেন—ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, দীপালী নাগ (তালুকদার), অখিলবন্ধু ঘোষ, সুকুমার মিত্র, নিখিল সেন, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অমলেন্দুবিকাশ করচৌধুরী, প্রভৃতি।

রাগপ্রধান গান একটি চমৎকার গীতি রূপ। দুঃখের বিষয়, বাংলা খেয়ালের মতো এই রূপটিরও আজকাল বিশেষ কোন চর্চা হচ্ছে না বাংলার সংগীত জগতে। সরকার পরিচালিত রেডিও কর্তৃপক্ষকে প্রশংসা করবার অবকাশ আমরা খুব কমই পাই। কিন্তু এই একটি ক্ষেত্র, যেখানে আকাশবাণীর সিদ্ধান্তের তারিফ করতেই হয়। বলতে গেলে রাগপ্রধান গান সম্পর্কে আধুনিক গানের শ্রোতাদের অনুচিত নিরুৎসুকতাকে এক প্রকার অগ্রাহ্য করেই আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্র রাগপ্রধান গানকে তাঁদের নিয়মিত অনুষ্ঠানসূচীর অঙ্গীভূত করে রেখেছেন। তাঁদের দৌলতেই রাগপ্রধান বর্গের গান তবু যাহোক কিছু শুনতে

পাওয়া যায়, নয়তো সাধারণ গানের আসর কিংবা রেকর্ড সংগীতের জগৎ থেকে এ পাট একপ্রকার উঠেই গেছে। রাগপ্রধান গান টিকে আছে বটে, তবে ক্ষীণভাবে টিকে আছে। তাকে পূর্ণগৌরবে বাঁচিয়ে রাখতে পারলে একটা কাজের মতো কাজ করা হতো। আধুনিক বাংলা গানের জগতে ইদানীং যে সর্বব্যাপী সুরের নৈরাজ্য চলছে, সুরসৃষ্টির নামে আসুরিকতার কোলাহলের সৃষ্টি হয়েছে, তার প্রতিষেধক হিসাবে রাগপ্রধান গানের সুরসমৃদ্ধির একটা সুস্পষ্ট গঠনাত্মক ভূমিকা ছিল। কিন্তু সেই ভূমিকাকে তেমন করে কাজে লাগানো হল না, এইটেই পরিতাপের।

অনেকে সংগীতাচার্য ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের গ্রামোফোন রেকর্ডের গাওয়া নতুন পর্যায়ের বাংলা গানগুলিকে রাগপ্রধান গান বলেন। গানগুলির এই পরিচয় ঠিক নয়। আবার সেগুলি বাংলা খেয়াল বর্গের গানও নয়। সেসব গান একটা স্বতন্ত্র সৃষ্টি, স্বতন্ত্র গীতরূপ—শিল্পীর ব্যক্তিত্বের দীপ্তিতে অপরূপ আভায় উদ্ভাসিত। যদি সেসব গানকে কোন নামে চিহ্নিত করতে হয় তো তার জন্য অন্য নামের সন্ধান করতে হবে, বাংলা গান বা রাগপ্রধানের প্রচলিত লেবেলে তাদের চিহ্নিত না করাই ভালো। ভীষ্মদেবের এইরূপ কয়েকটি গানের নাম করছি—'নবারুণ রাগে তুমি সাথী গো' (ভৈরবী), 'তব লাগি ব্যথা ওঠে গো কুসুমি, সে কি 'জানো না তুমি' (দেশী টোড়ী), 'ফুলের দিন হল যে অবসান' (জয়জয়ন্তী), আলোক লগনে' (রামকেলি), ইত্যাদি। এসব গানের স্বরক্ষেপ প্রণালী, সুরবিস্তার, বোলতান, সরগম প্রভৃতি অলংকরণ কৌশল ভীষ্মদেবের অসামান্য সাংগীতিক প্রতিভাতেই শুধু সম্ভব, অপরের পক্ষে তার অনুকরণ করতে যাওয়া মূঢ়তা। ভীষ্মদেব যখন এই শ্রেণীর গান গলায় ফুটিয়ে তোলেন তখন তিনি তো শুধুই গায়ক নন, তিনি সুরস্রষ্টাও বটেন। তিনি গানের অভ্যন্ত সুররূপে নিজের ব্যক্তিত্বের জাদুও কিছু সংযোগ করেন। যাকে বলে শিল্পীর ব্যক্তিগত স্টাইল, সেই স্টাইলের বিচ্ছুরণে ভীষ্মদেবের এই শ্রেণীর প্রতিটি গান ভাস্বর। সারা বাংলা গানের জগৎ ঢুঁড়লেও এই গানগুলির তুলনা খুব কমই মিলবে।

গানগুলির রচয়িতাদের মধ্যে আমরা অজয় ভট্টাচার্য আর শৈলেন রায়ের নাম পাই। অন্য নামও থাকা সম্ভব।

২

বাংলা গানে কথার যে একটি বিশিষ্ট ঐতিহ্য আছে, কেবলমাত্র সুরেই যে বাঙালী শ্রোতার মন ভরে না, বাক্-এর সঙ্গে যেমন অর্থের সম্পৃক্তি, তেমনি কথা ও সুরের অঙ্গাঙ্গী সম্পৃক্ত হরগৌরী রূপটাই যে বাংলা গানের সহজাভ্যস্ত রূপ— তার উল্লেখ আলোচনার গোড়াতেই করা হয়েছে। কিন্তু এ কথা বলার মানে এ নয় যে, বর্তমান লেখক কথা ও সুরের এই তথাকথিত সামঞ্জস্যের তত্ত্বটি পুরাপুরি সমর্থন করেন। বাংলা গানে কথা ও সুরের এই সুসমঞ্জস ঐক্যের ঘটনাটিকে এখানে একটি 'ফ্যাক্ট' হিসাবে বিবৃত করা হয়েছে, তাকে আদর্শ হিসাবে তুলে ধরবার জন্য নয়। বরং পূর্ববর্তী আলোচনার ধারা থেকে পাঠক আশা করি ধরতে পেরেছেন লেখকের স্বাভাবিক পক্ষপাত কোন্ শ্রেণীর গানের প্রতি। লেখকের বিনীত অভিমত এই যে, গানের জগতে কথা ও সুরের সমানুপাতিক সামঞ্জস্যের ধারণাটি একটি নিখুঁত গীতাদর্শ নয়। গান যেহেতু সুরকে ভিত্তি করেই মূলত গড়ে উঠেছে, সেই কারণে গানে কথাকে ছাপিয়ে সুরের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে, এইটেই প্রত্যাশিত, এইটেই সংগত। কথার প্রাধান্যের জন্য রয়েছে কবিতার জগৎ, কাব্যের পরিমণ্ডল—কথাকে তার পূর্ণ মহিমায় সেইখানেই প্রকটিত দেখতে চাওয়া বিধেয়। তার জন্য সুরের রাজ্যে এসে হানা দেওয়ার সার্থকতা বোঝা যায় না। সুরের রাজ্যে সুরটাই শ্রোতার মনোযোগের কেন্দ্র হওয়া উচিত, কথাকে সুরের সঙ্গে মনোযোগের সমান-সমান ভাগ দিতে গেলে সেটা প্রায়ই একটা বিসদৃশ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। সেইক্ষেত্রে কবিতার উপভোগকে আমরা ভুল করে ভাবি গানের উপভোগ, কথার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে মনে করি সুরের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হলাম। এই বিভ্রম বাংলা গানের উপভোগের বেলায় হামেসাই ঘটতে দেখা যায়।

যদি বলেন বাংলা গানে বাণী অংশকে সুরের উপরে প্রাধান্য দেবার কথা তো বলা হচ্ছে না, বলা হচ্ছে, কথা ও সুর দুইয়ের ভিতর একটা সুষ্ঠু সমন্বয় প্রতিষ্ঠার কথা। দুই বেণীকে জোড়া মিলিয়ে যেমন একবেণী, তেমনি কথা ও সুরকে একত্র মিলিয়ে বাংলা গানের একটা অখণ্ড যুগ্ম রূপ ফুটিয়ে তোলার সাধনাটাই বাংলা গানের শিল্পীর সাধনা হওয়া উচিত—এইটেই এই 'হরগৌরী' বা 'গঙ্গাযমুনা' তত্ত্বের মূলকথা। গঙ্গা ও যমুনার জলধারা যখন একত্র মিশে যায়, তখন তার কোন্ ধারাটি গঙ্গার কোন্ ধারাটি যমুনার এই প্রশ্ন যেমন অবান্তর হয়ে যায়, এও

অনেকটা সেইরকম। কথা ও সুরের সুসমঞ্জস মিলিত রূপেরই আরেক নাম বাংলা গান—বাংলা গানে কথা ও সুরের বড়-ছোটর প্রশ্ন ওঠে না।

এর উত্তরে বলি, বাংলা গানে কথা ও সুরের 'পার্বতীপরমেশ্বর' রূপের সমর্থনে উপরের অনুচ্ছেদে যে-যুক্তিক্রমের বিস্তার করা হয়েছে তা আপাত-মনোহর হলেও তার মধ্যে ফাঁক আছে। একাধিক ফাঁক। প্রথম ফাঁকের কথা আগেই বলেছি। সংগীতের রাজ্য যেহেতু সুরের রাজ্য, সেই কারণে গানের ব্যপদেশে কথা ও সুরের অঙ্গাঙ্গী সমীকরণের কোন কথাই উঠতে পারে না। সেখানে কথা অপেক্ষা সুরের গরীয়সী ভূমিকাটাই সমধিক মান্য। গানকে কবিতার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলার কোন মানে হয় না। দ্বিতীয়ত, 'গঙ্গাযমুনা' তত্ত্বটির মধ্যে কিছু উপমার কুহক আছে। ওই কুহকটি বাদ দিলে দেখা যাবে, যমুনা কখনও গঙ্গার সঙ্গে সমপর্যায়ের নদী হিসাবে উপমিত হতে পারে না। উপমা-উৎপ্রেক্ষায় কখনও সত্যের প্রতিষ্ঠা হয় না, ওতে শুধু বিভ্রমটাই আরও বাড়ে। তৃতীয়ত, কথাকে যে এখানে সুরের সমমর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়েছে, ওই ছিদ্রপথেই কিন্তু আজকের বাংলা গানে সুররিক্ততার কলি প্রবেশ করেছে। সুরকে যখনই কথার পর্যায়ে নামিয়ে এনে দুইকে সমসারে সাজাবার মন্ত্রণা দেওয়া হল, বুঝতে হবে তখুনি সুরকে উত্তরোত্তর খাটো করবার পথ প্রশস্ত করা হল। এই যে এখনকার বাংলা গানে সুর বলতে আর কিছুরই দেখা মেলে না, কেবলই কথার কোলাহল আর যন্ত্রসংগীতের অনাবশ্যক হুলুস্থুল, তার একটা কারণ কি এই নয় যে, কথাকে সুরের সমমর্যাদা দিতে গিয়ে প্রকারান্তরে সুরের নির্বাসনেরই সহায়তা করা হয়েছে আর ওই নির্বাসনের রন্ধ্রপথেই এই অবাঞ্ছিত অবস্থাটি ঘটিয়ে তোলা হয়েছে ?

দুই-চারিটি দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা আরও পরিষ্কার হতে পারে। সেই চেষ্টাই এখন করব। হয়তো এই পর্যায়ের আলোচনায় প্রচলিত মতের বিরুদ্ধাচারণ করে দুই-একটি অপ্রিয় কথা বলতে হতে পারে। তার জন্য শুরুতেই পাঠকের মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি।

উদাহরণস্বরূপ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র সংগীত সৃষ্টির প্রসঙ্গ ধরা যাক। রবীন্দ্র-সংগীতের তিনটি সুস্পষ্ট স্তর : ব্রহ্মসংগীতের স্তর-(১৮৮০-১৯০০) ; স্বদেশী গান ও প্রকৃতি-সংগীতের স্তর (১৯০০-২০) ; সুররচনায় শাস্ত্রীয় বন্ধন সহ সবরকম বন্ধন থেকে মুক্তির স্তর (১৯২০-৪১)। রবীন্দ্র-সংগীতের প্রাতিষ্ঠানিক প্রবক্তারা,

অর্থাৎ 'বিভিন্ন রবীন্দ্র-সংগীত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত রবীন্দ্র-সংগীত অভিজ্ঞ প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিরা, রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের সুররচনাগুলিকে তাদৃশ গুরুত্ব দিতে চান না ; তাঁদের পক্ষপাত পূর্বোক্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বের গানগুলির প্রতি। তার কারণস্বরূপে তাঁরা বলেন, প্রথম পর্বের গানে আছে হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ সংগীতের শাস্ত্রীয় অনুশাসনের আধিপত্য, যা ওই পর্বের গানগুলিকে আশানুরূপ স্বচ্ছন্দ ও অবাধ হতে দেয়নি, বরং তাদের প্রকাশকে পদে পদে ঋজু ও আড়ষ্ট করে রেখেছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বের রবীন্দ্র-সংগীতে আছে শাস্ত্রীয় বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের সুস্পষ্ট প্রয়াস : ধ্রুপদ সংগীতের দৃঢ়বদ্ধ কাঠামো ও শাস্ত্রানুসারী পরিবেশনা-রীতিকে অগ্রাহ্য করে ওই গানে পাওয়া যাবে কথা ও সুরের স্বচ্ছন্দ লীলা, এবং রাগরূপের পরিবর্তে বাউল ভাটিয়ালি কীর্তনাঙ্গ প্রভৃতি দেশী সুরের প্রয়োগে ওইসব গান হয়ে উঠেছে বাংলা দেশের মাটির অনেক কাছাকাছি জিনিস। স্বদেশী গানগুলিতে বাউল সুরের প্রাধান্য, ষড়্‌ঋতুর গানগুলিতেও তা-ই। এসব গানের 'তুক' বা 'কলি' বিভাগে ধ্রুপদের সংস্কার অনুসরণ করা হয়েছে, কিন্তু সেটা বহিরঙ্গ সংস্কার মাত্র ; গানের প্রাণ-সত্তার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে লৌকিক সুরের সাহায্যে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ এই পর্বের রচনাগুলিতে ধ্রুপদের বন্ধনসীমা অতিক্রম করে সজ্ঞানে বাংলার স্বকীয় সুরের জগতে প্রবেশ করেছেন। তৃতীয় পর্বে, অর্থাৎ জীবনের শেষ দুই দশক কালসীমার ভিতরে, কবি যেসব গান রচনা করেছিলেন তাতে যে তিনি কেবল শাস্ত্রীয় সুরের আধিপত্যকেই অস্বীকার করেছেন, তাই নয় ; শাস্ত্রীয় তালের আধিপত্যকেও অস্বীকার করেছেন। কবি যে 'সংগীতের মুক্তির' আদর্শ প্রচার করেছেন তাঁর বিভিন্ন সংগীত সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে ('সংগীতচিন্তা' দ্রষ্টব্য) তারই একটি কার্যকর বাস্তব রূপ ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছেন শেষ কুড়ি বছরের গান-গুলিতে। তাছাড়া কথা ও সুরের সুসমঞ্জস সমীকরণের আদর্শেরও একটা বিশ্বস্ত প্রতিরূপ দিতে চেয়েছেন এই রচনাগুলিতে। প্রথম পর্বের ধ্রুপদাঙ্গ ব্রহ্মসংগীত-গুলির তুলনায় মধ্য ও শেষ পর্বের রচনাগুলির সুর যে অনেক বেশী সহজ সরল নিরাভরণ, তা সামান্য তুলনামূলক বিচারেই ধরা পড়বে।

রবীন্দ্র-সংগীতের প্রাতিষ্ঠানিক আলোচকদের (যথা, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শান্তিদেব ঘোষ, শুভ গুহঠাকুরতা, কিরণশশী দে, রাজ্যেশ্বর মিত্র প্রমুখ) গ্রন্থাবলী অনুধাবন করে যতদূর বুঝতে পারা যায় তাতে মনে হয় এঁদের সকলেরই

কমবেশী মনের ঝোঁক দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ের গানগুলির প্রতি। শাস্ত্রীয় সংগীতে এঁদের আসক্তি কম। যেহেতু কথা ও সুরকে ওই দুই পর্যায়ের গান-গুলিতে প্রায় সমান-সমান মর্যাদা বেঁটে দেওয়া হয়েছে এবং সুরযোজনায় রাগ-সংগীতের প্রভাবকে বিধিমতে খর্ব করে সেগুলিতে বাংলার নিজস্ব লৌকিক সুরের ব্যাপক প্রয়োগ করা হয়েছে, তালপ্রকরণ অর্থাৎ ছন্দ ও লয়ের প্রথাসিদ্ধ বন্ধনের ঘটানো হয়েছে মুক্তি; সেই কারণেই যেন এঁরা আরও বিশেষ ভাবে এই দুই পর্বের গানগুলির প্রতি অনুরক্ত। যেন শাস্ত্রীয় প্রভাবকে অতিক্রম করতে পারাটাই একটা মস্ত বড কীর্তি, যেন রাগসংগীতের সুরের ঐতিহ্যকে নস্যাৎ করে লৌকিক সুরের নেশায় মেতে উঠলেই সুরের জগতে একটা মস্ত বড অগ্র-গতি হয়ে গেল।

অবশ্য রবীন্দ্রসংগীত-বিশেষজ্ঞ সুবিনয় রায় ও প্রফুল্লকুমার দাস এই দুজনার মত কিছু ভিন্ন। তাঁরা রবীন্দ্র-ধ্রুপদাঙ্গ গানের গভীর অনুরাগী আর সুবিনয়বাবু তো এই শ্রেণীর গানের একজন সিদ্ধশিল্পী।

বর্তমান লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী কিছু ভিন্ন। আমি মনে করি কবির প্রথম পর্বের রচনাগুলিই এই তিন পর্বের রচনাবলীর মধ্যে সবচেয়ে সার্থক রচনা। তার মানে এ নয় যে, কী সংগীতে কী শিল্পে কী সাহিত্যে কী সামাজিক আচার-প্রথার ক্ষেত্রে আমি রক্ষণশীল মনোভাবের অনুগামী কিংবা শাস্ত্রশাসনের পক্ষপাতী। কিংবা ব্রহ্মসংগীতগুলির ভক্তিভাব আমাকে বিশেষভাবে টানে। মোটেই তা নয়। আমার বিচারের মানদণ্ড—সুর, এবং একমাত্র সুর। ভারতীয় সংগীতে সুর বা মেলডির সুর্বাতিশায়ী গুরুত্ব। রাগসংগীতই হোক আর আঞ্চলিক সংগীতই হোক, সকলপ্রকার সংগীতের উৎকর্ষ বিচারের একটিই মাত্র মাপকাঠি আছে—সুর। সেই সুরের কষ্টিপাথরে কষেই বলছি, ব্রহ্মসংগীতগুলির সঙ্গে স্বদেশ, প্রকৃতি, উৎসবানুষ্ঠান প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের গানগুলির কোন তুলনাই চলতে পারে না। ভাবগাম্ভীর্যে, সুরের সংযত গভীর-মহিমান্বিত প্রকাশে, ছন্দের ওজঃগুণান্বিত দোলায়, 'তাঁহারে আরতি করে চন্দ্র তপন' (বড়হংস সারং), 'আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে' (মিশ্র হাম্বীর), 'আজি প্রণমি তোমারে চলিব নাথ সংসার কাজে' (বিভাস) প্রভৃতি গানের সঙ্গে, ধরা যাক, 'আজি সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে' (বাউল), 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয় রে তোরা আয়' (ঋতুসংগীত), 'বসন্তে তোর ফোটা ফুলের মেলা' (ভাটিয়ালি), 'প্রাণ চায় চক্ষু-না

চায়' (তুলকি চালের প্রেমসংগীত) প্রভৃতি চটুল সুরের গান কি সমপর্যায়ভুক্ত হতে পারে? কিসের সুরের মুক্তি? সুরের মুক্তির আরেক নাম কি সুররিক্ততা, সুরের দৈন্য, সুরের আভরণহীন সারল্য? শিল্পের ক্ষেত্রে সহজিয়া সাধনা কি সর্বাবস্থাতেই মান্য? রাগের আমেজ বাদ দিয়ে কি গান হয়? সাধনা ও অনুশীলনের সম্পর্কশূন্য গান কি একটা গান? যে গান গাইতে সুরে আবৃত্তি করার বাড়া ব্যায়ামের প্রয়োজন হয় না, এবং স্বরলিপি মুখস্থ করে যে গান হুবহু গলায় তোলা যায়, যাতে শিল্পীর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব প্রকাশের কোন অবকাশ নেই, নেই সুরবিস্তারের সুযোগ, সে কি একটা গানের মতো গান হল? অধিকাংশ রবীন্দ্রসংগীত গায়ক-গায়িকারা যে সহজ সুরের গানগুলির দিকেই বেশী ঝোঁকেন, ব্রহ্মসংগীতসমূহের পারতপক্ষে কাছ ঘেঁষতে চান না, তার মানে কি এই নয় যে, প্রথমোক্ত গানগুলি মুখস্থ বিদ্যার ভিত্তিতে বিনা আয়াসেই গাওয়া যায়, পক্ষান্তরে ধ্রুপদাঙ্গ চালের গানগুলি গাইতে কিছু 'এলেম'-এর প্রয়োজন হয়, যে-'এলেম' এঁদের অনেকেরই নেই?

শিল্পে সহজিয়া সাধনা একটা কথার কথা। এই ক্ষতিকর তত্ত্বের প্রশ্রয়েই আজ বাংলা গানের জগতে যত রাজ্যের অনাসৃষ্টির অত্যাচার। বেনোজলের জোয়ার প্রবেশ করে সুরের এলাকায় লণ্ডভণ্ড কাণ্ড বাঁধিয়ে তুলেছে। শিল্পীদের সংযত করবার কোন স্থির আদর্শ, সুশৃঙ্খল আদর্শ তাঁদের চোখের সামনে নেই। যেমন অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে, তেমনি বাংলা গানের ক্ষেত্র থেকেও সংযম ও শৃঙ্খলার আদর্শ অন্তর্হিত হবার উপক্রম করেছে। পূর্বোল্লিখিত রবীন্দ্রসংগীত আলোচকেরা যে রবীন্দ্রসংগীতের অনুষঙ্গে 'সুরের মুক্তির' আদর্শের পোষকতা করেন, তাঁরা কি এ কথা উপলব্ধি করতে পারেন না যে, ওই সুরের মুক্তির দোহাই পেড়েই আজকের বাংলা গানের সুরকার ও শিল্পীরা সুরের যথেচ্ছাচারে মেতে উঠেছেন? এঁদের স্বৈরাচরণে অস্থির হয়ে সুর বাংলা গানের আঙিনা থেকে 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাক ছেড়ে পালাবার পথ খুঁজে পাচ্ছে না? কেন তবে এই সুরের মুক্তির আদর্শের উপরে অনাবশ্যক ঝোঁক? গানকে সাদামাঠা আর সুররিক্ত করতে পারলেই কি গানের মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে গেল?

এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা ভেবে দেখার আছে। শুনতে পাই অতুল-প্রসাদের গানে নাকি ঠুংরী ভঙ্গীর সুরের বিশেষ প্রভাব বিদ্যমান। এটাও বাংলা গানের রাজ্যের একটি অপরীক্ষিত, অভিজ্ঞতার দ্বারা যথোচিতরূপে সমর্থিত নয়

এমন আর একটি কিংবদন্তী। কিন্তু এই কিংবদন্তী পরীক্ষণের ধোপে টেকে না। প্রচলিত মতের প্রতি কুর্নিশ জানিয়ে এই লেখকও একাধিকবার অতীতে অতুলপ্রসাদের তথাকথিত ঠুংরীমনস্কতা নিয়ে গদগদ হয়েছেন, কিন্তু আর একটু critical দৃষ্টি নিয়ে অগ্রসর হবার ফলে দেখতে পাওয়া গেছে, অতুলপ্রসাদের গানে ঠুংরী চালের প্রভাব থাকলেও তার পরিমাণ খুবই কম; অন্তত এমন নয় যে, তা নিয়ে হইচই করা চলে। ঠুংরীর দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য স্বরমিশ্রণ ও স্বরবিস্তার। অতুলপ্রসাদের গানে এই দুই বৈশিষ্ট্যের বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই। লছা ঠুংরীর ধরনে গানের এখানে-সেখানে ঠুংরীর দু-একটি খোঁচ হয়তো চোখে পড়ে কিন্তু তাতে কি প্রমাণ হয় অতুলপ্রসাদ বাংলা গানকে ঠুংরীর ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যময় করে তুলেছিলেন—বাংলা গানকে উত্তরভারতীয় সুরসমৃদ্ধিতে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন?

তাছাড়া, অতুলপ্রসাদ গোটা জীবনে মাত্র দুশো ছ'টি গান রচনা করেছিলেন, সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের রচনার সংখ্যা সোয়া দু'হাজার, নজরুলের তিন হাজারের বেশী। এত স্বল্প পুঁজির ভিত্তিতে একজন প্রথম শ্রেণীর সুরকারের গৌরব দাবি করা চলে না। যদিও শতবার স্বীকার করব, সংখ্যা সব সময় উৎকর্ষ-বিচারের খুব নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড নয়, তাহলেও সৃজনী আবেগের নিরিখ হিসাবে প্রাচুর্যকে একেবারে উড়িয়েও দেওয়া চলে না।

আসলে অতুলপ্রসাদ সুর-যোজনায় বাংলা গানের গতানুগতিক ঐতিহ্যকেই কমবেশী অনুসরণ করেছেন। গান পরিবেশনার রীতিতে তিনি রবীন্দ্রাদর্শের দ্বারা পুরামাত্রায় প্রভাবিত। রবীন্দ্রসংগীতে যেমন স্বরবিস্তার নেই, তেমনি এঁর গানেও নেই। ঠুংরীর ছাঁচে গড়া গান হলে শিল্পীর কণ্ঠরূপায়ণের যদৃচ্ছ স্বাধীনতা থাকত; কিন্তু অতুলপ্রসাদের গানের শিল্পীদের ওই স্বাধীনতা আছে বলে কেউ জানে না। রবীন্দ্রসংগীতের এলাকায় যেমন যত রাজ্যের মামুলী শিল্পীর ভিড়, অতুল-গীতির এলাকাতেও তাই।

বাংলা গানের বিবিধ ক্ষেত্রে নূতনত্ব প্রবর্তনের সর্বাধিক কৃতিত্ব যে মানুষটির, তাঁর নাম—কাজী নজরুল ইসলাম। নজরুলের সাংগীতিক প্রতিভার এখনও প্রকৃত মূল্যায়ন হয়নি। হলে দেখা যাবে তাঁর অবদানের মূল্য অশেষ। তাঁর গানের একটি প্রধান কৃতিত্ব, তিনি বাংলা গানে সজ্ঞানত উত্তর ভারতের লোক-প্রচলিত দেহাতী সুরের গানে যে-অপূর্ব সুরের মাদকতা নিহিত আছে, তার সম্মোহনের দ্বারা বাংলা গানকে মনোমুগ্ধকর করে তুলেছেন। সত্যিকার মুসলমানী

আমেজ বাংলা গানে তিনিই এনেছেন, অতুলপ্রসাদ নন। অতুলপ্রসাদ মুসলমানী সংস্কৃতির পীঠস্থান লক্ষ্ণৌর অধিবাসী হলেও লক্ষ্ণৌয়ের মনমেজাজ তাঁর গানে ধরা পড়েনি, ধরা পড়েছে নজরুলের গানে। অতুলপ্রসাদ বড্ডবেশী রবীন্দ্রপ্রভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন, আর এ কথা কে না জানেন যে রবীন্দ্রসংগীতের সুরের গঠনে মুসলমানী আমেজ আদৌ নেই? বলা আবশ্যক যে, এখানে মুসলমানী আমেজ কথাটাকে তার সাম্প্রদায়িক অনুষঙ্গে ব্যবহার করা হচ্ছে না, ব্যবহার করা হচ্ছে সুরের অনুষঙ্গে। বিভিন্ন ঘরানার আশ্রয়ী মুসলমান ওস্তাদদের স্বরসৃষ্টির অপূর্ব কলাকৃতি ভারতীয় সংগীতে ইতিমধ্যেই একটি প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছে।

নজরুল-গীতির বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। এ সম্বন্ধে আমার 'কাজী নজরুলের গান' বইয়ে ও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত একাধিক প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। আগ্রহী পাঠক ইচ্ছা ও অবসর সাপেক্ষে সেই রচনাগুলি নেড়েচেড়ে দেখতে পাবেন। বর্তমান গ্রন্থে সেগুলির চুম্বকস্বরূপ 'নজরুল-গীতির পরিচয়' নামক একটি প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট করা হল। তাতে সংক্ষেপে নজরুল-সংগীতের মূল কথাগুলি দেওয়া আছে।

৩

আধুনিক বাংলা গান হালফিল যে আকারে পরিবেশিত হচ্ছে তার ভিতর নানা জগাখিচুড়ি প্রভাব এসে মিশেছে। বাংলা গান যখন, তখন বাংলা গানের ধারাধরনের কতক প্রভাব তো তার ভিতর থাকবেই, তবে যে প্রভাবগুলি ইদানীং বেশী দৃষ্টিগোচর তার কোনটাই দেশী নয়। এসব বাইরের প্রভাবের মধ্যে আছে বোম্বাইয়ের হিন্দী ছায়াছবির চটুল গানের সুরের ঢঙ,—পশ্চিমী রক-অ্যাণ্ড-রোল আর পপ মিউজিকের সস্তা সুরভঙ্গী, কখনও বা জ্যাজ-এর আদল। এসব গানের কথায় পূর্বের বাংলা গানের কবিত্বের ছিটেফোঁটাও নেই। এটা নাকি রিয়ালিজমের কাল। তাই এখনকার গীতিকাররা সব আদাজল খেয়ে লেগেছেন গানের কথাকে কে কত আটপৌরে আর কথ্যরীতির কথার কাছাকাছি আনতে পারেন তার অলিখিত প্রতিযোগিতায়। উদ্ধৃতি দিতে পারলে ভালো হতো, কিন্তু উদ্ধৃতির যোগ্য নয় এসব গানের চরণ।

গায়কদের পরিবেশনার প্রণালীও তেমনি। তাঁরা কথাগুলিকে সুরাশ্রিত করে

গান না, গান আবৃত্তির ঢঙে সানুনাসিক ভঙ্গীতে। তার উপর অনেক গানেই শব্দগুলিকে কাটা-কাটা ছেঁড়া-ছেঁড়া ভাবে তারস্বরে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেওয়া হয় আর গলায় একটা কৃত্রিম আহ্লাদের আদুরে ধ্বনি তোলা হয়। সুরের যেমন গমক অলংকার, কথারও এ এক ধরনের গমক অলংকার। কী বিশ্রী যে শুনতে লাগে তা আর কহতব্য নয়।

এর উপরে আছে যন্ত্রসংগীতের অযথা কোলাহল ও একাধিপত্য। গ্রামোফোন রেকর্ডের কোন কোন আধুনিক গান শুনে মনে হয় যন্ত্রসংগীতটাই যেন তাতে মুখ্য, কণ্ঠের গীতকে দয়া করে সামান্য একটু জায়গা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এমন গান আছে যাতে অর্কেস্ট্রা গানের বারো-আনা জায়গা জুড়ে থাকে, কণ্ঠের ধ্বনি মাত্র নিমিত্তের স্থান পায়। গানের সুরটা উপলক্ষ্য, তাল-বেতালে ছন্দের ভুলকি আমেজ সৃষ্টিটাই লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। এমন পরিবেশনার রীতিতে সুরের যে সহজেই কৈবল্যপ্রাপ্তি ঘটে, সে কথা বোধহয় না বললেও চলে।

অবশ্য এ কথার ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। ব্যতিক্রম আছে, তবে ব্যতিক্রম দিয়ে কি আর যথার্থ স্থিতিকে বোঝানো যায়? ব্যতিক্রম ব্যতিক্রম-রূপেই গণনীয়।

ব্যতিক্রমের একটি ক্ষেত্র হল বিবিধ প্রকারের গণসংগীত, যার প্রবক্তা হলেন সলিল চৌধুরী, হেমাঙ্গ বিশ্বাস প্রভৃতি বিশিষ্ট সুরকারগণ। কিন্তু সেটা এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নয় বলে এখানে সেই বিষয়ের আলোচনা থেকে বিরত থাকলুম। সে আলোচনা অন্য কোন উপলক্ষ্যে করা যেতে পারে।

ভারতীয় সংগীত, ইউরোপীয় সংগীত, রবীন্দ্রসংগীত

ভারতীয় সংগীত একান্তভাবে স্বরপ্রধান, বাণী এই সংগীতের গৌণ দিক। ভারতীয় সংগীত বলতে এখানে বোঝাচ্ছে ক্লাসিকাল সংগীত, এদেশের উত্তরে ও দক্ষিণে, পশ্চিমে ও পূর্বে এবং মধ্যে প্রচলিত তার আঞ্চলিক বা লৌকিক রূপগুলি নয়। রাগ-রাগিণী এই সংগীতের ভিত্তি, এবং স্বর বা মেলডি এর প্রাণ। কথা এই সংগীতে স্বরকে খেলাবার একটা আশ্রয় বা অবলম্বন মাত্র, কথার আলাদা গুরুত্ব বিশেষ নেই। একথা, কি ধ্রুপদ কি খেয়াল কি টপ্পা কি ঠুংরী ভারতীয় ক্লাসিকাল সংগীতের এই প্রধান চার বিভাগ সম্পর্কেই কমবেশী প্রযোজ্য। ধ্রুপদ ও ঠুংরীতে কথার কিছু ভুমিকা আছে বটে—যেমন ধ্রুপদে ভক্তিভাবের কিংবা প্রকৃতি-বন্দনার ভাবটুকু লক্ষণীয় এবং ঠুংরী গানে 'ভাও বাৎলাবার' ছলে প্রেমের আকুতির প্রকাশ তার বাণীবৈশিষ্ট্যকে অল্প-বিস্তর চিহ্নিত করতে দেখা যায়। কিন্তু কাব্যসংগীতের বাণীসম্পদের তুলনায় সেটা কিছু নয়। ধ্রুপদের ভগবৎভক্তি বা নিসর্গবর্ণনা কাব্যসৌন্দর্যে প্রায়ই অনুল্লেখ্য, এমনকি স্বামী হরিদাস, তানসেন, বৈজু বাওরা, গোপাল নায়ক প্রমুখ শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদীদের গীতরচনাকে জড়িয়েই একথা বলছি। আর কদর পিয়ার ঠুংরী গানও প্রেমের অনুভবের যান্ত্রিক অভিব্যক্তি মাত্র, ঠুংরী গানে প্রেম-প্রণয়ের কথা থাকতে হবে বলেই যেন নিতান্ত অভ্যাসের বশে ওই গানে ভালবাসার কথা যোজনা করা হয়েছে। প্রায়ই রাধাকৃষ্ণের প্রেমের প্রথাবদ্ধ অনুভূতিকে গতানুগতিক ভাষায় প্রকাশের একটা চেষ্টা ওই ঠুংরীর বাণী অংশে প্রকট। সত্যিকার প্রণয়গীতির কাব্যসৌন্দর্যের সঙ্গে এ একেবারেই তুলনীয় নয়। রবীন্দ্রনাথের প্রেম পর্যায়ের গান কিংবা কাজী নজরুলের গজল গানের বাণীর মাধুর্যের পাশে লক্ষ্ণৌ, ফৈজাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত প্রথাসিদ্ধ ঠুংরী গানের বাণী নিতান্ত নিষ্প্রভ। প্রেমের বাজার-চলতি ধারণার প্রকাশে ঠুংরী গানের কথা আষ্টেপৃষ্ঠে মামুলীত্বের ছাপ চিহ্নিত।

খেয়াল গানে কথার ভূমিকা সবচেয়ে কম। ধ্রুপদ যেমন বাণীবদ্ধ আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ—এই চার 'তুক' বা কলিতে সচরাচর বিভক্ত, খেয়াল গানে তেমন নয়। খেয়াল গান প্রায়শঃ আস্থায়ী ও অন্তরা এই দুই তুকে

বিভক্ত। কোন কোন গানে আবার অন্তরাও অনুপস্থিত, কেবলমাত্র আস্থায়ীর দ্বারা কাজ চালাতে দেখা যায়। আর সেও কি আস্থায়ী, মাত্র একটি কি দুটি কি তিনটি শব্দের সমষ্টি মাত্র। পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের 'মিতওবা' গানটি স্মরণ করুন। এটি কর্ণাটী রাগ নীলাম্বরীর ভিত্তিতে গঠিত। এই গানে মিতওবা ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন শব্দ নেই। অথচ গানটির সুরের অপরূপ লীলায়িত প্রকাশে কথার স্বল্পতা আদৌ কোন প্রতিবন্ধক হয়নি। কী চমৎকার সুরের জালই না সৃষ্টি হয়েছে গ্রামোফোন রেকর্ডের এই বিশিষ্ট গানটির রূপায়ণ ক্রিয়ার মধ্যে। তেমনি ওস্তাদ আবদুল করিম খাঁ, ফৈয়াজ খাঁ, গোলাম আলী খাঁ, আমীর খাঁ, কেশরবাঈ কারকার, হীরাবাঈ বরোদকার প্রমুখ প্রসিদ্ধ খেয়াল গাইয়েদের গানে কথার ভাগ নাম মাত্র ; সুরবিস্তার, তানকর্তব, বোলতান, সরগম এগুলিই হল আসল। কথা এঁদের গানে একটা অছিলা মাত্র—সুরকে খেলাবার একটা অছিলা। বাগানে লতাপুষ্পের লতিয়ে ওঠার পক্ষে বেড়ার যে ভূমিকা, এঁদের ও এঁদের সমধর্মী অন্যান্য শিল্পীদের খেয়াল গানে কথার ভূমিকা তার চাইতে বেশী গণনীয় নয়। বস্তুত খেয়ালিয়ারা কথার কাব্যসৌন্দর্য নিয়ে বড় একটা মাথা ঘামান না, তার প্রয়োজনও বোধ করেন না। কথায় কাব্যসৌন্দর্য থাকলে ভাল, না থাকলেও বিশেষ কিছু যায় আসে না। খেয়াল গানে সুর-ফোটানোটাই হল মুখ্য, এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলে খেয়ালিয়ারা আর কিছু চান না।

টপ্পায় অথবা টপ্ খেয়ালে অবশ্য কথার কিছু ভূমিকা আছে, কিন্তু সেও ঠুংরী গানের প্রথাবদ্ধ প্রেমমূলক বাণী রচনার যান্ত্রিকতার সুরেই কমবেশী সীমাবদ্ধ। সমাজে একজোড়া নরনারীর মধ্যেকার ভালবাসার আকর্ষণের যে সংস্কারগত ধারণা প্রচলিত, তেমন অভ্যাসের ছাপটাই টপ্পার কথাংশে অল্পবিস্তর স্পষ্ট। সম্প্রতি শোরী মিঞা রচিত টপ্পা গানের একটি সংগ্রহের উপর চোখ বুলাবার আমার অবকাশ হয়েছে। তাই থেকে দেখলুম মামুলী প্রেমের ভাব ছাড়া এই-সকল গানের কথার আর কোন বৈশিষ্ট্য নেই। সেই চাঁদ-চকোরের পুরনো উপমা, বিনিদ্র নিশি একা যাপনের যন্ত্রণার কথা ইনিয়ে-বিনিয়ে বলা। তাতে অবশ্য আলোচ্য টপ্পা গানগুলির সুরসৌন্দর্যের কোন হানি হয়নি। বরং কথার বাধকতা কম বলে সুরকে ইচ্ছামত লীলায়িত করার আরও বেশী সুযোগ হয়েছে। ভারতীয় ক্লাসিকাল সংগীতের ধরনটাই এমন যে, সেখানে কথা নিয়ে বড় একটা কেউ মাথা ঘামায় না, সুরের সৌন্দর্য মাধুর্য শোভা সৌকুমার্য এগুলির উপরেই

সেখানে সকলের মনোযোগ নিবদ্ধ। কথার জাদু না থাকলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু সুরের জাদু চাই-ই চাই।

অবশ্য নিধুবাবুর টপ্পাকে শোরী মিঞার সঙ্গে এক করে দেখলে ভুল করা হবে। নিধুবাবুর টপ্পার কাব্যসৌন্দর্য প্রশ্নাতীত। কিন্তু তার কারণ টপ্পা গানের প্রকৃতির মধ্যে নিহিত নেই, নিহিত আছে বাঙালীর কাব্যগীতির প্রতি সহজাত বদ্ধমূল অনুরাগের মধ্যে। উত্তর ভারতের টপ্পা গানের কথার ঊষরতা বাংলা দেশের মৃত্তিকার শ্যামলতার স্পর্শে ভিন্ন চেহারা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। পাঞ্জাবী টপ্পা বাংলা টপ্পায় রূপান্তরিত হওয়ায় তার জাত-গোত্র দুই-ই বদলে গেছে। নিধুবাবুর টপ্পা বলতে গেলে বাংলা কাব্যগীতিরই এক অঙ্গস্বরূপ, তার ভিতর উত্তর-ভারতীয় টপ্পা গানের কথার দৈন্য নেই কিংবা সেখানে সুরেরই একমাত্র ভূমিকা নয়। বাংলার জলহাওয়ার গুণে অথবা দোষে সুরের পাশে পাশে কথা এসে সুরের হাত ধরেছে। মজ্জাগত কাব্যপ্রীতি তথা সুকুমার অনুভূতির প্রবণতার কারণে বাঙালী গানে কেবল সুরেই তৃপ্ত নয়, তার কথার সৌন্দর্য না হলে চলে না। এই বৈশিষ্ট্যটি সংগীতের অনুষঙ্গে ভাল কি মন্দ তাই নিয়ে এই প্রবন্ধে পরে আরও আলোচনা করার অবকাশ হবে। আপাতত প্রসঙ্গটির এখানেই ইতি।

যে কথা বলছিলাম। ভারতীয় ক্লাসিকাল সংগীতে কথার ভূমিকা নামমাত্র, সুরই সেখানে সর্বেসর্বা। আর এই সুরও ইউরোপীয় সংগীতের সুরের মত আঘাত-সংঘাত দ্বারা মথিত নয় কিংবা বিপরীতের লীলায় বৈচিত্র্যময় নয়। ভারতীয় সংগীতের সুর শান্তরসের সুর, অচঞ্চল প্রশান্তি এর স্থায়ী ভাব। সুরের স্থির মূর্তি এই সংগীতের ধ্যেয়, বিক্ষেপ বা সংক্ষোভ এর তেমন পছন্দ নয়। ইউরোপীয় সংগীতে ঠিক এর বিপরীত ভাব লক্ষ করা যায়।

ভারতীয় সংগীতে মেলডির ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের একটা প্রধান কারণ এই যে, এই সংগীত চরিত্র-লক্ষণে বিমূর্ত বা অ্যাবস্ট্রাক্ট। সংগীত জিনিসটাই স্বরূপত অ্যাবস্ট্রাক্ট, তার মধ্যে আধার ভারতীয় সংগীত বিশেষ করে অ্যাবস্ট্রাক্ট। এই সংগীত বিশেষ করে অ্যাবস্ট্রাক্ট এই কারণে যে, এই সংগীতে আয়োজনের কোন দরকার হয় না। উপকরণ-বাহুল্য ছাড়াই এই সংগীত লীলায়িত হতে পারে; হয়েও থাকে। অন্যান্য শিল্পকলায়, যেমন সাহিত্যে, চিত্রকলায়, নাট্যাভিনয়ে, এমন-কি নৃত্যশিল্পে অনেক কিছু উপকরণ-উপাদানের প্রয়োজন হয়, কিন্তু সংগীতে

তার কিছুরই আবশ্যকতা নেই। শুধু কণ্ঠস্বরটি আশ্রয় করলেই হল। অথবা যে-কোন একটি যন্ত্র—বীণা, সরোদ, সেতার, রবাব, সুরশৃঙ্গার, বেহালা, বাঁশী, সানাই, নাদস্বরম যাই হোক। কণ্ঠও আবার শারীরবিজ্ঞানবিদ্‌দের মতে একটি যন্ত্র। যন্ত্রে যেমন আওয়াজ হয় কণ্ঠযন্ত্রেও তেমনি আওয়াজই আমরা শুনি। সে আওয়াজ কথাতেই বদ্ধ হোক আর যন্ত্রেই বদ্ধ হোক সেটা বড় কথা নয়। কণ্ঠযন্ত্র যে সংগীত যন্ত্রেরই একটা রকমফের মাত্র তার প্রমাণ তুম-তেরে-নানা প্রভৃতি অর্থহীন শব্দ সমন্বিত তেলেনা গানের স্বীকৃতি ও সমাদর। ভারতীয় রাগসংগীতে কথা বা বাণী যদি অপরিহার্য হতো তো তার সীমানায় তেলেনা বা তারানা গানের প্রচলন হতো না। তেলেনা আসলে যন্ত্রসংগীত, তবে প্রচলিত যন্ত্রসংগীতের সঙ্গে এর প্রভেদ মাত্র এই যে, এই সংগীত কণ্ঠযন্ত্রকে অবলম্বন করে স্ফূর্তিমন্ত হয়।

এইজন্যই বলতে পারা যায় কণ্ঠের গানও একধরনের বাজনা বিশেষ। লোকান্তরিত সংগীততাত্ত্বিক অমিয়নাথ সান্যাল মহাশয় গানকে বলতেন 'কণ্ঠ-বাদন'। কেন বলতেন, উপরের বিশ্লেষণের অ লোকে সে-কথা স্পষ্ট হবে বলে মনে করি। গান বলতে অবশ্য এখানে ভারতীয় ক্লাসিকাল গান বোঝাচ্ছে। বাংলার কাব্যগীতি কিংবা রবীন্দ্র-সংগীত কিংবা আব কোন লৌকিক গান বোঝাচ্ছে না, বলাই বাহুল্য। কাব্যগীতির জাত আলাদা। তাতে সুরের ভাগ কম, কথার ভাগ বেশী। অনেকসময় এজাতীয় গানে কথার সৌন্দর্যকে ভুল করে সুরেব সৌন্দর্য বলে ভাবা হয়। ক্লাসিকাল গানে এমনতর বিভ্রমের অবকাশ খুবই অল্প, তাকে প্রশ্রয়ও দেওয়া হয় না। সেখানে সুরই মুখ্য, সুরই প্রধান বিবেচ্য। কথার ভূমিকা সেখানে নামমাত্র বা নেই বললেই চলে। সংগীতের জগৎ সুরের জগৎ, মেলডির ভুবন। তথায় সুরই তো প্রধান গণনীয় বিষয় হওয়া উচিত, কথা কেন সেখানে উড়ে এসে সুরের স্থান জুড়ে বসবে? এ তো আর কবিতার ক্ষেত্র নয় যে সব ছাড়িয়ে রচনার কাব্যসৌন্দর্যকেই মুখ্য মনোযোগের (তথা আদরের) বিষয় করে তুলতে হবে। সুরের জগতের বিচার সুরের 'টার্মেই' হওয়া ভাল। কবিতা কেন সুরের জায়গা জবরদখল করে থাকবে?

আঞ্চলিক কাব্যগীতি বা আরও স্পষ্ট করে বললে, বাংলা কাব্যগীতির বেলায় মুশকিল এই যে, কবিতাকেই এখানে নিতান্ত অনুচিতভাবে সুরের স্থলাভিষিক্ত করা হয়। গানের বাণীসৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে আমরা ভাবি গানের সুরসৌন্দর্যে মুগ্ধ হচ্ছি। এইরকম অন্যায্য ভাবার দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রসংগীতের বেলাতেই বেশী চোখে

পড়ে। সেখানে কাবোর মাপে আমরা সচরাচর সুরের বিচার করে থাকি। যাই হোক, এখানে বিষয়টি সম্পর্কে এর বেশী আর বিস্তারিত আলোচনা করছি না। যথাস্থানে এ সম্বন্ধে আরও বলার অবকাশ হবে।

ভারতীয় রাগসংগীতে সুরই যে মূল মনোযোগের বিষয়, কথার স্থান গৌণ, তার আরও প্রমাণ হল এর 'সুরবিস্তার' রূপ অলংকার। সুরবিস্তার অর্থাৎ সুরের বিমূর্ত লীলায়ন। রাগের স্বীকৃত স্বরগুলিকে অবলম্বন করে কথার সাহায্য ব্যতিরেকে সুরের যদৃচ্ছ প্রকাশ। একটি একটি করে পাপড়ি খুলে ফুল যেমন ক্রমে পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয় ঠিক তেমনি ভাবে রাগের রূপটি স্বরের ক্রমিক আরোহণের মাধ্যমে বিকশিত করে তোলার প্রক্রিয়াকে বলে সুরবিস্তার বা সুরপ্রসার। এইভাবে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে আরোহাবরোহক্রমে সুরের ক্রমিক ওঠানামায় গানের যে-সৌন্দর্য খোলে, কথার সাহায্যে তার সিকির-সিকি সৌন্দর্যও ফুটিয়ে তোলা সম্ভব কিনা সন্দেহ। অবশ্য 'বোলতানে' এক ধরনের কথা-আশ্রয়ী সুরবিস্তার করা হয় কিন্তু সেখানেও কথার ভূমিকা হ্রস্ব, সুরের ভূমিকাটাই আসল। রাগসংগীতের এই যে বিশেষ প্রায়োগিক অলংকার—সুরবিস্তার—ইংরেজীতে একে বলা হয় 'ফ্রীডম অব ইণ্টারপ্রিটেশন' বা 'ফ্রীডম অব ইম্প্রোভাইজেশন'। সুরসৃষ্টির এই স্বাধীনতাই হল ভারতীয় ক্লাসিকাল সংগীতের প্রাণ বা 'জান'। সুরবিস্তার ছাড়া ভারতীয় সংগীতের কোন অর্থই হয় না। ভারতীয় সংগীতে 'অ্যাবস্ট্রাকশন' বা বিমূর্ততা যে কোন্ চরমে গিয়ে পৌঁছেছে তা বুঝতে হলে আমাদের তার এই সুরবিস্তার রূপ অলংকারের দিকে নজর করতে হবে। সুরবিস্তারের মধ্যেই রাগসংগীতের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিধর্মিতা নিহিত। কাব্যসংগীতে সুরবিস্তার কমবেশী অনুপস্থিত, প্রায় নেই বললেই চলে; কাজেই ওই শ্রেণীর গানের সৃষ্টিশীলতাও তদনুপাতে অনুপস্থিত। সৃষ্টিশীলতা কথাটা এখানে সুরের অনুষঙ্গে বিচার করতে হবে।

সুরবিস্তার খেয়াল গানে সবচেয়ে বেশী পরিলক্ষণীয়। বস্তুত 'খেয়াল' নামটার মধ্যেই সুরের এই যদৃচ্ছ সুর খেলাবার ভাবটি নিহিত আছে। এই শ্রেণীর গানে গায়ক তাঁর খেয়াল-খুশি-মত, মেজাজ-মর্জি-মাফিক রাগের রূপটিকে পর্যায়ক্রমে বিকশিত করে তোলেন বলেই এই জাতের গানের নাম হয়েছে 'খেয়াল'। সুরবিস্তার রূপ সাংগীতিক কলাকৃতি খেয়ালের মত টপ্পা, টপ্‌খেয়াল, ঠুংরী, হোরী প্রভৃতি গানেও দ্রষ্টব্য। তবে খেয়াল অঙ্গের গানেই বেশী চোখে পড়ে। টপ্পার

জমজমা তান, বোলতান স্বীকৃত স্বরবিস্তারেরই রকমফের মাত্র। ঠুংরী গানে একাধিক রাগের স্বরমিশ্রণ কেবলমাত্র তখনি সত্যিকারের অর্থবহ যখন একাধিক রাগের রাগবৈশিষ্ট্যটি স্বরবিস্তারের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট। ঠুংরী গানের স্বরমিশ্রণ স্বরবিস্তারের অলঙ্করণ ছাড়া অকল্পনীয়, অসম্ভব। স্বরসৃষ্টির স্বাধীনতাতেই ঠুংরী তার ঠুংরীত্বটি, অর্থাৎ মিশ্র রাগরূপটি প্রাপ্ত হয়।

ধ্রুপদে অবশ্য গান আরম্ভ হয়ে যাওয়ার পর আর স্বরবিস্তারের অবকাশ নেই। তখন কথারই প্রাধান্য এবং তালক্রিয়ায় 'আড়ি-কোয়াড়ি-বাট-বোলতান' প্রভৃতি কূট লয়কারিরই সমূহ জয়জয়কার। কিন্তু ধ্রুপদের গৌরচন্দ্রিকা-স্বরূপ আলাপচারী বা 'আওচার' অংশে স্বরবিস্তার নামক অলংকার প্রয়োগের সুযোগের ছড়াছড়ি। গানটি যদি বাগেশ্রী রাগের উপরে হয় তাহলে একটি একটি করে শতদলের পাপড়ি উন্মোচনের মত সা ণ্‌। ধ্‌। ণ্‌। সা। মা মা জ্ঞা মা ধা ণা র্সা। পর্দাগুলি ব্যবহার করে ধীরে ধীরে রাগটির রাগরূপের আবাহন করে অবরোহে আবার একই পর্যায়ক্রমে পর্দাগুলির উপর দিয়ে কণ্ঠস্বরকে নামিয়ে এনে পঞ্চম ও রেখাব স্পর্শ করে সা-তে এসে মিলে যাওয়ার মধ্যে স্বরপ্রকরণের যে বিশেষ রূপটি প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে তারই নাম বাগেশ্রী রাগ। (কোনও কোনও ঘরানায় পঞ্চম আদৌ ব্যবহার করা হয় না।) এই রাগের বাদী মধ্যম, সম্বাদী ষড়্‌জ, উত্তরাঙ্গ রাগ, রাত্রি ১২—৩টা প্রহরে গেয়। ধ্রুপদের আলাপচারী একটা ধ্যানের মত। রাগ যদি একটা মূর্তি হয় তো তাকে বন্দনা করা হয় এই ধ্যানে। কিন্তু এটি ধ্যানই হোক আর অর্চনাই হোক, স্বরবিস্তার এর মূল উপজীব্য। সুতরাং দেখা গেল ধ্রুপদেও স্বরবিস্তার আছে, তবে গানের কথাংশে নয়, আলাপচারী অংশে। প্রকৃতপক্ষে স্বরবিস্তার ছাড়া রাগসংগীতের রূপ কল্পনাই করা যায় না। ভারতীয় ক্লাসিকাল সংগীতের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য কী, যদি এক কথায় বলা যায়, তাহলে অসংশয়ে তার স্বরবিস্তারের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করতে হয়। স্বরবিস্তারের মধ্যেই তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির লক্ষণ অনুস্যূত।

ভারতীয় সংগীতে যেহেতু স্বরবিস্তারই আসল, সেই কারণেই তার স্বাধীনতার সীমা পরিসীমা নেই। স্বাধীনতাই এই সংগীতের 'দান', তাই দেখতে পাওয়া যায় ভারতীয় সংগীতে যিনি গান বা গৎ রচনা করেন তিনি বড় নন, বড় হলেন শিল্পী যিনি সেই গানকে কণ্ঠে রূপ দেন বা সেই গৎকে যন্ত্রে ফুটিয়ে তোলেন। ভারতীয় সংগীতে রচয়িতার স্থান খুবই ন্যূন, পক্ষান্তরে শিল্পীর ভূমিকার গুরুত্ব অশেষ।

স্বাধীন সুর খেলাবার নৈপুণ্যের মাপকাঠিতেই শিল্পীর অর্থাৎ গায়কের কিংবা বাদকের এই গুরুত্ব। শিল্পী যখন কণ্ঠে অথবা যন্ত্রে রচয়িতার রচনাটিকে পরিস্ফুট করে তোলেন তখন তিনি তাঁর স্বাধীন সৃজনী বৃত্তির প্রয়োগ করেন অর্থাৎ রচনাটিকে তিনি তাঁর নিজের মত করে পুনরায় সৃষ্টি করেন, তিনি তাতে তাঁর আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে তাকে প্রায় নতুন এক চেহারায় দাঁড় করান। এটা প্রায় নতুন সৃষ্টির তুল্য এক অভিনব প্রক্রিয়া। এইজন্যই ভারতীয় সংগীতে রচয়িতার নাম কেউ মনে রাখে না, শিল্পীকেই সকলে আদর জানাতে ব্যস্ত থাকে। ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী গান তো এযাবৎ কত হাজার-গণ্ডা হয়েছে, সেগুলির ক'জনার রচয়িতার নাম আমরা স্মরণে রেখেছি? অথচ সেগুলির শিল্পীদের স্মৃতি সংগীতামোদী মহলে কি যত্নের সঙ্গেই না সংরক্ষিত দেখতে পাই। আমীর খসরু, ঠাকুর হরিদাস, তানসেন, বৈজু বাওরা, নায়ক গোপাল, নায়ক বক্‌সু, মানসিং তোমর, হদ্দু খাঁ, হস্‌সু খাঁ, ফকিরুল্লা, সদারঙ্গ, অদারঙ্গ, হোসেন শাহ শর্কি, শোরী মিঞা, কদর পিয়া প্রমুখ সংগীতবিশারদদের নাম যে আমরা মনে রেখেছি সে কি তাঁদের সংগীতরচনার কৃতিত্বের জন্য, না তাঁদের অনবদ্য শিল্প-কৃতিত্বের জন্য? বলা নিষ্প্রয়োজন যে, তাঁদের শিল্পীভূমিকার মহত্ত্বের জন্যই যুগ থেকে যুগান্তরে তাঁদের খ্যাতি বাহিত হয়ে এসেছে—তাঁদের রচয়িতা-পরিচয় কবে বিস্মরণের তলায় চাপা পড়ে গেছে, অথবা আধা-বিস্মরণে অবরুদ্ধ হয়ে আছে। রচয়িতারা, কি কণ্ঠসংগীতের বেলায় কি যন্ত্রসংগীতের বেলায়, সুরের একটা কাঠামো মাত্র দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেছেন, সেইখানেই তাঁদের ভূমিকার ইতি। পরবর্তী সবটা ভূমিকাই শিল্পীর এবং সে-ভূমিকাটাই হল আসল। অর্থাৎ রচয়িতা গানের অথবা গতের একটা নিছক কাঠামোর আদল দেখিয়ে দিয়েই খালাস, তার উপর রঙ-রস সুরবৈচিত্র্য সৃষ্টিসৌন্দর্য ইত্যাদি ফুটিয়ে তোলার সবটুকু দায়িত্ব কণ্ঠশিল্পীর অথবা/এবং যন্ত্রশিল্পীর। ভারতীয় সংগীতে সৃজনী ভূমিকার মহত্ত্বটি শিল্পীর জন্য নির্দিষ্ট, রচয়িতার জন্য নয়। তানসেনের একাধিক ধ্রুপদ রচনার সঙ্গে আমরা পরিচিত। সেগুলির রচনামাহাত্ম্য এমন কিছু আহা-মরি নয়, যার জন্য তাঁর স্মৃতিকে আজও আমরা ধরে রেখেছি। আমরা তাঁর স্মৃতিকে সম্মান করি তিনি মস্ত গাইয়ে ছিলেন বলে। যদিও তাঁর গান আমরা কেউই শুনিনি, তবু তাঁর গায়ক পরিচয়টাই কিংবদন্তীর আকারে আমাদের কল্পনাকে আজও আলোড়িত করে দৃষ্টিগ্রাহ্য মাত্রায়। গীতরচয়িতা তানসেন নন পরন্তু গীতশিল্পী তানসেন আমাদের

অনেক বেশী ধ্যানের ধন, আমাদের অনেক বেশী আদরের জন।

পূর্বোক্ত অন্যান্য শিল্পীদের সম্পর্কেও একই কথা।

ইউরোপীয় সংগীতে কিন্তু এর সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র দেখতে পাই। ইউ-রোপীয়দের সাংগীতিক সংস্কার আলাদা, সংগীতের আদর্শ আলাদা। সেখানে কম্পোজারই হলেন আসল, শিল্পী বা একজিকিউট্যাণ্ট-এর জন্য নামমাত্র ভূমিকার বেশী কিছু বরাদ্দ নয়। আজকাল ইউরোপীয় সংগীতের আদর্শ আমেরিকা, অস্ট্রে-লিয়া প্রভৃতি ভূখণ্ডেও ছড়িয়ে পড়েছে, সুতরাং এই সংগীতকে এক কথায় পাশ্চাত্ত্য সংগীত বলাই যুক্তিযুক্ত। পাশ্চাত্ত্য সংগীতে কম্পোজার বা রচয়িতাই সমস্ত মনোযোগ দখল করে রয়েছেন, গায়ক বা বাদকের ভাগে ঐ মনোযোগের ছিটে-ফোঁটাও জোটে কিনা সন্দেহ। আর জুটবেই বা কেন, ঐ সংগীতে গাইয়ে বা বাজিয়ের ভূমিকা স্বরলিপি দেখে যদ্দৃষ্টং তৎ গায়িতং বা বাদিতং জাতীয় অনু-কারকের ভূমিকা বই তো আর কিছু নয়। পাশ্চাত্ত্য সংগীতে স্রষ্টার যা কিছু গৌরব তা কম্পোজারের জন্য নির্দিষ্ট, একজিকিউট্যাণ্ট-এর ভাগে ওই মহিমার লেশমাত্রও অবশিষ্ট থাকে না। বিশেষ করে যন্ত্রসংগীতেই এই পরবশতার সংস্কার বেশী প্রকট। অর্কেস্ট্রা বা ঐকতানমূলক যন্ত্রসংগীতে আরও বেশী। সেখানে মিলিত ঐকতানে যে বাজিয়ের যে 'পীসটুকু' বাজাবার কথা তাঁকে সেই 'পীসটুকু' অন্ধ-ভাবে বাজিয়ে যেতে হয় অনেকটা মাছিমারা কেরানীর মত উৎকট দাস্যে। স্বর-বিস্তার বা স্বরসৃষ্টির এতটুকু স্বাধীনতাও তাঁর ভূমিকার জন্য বরাদ্দ নেই। তাঁর ভূমিকাটুকু সবটাই পূর্ব-নিরূপিত, বাঁধা, সুনির্দিষ্ট। তিনি যে নিজের মত করে সুর খেলাবেন তার আদৌ যো রাখেননি কম্পোজার। কম্পোজার ডাইনে বললে একজিকিউট্যাণ্টকে ডাইনে ঘুরতে হবে, বাঁয়ে বললে বাঁয়ে ঘুরতে হবে। ডাইন-বাঁয়ের মধ্যেও আবার নড়াচড়ার এতটুকু জায়গা নেই—এমনি নিয়তি-নির্দিষ্ট অপরিবর্তনীয়তার দ্বারা তাঁর চলাচল নিয়ন্ত্রিত। এমনি ইউরোপীয় ক্লাসিকাল সংগীতের গড়ন যে, কম্পোজার সেখানে স্রষ্টার সবটা মহিমা আত্মসাৎ করেই ক্ষান্ত নন, শিল্পীকে তাঁর নিতান্ত বশংবদ জীবে পরিণত না করা পর্যন্ত তাঁর তৃপ্তি নেই।

ভারতীয় সংগীতে এর ঠিক উলটো। সেখানে শিল্পী গীত বা সুর রচয়িতাকে থোড়াই কেয়ার করেন। কেয়ার করলেও ঠিক ততটাই কেয়ার করেন যতটা না হলে তাঁর গান বা বাজনাটাই মাঠে মারা যাবার উপক্রম হয়, দাঁড়াবার কোনো

অবলম্বন পায় না।

ভারতীয় সংগীতে মেলডি প্রধান, কিন্তু পাশ্চাত্ত্য সংগীতে মেলডির চাইতেও বড় 'হার্মনি' বা স্বরসংগতি। বিভিন্ন বিষম সুরের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করে সব মিলিয়ে একটা অখণ্ড ঐক্য দাঁড় করাবার সাধনাটাই পাশ্চাত্ত্য সংগীতের সাধনা। পাশ্চাত্ত্য সংগীত 'হারমোনিকস'-এর তত্ত্বের উপর দাঁড়িয়ে আছে বলেই তাতে 'পইণ্ট' 'কাউণ্টার পইণ্ট' প্রভৃতি কথার উদ্ভব। এইজাতীয় স্বর-সংগতিতে বিভিন্ন যন্ত্রগুলি যে শুধু বিভিন্ন সুরে বাজে তাই নয়, বিভিন্ন স্কেলেও বাজে। কিন্তু এমনই সেই সংগীতের চমৎকারিত্ব যে স্বরগুলি যতই বিপরীতধর্মী বা বিপ্রতীপ আমেজ সম্পন্ন হোক, তাদের সম্মিলিত 'এফেক্ট'টুকু হয় কিন্তু খুবই চিত্তহারী। একটি ঐকতান বাদনের দলের বাজিয়েরা তাঁদের নিজ নিজ আরোপিত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যতই পরস্পরের বিপরীত মুখে চলুন-না কেন, তাঁদের বাজনার মিলিত ফলটি কিন্তু কোলাহলে পর্যবসিত হয় না, বরং এক আশ্চর্য স্বর-সমন্বয়ে গিয়ে দাঁড়ায়। জগঝম্প কলকোলাহল কেমন করে অপূর্ব মধুস্বাদ সম্মিলিত সংগীতধ্বনিতে রূপান্তরিত হয় সে এক মহারহস্য।

এইজন্যই ইউরোপীয় সংগীতে কম্পোজারের এমন সর্বাত্মক গুরুত্ব। কম্পোজারই সেখানে সব, আলাদা আলাদা গাইয়ে বা বাজিয়েরা সেখানে আজ্ঞাবহ অনুচরের বেশী কিছু নন। একটা গোটা যন্ত্রের পরিকল্পনায় ও নির্মিতেতে নাট-বল্টু নির্মাতাদের যতটুকু দায়িত্ব ও অধিকার, তার বেড়া সম্মান এঁদের প্রাপ্য নয়। কম্পোজারই সবটুকু সম্মান নিজে একা আত্মসাৎ করে বসে আছেন যেখানে, সেস্থলে তাঁর আজ্ঞাপালকের দলের ভাগ্যে কৃতিত্বের ছিবড়েটুকু ছাড়া আর কীই বা মিলতে পারে?

বাংলার কাব্যসংগীতে, বিশেষ করে রবীন্দ্রসংগীতে, ভারতীয় সংগীতের মূল যে-বৈশিষ্ট্য শিল্পীর স্বাধীনতা তথা সুরবিস্তারের স্বাতন্ত্র্য, সেটি কমবেশী উপেক্ষিত। বরং তুলনায় বলা যায় ইউরোপীয় সংগীতের রচনাদর্শে কম্পোজারের যে এক-প্রাধান্য বা একনায়কত্বের সংস্কার প্রচলিত, সেইটাকেই যেন বাংলা গানের রচনার ধারায় সমধিক অনুসরণ করা হয়। বাংলা কাব্যসংগীতে কথাকেই বেশী খাতির করা হয়, সুরের দাম সেই অনুপাতে অনেক কম কষা হয়। এটা কিন্তু ভারতীয় সংগীতের বিরোধী ব্যাপার। ভারতীয় সংগীতে সুরই আসল। কথার দাম নগণ্য। বাংলা গানে, বিশেষত রবীন্দ্রসংগীতে, এই আদর্শের বিপরীত ভাব লক্ষ্য

করি। ওই যে রবীন্দ্রসংগীত-চিন্তায় 'গঙ্গা-যমুনা' তত্ত্ব অথবা 'হরি হর মিলি হইল এক' জাতীয় তত্ত্বের প্রশস্তি গাওয়া হয়, অর্থাৎ বাণী ও সুরের সুসমঞ্জস ঐক্যের আদর্শ প্রচার করা হয়, ভারতীয় সংগীতের অনুষঙ্গে তার চেয়ে বিসদৃশ আদর্শ আর কিছু হতে পারে না। ওই মত ভারতীয় সংগীতের একেবারে গোড়া ধরে কোপ দেয় এবং বাণী ও সুরের সমান সমীকরণ করে সুরের প্রতি অবিচার করে।

গানে কথার অতিপ্রাধান্য সুরের যথার্থ বিকাশের প্রতিবন্ধক এই কথাটি আমাদের ভালো করে বুঝতে হবে। এমনকি গানের বাণী কাব্যগুণে অতি মধুর হলেও তাকে নিয়ে বিগলিত বোধ করবার কোনো কারণ নেই। বরং এই ভেবে আশঙ্কিত হওয়ার যুক্তি আছে যে, গানের বাণীব অতিরিক্ত সৌন্দর্য-মাধুর্য-সুষমা, সূক্ষ্ম অনুভব ইত্যাদি শিল্পগুণ গানটির সুরের যথাযথ বিকাশের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারে। বাণীর অতিপ্রাধান্য সুরের বিঘাতক হওয়া মোটেই আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। বরং সংগীতের জগতে এইটেই সচরাচরের পরীক্ষিত অভিজ্ঞতা। কাব্যসৌন্দর্যের অতিরেক সুরসৌন্দর্যের কাঙ্ক্ষিত রূপায়ণের পথে কাঁটা হয়ে দেখা দেওয়ার ঘটনা বাংলা গানের জগতে এতই ঘন ঘন ঘটতে দেখা যায় যে, ওই পরিপ্রেক্ষিতে সুর ও বাণীর 'গঙ্গা-যমুনা সংগম' একটা কথার কথা হয়ে দাঁড়ায়। গানের কথায় কবিতার গুণের যদি একাধিপত্য থাকে তবে সুর কেমন করে সেখানে স্বপ্রতিষ্ঠ হতে পারে? সেক্ষেত্রে সুর ও বাণীর সুসমঞ্জস ঐক্যের তত্ত্ব কি একটা স্ববিরোধী বস্তু হয়ে দাঁড়ায় না?

একটা জিনিস আমাদের খেয়াল করা দরকার। আমরা যখন গানের ভূমির উপর দাঁড়িয়ে কথা বলব তখন সুরকেই সমধিক মর্যাদা দিতে হবে। এ তো কবিতার ক্ষেত্র নয় যে, কাব্য সৌন্দর্যে বুঁদ হয়ে থাকতে চাইলেই আমাদের চলবে? কবিতার বিচার আর গানের বিচার এক মাপকাঠিতে হওয়া উচিত নয়, হলে সেটা অগ্রাহ্য হওয়ারই সম্ভাবনা। এ সম্বন্ধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ প্রথম বয়সে যে মত প্রচার করেছিলেন তা খুবই প্রণিধানযোগ্য। ১৮৮১ সালে কবি মাত্র কুড়ি বছর বয়ঃক্রমকালে বেথুন সোসাইটি আয়োজিত কলকাতার মেডিকেল কলেজ হলে যে সংগীত প্রবন্ধটি পাঠ করেছিলেন (রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে সেইটেই কবির প্রথম 'পাবলিক ভাষণ') তার একাংশ এইরূপ :

"রাগরাগিণী আলাপ ভাষাহীন সংগীত। গানের কবিতা সাধারণ কবিতার সঙ্গে কেহ যেন এক তুলাদণ্ডে ওজন না করেন। সাধারণ কবিতা পড়িবার জন্য ও সংগীতের কবিতা শুনিবার জন্য। ··· গানের কবিতা পড়িয়া বিচার না করাই উচিত। খুব ভাল কবিতাও গানের পক্ষে হয়ত খারাপ হইতে পারে এবং খুব ভাল গানও হয়ত পড়িবার পক্ষে ভাল না হইতে পারে।" —সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা (হার্বার্ট স্পেন্সারের মত)।

এই উদ্ধৃতির শেষের কথাগুলি বিশেষভাবে লক্ষণীয়: "খুব ভাল কবিতাও গানের পক্ষে হয়ত খারাপ হইতে পারে এবং খুব ভাল গানও হয়ত পড়িবার পক্ষে ভাল না হইতে পারে।" এইটি লাখ কথার এক কথা এবং এর বক্তব্যের সারবত্তা নিশ্ছিদ্র বলা যায়। সত্যিই তো, খুব ভালো কবিতাও গানের পক্ষে খারাপ হওয়া সম্ভব। আমাদের সাংগীতিক অভিজ্ঞতা এই যে, প্রায়ই খারাপ হয়। গানের কাব্যসৌন্দর্যের পক্ষে গানের সুরসৌন্দর্যের বাধক হওয়াটাই নিয়ম। এ কথার প্রমাণের জন্য বেশী দূরে যাবার দরকার নেই। হাতের কাছেই ভূরি ভূরি প্রমাণ রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ প্রথম বয়সে এই মত প্রচার করে পরবর্তী জীবনে তা থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিলেন। তাঁর উত্তর জীবনের গানে আমরা কাব্যসৌন্দর্যের বিশেষ প্রাধান্য লক্ষ্য করি। প্রথম বয়সের ঈশ্বরভাবাত্মক ব্রহ্মসংগীতগুলিতে বাণীর কাব্যগুণ থাকলেও তার আতিশয্য নেই। হিন্দুস্থানী ধ্রুপদাঙ্গ সংগীতের কঠিন কাঠামোর বন্ধনে আবদ্ধ থাকায় সেগুলির কবিতাংশ কখনও নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে পারেনি। কিন্তু উত্তরকালীন গীতরচনাগুলিতে এই নিয়ন্ত্রণ না থাকায় পদ্যবন্ধের ঋজু কাঠামো অপসৃত হয়ে গেছে এবং তার জায়গায় কাব্যকৃতির আতিশয্য দেখা গেছে। কবির মধ্য ও শেষ বয়সের গানের কাব্যসৌন্দর্য অতুলনীয়; কিন্তু সুরসৌন্দর্য অতুলনীয় বলা যায় কি? বরং কাব্যের চাপে সুর নিতান্তই সাদামাঠা, অলঙ্কাররিক্ত, আবৃত্তিভঙ্গিম স্বরোচ্চারণে পর্যবসিত হয়ে গেছে—এরকম বলাই যুক্তিযুক্ত নয় কি? ভারতীয় সংগীতের যেটা সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য—সুরবিস্তারের স্বাধীনতা—সেইটাই এই গানে অনুপস্থিত। ফলে গান প্রায়শ সহজ, সরল, আভরণহীন সুরের আবৃত্তিতে রূপান্তরিত। এ গান সাধারণ সুরেলা কণ্ঠস্বর যুক্ত যে কোনো মামুলী পর্যায়ের গাইয়েই গাইতে পারে, এর জন্য বিশেষ কোনো সাংগীতিক দক্ষতা বা অভ্যাস-পরিশীলনের দরকার হয় না।

এমনকি স্বরলিপি দেখেও গাওয়া যায়, আর স্বরলিপি দেখে গাওয়ার জন্যই এ গান মূলত পরিকল্পিত।

রবীন্দ্রসংগীতের এই আভরণ বর্জিত সাদামাঠা সহজ সারল্যকে কেউ কেউ এ গানের একটা গণনীয় বৈশিষ্ট্য বলে মনে করেন, রবীন্দ্রসংগীতের উৎকর্ষের চাবিকাঠি নাকি ওই সারল্যের মধ্যেই নিহিত এরকম বলেন। এরকম বলা সুর সম্বন্ধে অচেতনতারই নামান্তর। আমি গোড়াতেও বলেছি আবারও বলি, আমরা প্রায়ই কবিতা শুনে মুগ্ধ হয়ে ভাবি সুর শুনে মুগ্ধ হচ্ছি। মধ্য ও উত্তর পর্বের রবীন্দ্রসংগীতের বেলায় এ বিভ্রম সবচেয়ে বেশী ঘটে, কেননা এই গানের কাব্যসম্পদ অতি প্রত্যক্ষ আর যেহেতু কাব্যসম্পদে এই গান অতিশয় সমৃদ্ধ সেই-হেতু তার সুরের দীনতাটা আমাদের চোখেই পড়তে চায় না। উল্টো, সুরের দৈন্য আর অতিসারল্যকে একটা মস্ত বড় গুণ বলে কীর্তন করবার ঝোঁকে পেয়ে বসে।

ভারতীয় সংগীতের মানদণ্ডে যে গানে সুরবিস্তার নেই, যে গানে নতুন করে সুরসৃষ্টির চেষ্টা নেই, সে-গান গান নয়। এই কষ্টিপাথরের নিকষে বিচার করলে সব রকমের বাংলা কাব্যসংগীতই কমবেশী দাগী বলে প্রমাণিত হবে। তবে এক্ষেত্রে রবীন্দ্রসংগীতের বিচ্যুতিই সবচেয়ে বেশী। মধ্য ও উত্তর পর্বের রবীন্দ্র-গীতিতে সুরবিস্তারের বাষ্পও নেই। সেখানে কেবল কথা, কথা আর কথা। সুর নিতান্ত সরু সুতোয় ঝুলে আছে, একটু টোকা দিলেই সুর ছিঁড়ে পড়ার উপক্রম। বরং খতিয়ে দেখতে গেলে বাংলা কাব্যসংগীতের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের ভিতরে এই ব্যাপারে দ্বিজেন্দ্র-গীতি, অতুল-গীতি, নজরুল-গীতির রবীন্দ্র-গীতির উপর জিত। পূর্বনামীয় তিন প্রকার গানে তবু বরং সুরবিস্তারের একটা আদল মেলে কিন্তু রবীন্দ্রসংগীত সুরবিস্তারের দিক দিয়ে নিপাটভাবে দরিদ্র। কথার প্রাধান্যের পীড়নে এখানে সুরের নাভিশ্বাস উঠবার উপক্রম, তা সে কথা যতই কাব্যসৌন্দর্য-মণ্ডিত আর মনোহারী হোক সেটা আপাতত আমাদের বিচার্য নয়। অতুল-প্রসাদের গানে 'লচা ঠুংরীর' আমেজ পাওয়া যায়। কাজী নজরুল ইসলাম উত্তর ভারতীয় নাত গজল গীত চৈতী কাজরী হোরী লাউনী প্রভৃতি দেহাতী শ্রেণীর হাল্কা সংগীতের অপূর্ব মাদকতাময় সুরের রস তাঁর বাংলা গানে এমনভাবে ব্যবহার করেছেন যে, সে গানের সম্মোহনে এক এক সময় মাতোয়ারা হয়ে যেতে হয়। অন্যদিকে, লুপ্ত ও অর্ধলুপ্ত রাগ-রাগিণীর পুনঃপ্রচলন চেষ্টার সূত্রে তিনি 'হারামণি' নামে যেসকল গান রচনা করেছিলেন তার মধ্যে পাওয়া

যায় হিন্দুস্থানী ক্লাসিকাল গানের খেয়াল ও টপ্‌পা অঙ্গের গানের সবিশেষ প্রভাব।। মুসলমানী ঘরানা সংগীতের রসে নজরুল-গীতি-ভরপুর বললেও চলে।

পক্ষান্তরে রবীন্দ্রসংগীতে সুরের এই মাতোয়ারা ভাবটি একান্তভাবে অনুপস্থিত। এই গানের সুর বড্ড বেশী বিশুদ্ধ, হিন্দু ঐতিহ্যাশ্রিত, রক্ষণশীল তথা সৃজনবিমুখ বিষ্ণুপুরী ধ্রুপদের ভাবাদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত। কথাটা অপ্রিয় শোনালেও বলতে আমি বাধ্য, রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাংগীতিক জীবনের উন্মেষ লগ্নে কেবলমাত্র হিন্দু ঘরানাশ্রয়ী বিষ্ণুপুরী ধ্রুপদ গানের নমুনাই শুনেছিলেন, উত্তর ভারতের মুসলমানী ঘরানার শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদ-খেয়াল-টপ্‌পা-ঠুংরী গানের ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁর তাদৃশ পরিচয় ছিল না। ফলে, সৃজনশীল সুরবিস্তারের বৈশিষ্ট্যটি তাঁর গানে বলতে গেলে প্রায় বরাবর অসংযোজিত আর অ-ধরাই রয়ে গেছে। মুসলমান ওস্তাদেরা প্রায়শ অনক্ষর হলেও তাঁদের সুরসৃষ্টির ক্ষমতা অসাধারণ। সেই তুলনায় হিন্দু ঘরানাশ্রিত ওস্তাদেরা কমবেশী রক্ষণশীল ও শাস্ত্র-ঘেঁষা। বিষ্ণুপুর ঘরানার গানে শাস্ত্রানুসারী গোঁড়ামি যে পরিমাণে আছে সৃজনশীলতা সেই পরিমাণে নেই। রক্ষণশীলতা তাঁদের গানের একটি কৌলিক চিহ্ন বললেও চলে। রবীন্দ্রনাথের সাংগীতিক জীবন এই বিষ্ণুপুরী ঘরানার ঐতিহ্যেই মুখ্যত লালিত হয়েছিল, ফলে উত্তর ভারতীয় সংগীতের সৃষ্টিশীল ধারার সঙ্গে তাঁর তেমন সংযোগ হওয়ার উপলক্ষ্য কখনও ঘটেনি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অভিজ্ঞতার এই অপূর্ণতার দিকটি সম্বন্ধে পরে অবহিত হয়েছিলেন। যখন তাঁর বয়স বার্ধক্যের প্রায় শেষ সীমায় ঢলে পড়েছে তখন মুস্তারী বাঈ, আবদুল করিম খাঁ, ফৈয়াজ খাঁ, কেশরবাঈ কারকার, হীরাবাঈ বরোদকার প্রমুখ এ যুগের কতিপয় শ্রেষ্ঠ কলাকারের গান শুনে তাঁর পূর্বের শ্রুতিগত অভিজ্ঞতার দৈন্য কিছুটা পূরণ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু হায়, তখন বড়ই বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল। যাঁর জীবনে ধ্রুপদাঙ্গ গানের স্বরবিশুদ্ধি ও পবিত্রতার অতিমাত্র অনুশীলন হয়েছে, খেয়াল-ঠুংরীর রঙরসবৈচিত্র্য সৃষ্টিশীলতা চেষ্টা করলেও তাঁর অধিগম্য হওয়ার কথা নয়। ফলে যা হবার তা-ই হয়েছে। রবীন্দ্রসংগীত কম বা বেশী পরিমাণে আজও বালপোষিত হয়ে রয়েছে, রাগসচেতন বিদগ্ধ শ্রোতাদের দরবারে এর যথোচিত সমাদর হল না। (রেডিওতে, গ্রামোফোনে, মামুলী সংগীতের আসরগুলিতে রবীন্দ্রসংগীতের ব্যাপক প্রচলন দেখে এর সঠিক চাহিদার পরিমাপ করা যাবে না, কারণ চাহিদাটা প্রায়শ কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট এবং তার পিছনে

কায়েমী স্বার্থের হাত আছে। রবীন্দ্রসংগীতকে ঘিরে একটা শক্তিশালীচক্র গড়ে উঠেছে বললেও অত্যুক্তি হয় না, যে-চক্রের কাজ হল আর-সব বর্গের বাংলা গানকে লোকচক্ষে ছোট করে দেখানো এবং সেগুলির যথোচিত আদর হতে না দেওয়া। (নজরুলের গানকে খাটো করে দেখানোর তো রীতিমত একটা চক্রান্ত বর্তমান।)

অপ্রিয় হবার ঝুঁকি স্বীকার করে নিতে হলেও বলা দরকার, রবীন্দ্রসংগীতের সুরাদর্শ যত-না ভারতীয় সংগীতের অনুগত তার চেয়ে অনেক বেশী ইউরোপীয় সংগীতের অনুসারী। রবীন্দ্রগীতাদর্শ ভারতীয় সংগীতের পরিপন্থী বললেই ঠিক বলা হয়। ভারতীয় কণ্ঠসংগীতে সুরেরই প্রাধান্য, কথার মূল্য যৎসামান্য। রবীন্দ্রসংগীতে এর ঠিক উল্টো জিনিসটি লক্ষ্য করা যায়। এখানে কথাই সর্বে-সর্বা, সুরের মূল্য কানাকড়িও নয়। (সুরকানারাই কেবল বলেন যে, রবীন্দ্র-সংগীতের সুর অনবদ্য)। যদি বলা হয় সুর আর কথা মিলিয়েই রবীন্দ্রসংগীত এক বিশিষ্ট জাতের রচনা, একটি নয়া ধরনের গীতসৃষ্টি ; সে কথা মেনে নিয়েও বলব, এই সৃষ্টির পরিকল্পনায় সুরকে ছাড়িয়ে ও ছাপিয়ে কথারই অসপত্ন আধি-পত্য। কাব্যসৌন্দর্য এই গানের আর সব কিছু ঢেকে দিয়েছে। ভারতীয় সংগীতের এটা বিপরীত ব্যাপার।

রবীন্দ্রসংগীত যে মূলত ইউরোপীয় সংগীতের ছাঁচে ঢালা তা কবির কতিপয় উক্তিতেই স্পষ্ট। ওই যে কবি বলেছেন তিনি তাঁর গানের উপর দিয়ে "স্বেচ্ছা-চারের স্টীমরোলার' চালাতে দিতে রাজী নন তাতেই তাঁর ইউরোপীয় কম্পোজার-সুলভ একাধিপত্যের মনোভাব পরিষ্কার। তিনি চান তাঁর গানের সুরের কাঠামো তিনি যেমন বেঁধে দিয়েছেন সেইরকমটি হুবহু অবিকৃত রাখতে হবে, ওখানে কোনোরকম স্বাধীনতা নেওয়া চলবে না। রবীন্দ্রসংগীতের ধরাবাঁধা সুরের পানটি থেকে চুনটি খসলেই নাকি মহাভারত অশুদ্ধ। যেন রবীন্দ্রসংগীতের শিল্পীরা হাত-পাওয়ালা জীব নয়, তাঁরা সব রাবার-স্ট্যাম্প, কিংবা কপি-বুকের পাতা, সুরের সুনির্দিষ্ট রেখাচিহ্নের উপর অন্ধ অনুকারকের মত দাগা বুলিয়ে যাওয়াই যাঁদের কাজ। ইউরোপীয় সংগীতের গাইয়ে-বাজিয়েরা যেমন নাট-বল্টুর বাড়া আর কিছু নন, এঁরাও তেমনি গীতরচয়িতার নিতান্ত বশংবদ আজ্ঞাবহ প্রাণী। এঁদের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব নেই, স্বকীয় সুরসৃষ্টির তিলমাত্র অধিকার নেই। সুপরিচিত রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী দেবব্রত বিশ্বাস (প্রয়াত) রবীন্দ্রসংগীতের

অভ্যস্ত কাঠামোয় কিছু নামমাত্র পরিবর্তন সাধন করতে গিয়েছিলেন। তাইতেই কী কাণ্ড। বাংলা গানের চষা ক্ষেতের উপর আকাশ ভেঙে পড়ার যো হল। তথাকথিত রাবীন্দ্রিক মহলে, রবীন্দ্রসংগীতের মৌরসীপাটার অধিকার যাঁরা ধরে বসে আছেন তাঁদের পাড়ায় 'গেল রাজ্য গেল মান' রব উঠল। কবি বেঁচে থাকলে এই প্রশ্নে তাঁর কী প্রতিক্রিয়া হত বলা কঠিন, তবে নিজের সৃষ্টি, সম্বন্ধে তাঁর যেরূপ অপরিসীম মমত্ব এবং কিছুটা শুচিবাই ছিল, তাতে তিনি যে স্বাধীনতা প্রয়াসী জজ বিশ্বাসের উপর খুব বেশী প্রসন্ন হতেন এমন মনে করবার বোধহয়. কারণ নেই। ইউরোপীয় সংগীতের আদলে যে-সংগীতের সৃষ্টি তার রচয়িতার পক্ষে এছাড়া আর কীই বা প্রতিক্রিয়া হতে পারে? সুতরাং এমনতর ভবিষ্যদ্বাণী করতে গণৎকার হওয়ার প্রয়োজন করে না, দুয়ে দুয়ে চারের মত করেই গুনে বলে দেওয়া যায়।

শিল্পকলার অন্যান্য সকল বিভাগে রবীন্দ্রনাথ চিত্তবৃত্তির স্বাধীনতার পক্ষে তাঁর প্রভাব বিস্তার করেছেন, এই ক্ষেত্রে কেন তিনি শিল্পীর স্বাতন্ত্র্যকে সংকুচিত করতে গেলেন? সে কি এইজন্য নয় যে, সংগীতরচনার ক্ষেত্রে তিনি জাতীয় সংস্কার বিসর্জন দিয়ে পাশ্চাত্ত্য সুরাদর্শেরই অনুগমন করেছেন? একদা বিলাত প্রবাসকালে ইউরোপীয় কম্পোজারের আদর্শ তাঁর মনোহরণ করেছিল বলেই বোধহয় তাকেই তিনি স্বীয় সংগীতরচনার ক্ষেত্রে অনুসৃতব্য আদর্শ রূপে গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর গানের শিল্পীদের জন্য নকলনবীশের ভূমিকার বাড়া ভূমিকা নির্দেশ করে যেতে তাঁর মন ওঠেনি। একনায়কসুলভ স্বৈরতন্ত্রীর মত তিনি সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে কুক্ষিগত করে তাঁর সংগীত-জমিদারীর প্রজাদের জন্য ছিটেফোঁটা ক্ষমতাভোগের অধিকারের বেশী কিছু রেখে যাননি। তাঁর সংগীত-ভুবনে তিনিই একচ্ছত্র সূর্য-সম্রাট, গায়ক-শিল্পীরা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র উপগ্রহ ব্যতীত আর কিছু নয়।

আর রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীদেরও বলিহারি যাই। তাঁরা এই পরাধীন অবস্থা কেন চিরকালের জন্য মেনে নিতে গেলেন, কেন তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন না? তাঁদের দুগ্ধপোষ্য শিশুর স্তরে আবদ্ধ রেখে সমস্ত গৌরবের ঝোল গীত-রচয়িতার নিজের কোলে টানার চেষ্টাটা যে ভারতীয় সংগীতের spirit-এর সম্পূর্ণ বিরোধী ও বিপরীত ব্যাপার—এ কথা কেন তাঁরা জোরের সঙ্গে ঘোষণা করলেন না? কেন তাঁরা তাঁদের অবনত অবস্থা বিনা প্রতিবাদে স্বীকার করে

নিলেন ? এটা কি তাঁদের আত্মসম্মানের পরিপন্থী নয় ? ভারতীয় সংগীতে শিল্পী কখনই রচয়িতার আনুগত্য করে না, বরং রচয়িতার রচনাকে নিজের রঙ-রস-বৈচিত্র্যের সংযোগে নয়া তাৎপর্য, নয়া আয়তন দেয় ; তাকে নতুন করে সৃষ্টি করে। শিল্পীর আপন মেজাজ-মর্জি অনুযায়ী নিজের অভিরুচি মত যদি গাইবার স্বাধীনতাই না থাকে তবে সে আর ভারতীয় সংগীতের শিল্পী কি ? সুর-বিস্তারের অধিকার প্রয়োগ বিহনে গান আবার গান হয় নাকি ভারতীয় সংগীতে ? স্বরলিপির দাসত্ব করে ভারতীয় সংগীতের চর্চা হবে এটা কেউ কখনও ভাবতে পেরেছিল ?

না, ঠাট্টা নয়, অত্যন্ত সীরিয়াস সুরেই বলছি, রবীন্দ্রসংগীতের শিল্পী নামধেয় তাগড়াই সব জেয়ান ইয়া-ইয়া পুরুষ্টু সব পুরুষ যখন আসরে বসে দুগ্ধপোষ্য শিশুর 'ললিপপ' চোষার মত নিতান্ত সাদামাঠা আবৃত্তির ঢঙে 'প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন' কিংবা 'রাজপুরীতে বাজায় বাঁশী বেলাশেষের গান' কিংবা 'হ্যাদে গো নন্দরানী, মোদের শ্যামকে দিয়ে যাও' কিংবা 'আজি শুভ দিনে পিতার ভবনে অমৃতসদনে চল যাই' কিংবা 'দে পড়ে দে আমায় তোরা কী কথা আজ লিখেছে সে', কিংবা 'প্রাণ চায় চক্ষু না চায়' জাতীয় গান করেন তখন হাসব কি কাঁদব বুঝতে পারিনে। সৃষ্টির লক্ষণ শূন্য এই নিছক অন্ধ আবৃত্তিকারকের ভূমিকা যে শিল্পী হিসাবে আত্মমর্যাদার কতখানি বিঘাতক সে খেয়াল যদি এঁদের থাকত তো বুক ফুলিয়ে সে-সব গান গাইবার আগে দশবার তাঁরা চিন্তা করতেন। স্কুলের বালক-বালিকার মুখে যে-গান শোভা পায় সে-গান পরিবেশন করবার জন্য তাল ঠুকে এসে আসরে বসতেন না।

অথবা রবীন্দ্রসংগীত-শিল্পীদের কাছে আমি কিছু বেশি প্রত্যাশা করছি। প্রশ্নহীন আনুগত্যের সংস্কারে যাঁরা আবাল্য লালিত তাঁদের কাছ থেকে হঠাৎ স্বাধীন চিত্তবৃত্তির স্ফুরণ আশা করা যায় কি ?

রাগসংগীত বনাম আধুনিক সংগীত

সংগীতোৎসাহীদের মধ্যে যাঁরা বিশেষভাবে আধুনিক সংগীতের পক্ষপাতী তাঁরা রাগসংগীত সম্পর্কে এই বলে তাঁদের মনের বিরাগ প্রকাশ করেন যে, রাগ সংগীতে বাণী-অংশের বিশেষ কোনো মর্যাদা নেই, সেখানে সুরের উপরই যা-কিছু প্রাধান্য আরোপিত হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে আধুনিক সংগীতের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল তার বাণী বা কথার অংশ, যাদের লালিত্য ও মাধুর্য আধুনিক গানে এমন একটা সম্মোহের সৃষ্টি করে যে ওই সম্মোহই তার সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ হয়ে দাঁড়ায়। আধুনিক সংগীতে দৃশ্যত কথা ও সুরের গঙ্গা-যমুনা-সংগম স্থাপিত হয়: কথায় ও সুরে মিলে সংগীতের এমন একটা সুসমঞ্জস রূপ উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয় যা কিনা রাগসংগীতের কাঠামোর মধ্যে সুলভ বা সুলক্ষ্য নয়।

রাগসংগীতের বিপক্ষে এই অভিযোগের মধ্যে যে কিছু যুক্তি নেই তা বলা যায় না। বস্তুত রাগসংগীত আর আধুনিক সংগীতের মধ্যেকার মামলার একটা মুখ্য বিচার্য বিষয়ই হল এই কথা ও সুরের আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্বের প্রশ্নে দ্বন্দ্ব। এই নিয়ে অতীতে অনেক বিতর্ক হয়েছে: এক সময়ে সাহিত্যের আসর এই বিশেষ বিতর্কটির নিষ্পত্তির প্রশ্নে আলোচনা-প্রত্যালোচনায় খুবই সরগরম হয়ে উঠেছিল। দিলীপকুমার রায়, ধূর্জটিপ্রসাদ, রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ সংগীতজ্ঞ-সাহিত্যিকগণ, সবশেষে এমনকি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এই বিতর্কে যোগদান করেছিলেন। সে আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। সেসব পুরনো দিনের কথার মধ্যে আজ আর প্রবেশ করে লাভ নেই, তবে দেখা যাচ্ছে যে মামলাটি আজও পর্যন্ত অমীমাংসিত হয়েই রয়েছে। আধুনিক গানের যাঁরা পক্ষপাতী তাঁরা কথার দিকে টেনে সওয়াল করেন, আর যাঁরা রাগসংগীত অর্থাৎ ক্লাসিকাল সংগীতাদর্শের সমর্থক তাঁরা সুরের প্রতি তাঁদের একান্ত আনুগত্য নিবেদন করে সেইভাবে তাঁদের যুক্তিজাল বিস্তার করেন।

স্পষ্টতই এই দুই দৃষ্টিভঙ্গী বিপরীতমুখী। একের মনোযোগ কাব্যের প্রতি, অপরের মনোযোগ সুর বা মেলডির প্রতি। যদিও ধ্বনি, কাব্য এবং সুর

উভয়েরই প্রাণ এবং সেই দিক দিয়ে দেখতে গেলে কথা এবং সুর দুইয়ের মধ্যে কোনো মূলগত বিরোধ নেই বরং তাদের ভিতর যথেষ্ট আত্মীয়তা বর্তমান , তবু কাব্য এবং সংগীতের নিজ নিজ ক্ষেত্রে ধ্বনির রূপ ও তাৎপর্য বিভিন্ন। কাব্যে ধ্বনি বাণী-অংশকে জড়িয়ে মুখরতা লাভ করে ; সংগীতে, বিশেষত রাগসংগীতে, একান্তভাবে স্বরকে আশ্রয় করে অ্যাবস্ট্রাকশান (abstraction) হয়ে দেখা দেয়। রাগসংগীতে ধ্বনির কোনো দেহী রূপ নেই, কবিতায় ধ্বনি পদাশ্রয়ী হয়ে সোচ্চারতাপ্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ আকারবান্ হয়ে ওঠে। ধ্বনির এই রূপগত ভিন্নতা থেকেই রাগসংগীত ও আধুনিক সংগীতের ভিন্নতার উদ্ভব।

রাগসংগীত ও আধুনিক সংগীতের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য স্বীকৃত। এখন এই দুই দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করা যায় কিনা এবং সেই সামঞ্জস্যের সুফল আধুনিক সংগীতের অগ্রগতিবিধানে কাজে লাগানো যায় কিনা, তা আমাদের বিবেচনা করে দেখতে হবে। আধুনিক সংগীতের সুপরিচিত রূপগুলির মধ্যে আমাদের বাংলা দেশে রবীন্দ্র-সংগীত, দ্বিজেন্দ্রলালের সংগীত, কান্তকবি রজনী-কান্ত, অতুলপ্রসাদ, কাজী নজরুল, দিলীপকুমার প্রমুখের সংগীত এবং হালের আধুনিক বর্গের গানসমূহকে মূলত বোঝায়। এদের ভিতর আধুনিক নামধেয় গানগুলির পদের কথা ছেড়ে দিলে, আর বাদ বাকী সব কটি শ্রেণীর গানেই প্রভূত কাব্যের ঐশ্বর্য বর্তমান। বিশেষ, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও কান্তকবি রজনী-কান্তের গানের বাণী-অংশের তুলনা নেই। কিন্তু সংগীতে কাব্যাংশের উৎকর্ষের একটা প্রধান অসুবিধা এই যে, তা অনেক সময় সুরের পূর্ণ বিকাশের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। কথা সেখানে আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ একটি ধ্বনিসত্তা, সুরের সহযোগ ছাড়াই তার একটা আলাদা আবেদন আছে এবং সে আবেদন বহু-বহু শ্রোতার নিকট সবিশেষ হয়ে দেখা দেয়। রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র গান, দ্বিজেন্দ্রলালের দেশাত্মবোধক কোরাস সংগীত, কিংবা কান্তকবির 'বাণী' ও 'কল্যাণী'র ভক্তিরসের সংগীত—এঁদের সব গানেরই সুর-নিরপেক্ষ একটি কাব্যমূর্তি আছে। গানগুলি নিছক কবিতা হিসাবে পড়লেও তা থেকে অনবদ্য আনন্দ লাভ করা যায়। বস্তুত অনেক শ্রোতাই যে রবীন্দ্রসংগীতে মুগ্ধ, সে-মুগ্ধতার কতটা সুরের আবেদনজনিত, আর কতটা কথার আবেদনজনিত তা একটা বিচার্য প্রশ্ন। সুরকানা শ্রোতারা প্রায়শ কথাকেই সুর বলে ভুল করেন, কথার আবেদনে সাড়া দিয়ে ভাবেন সংগীতরস উপলব্ধি করছেন। গানের বাণী-রিক্ত

অ্যাবস্ট্রাক্ট বা বিদেহী সুররূপ উপলব্ধি করতে না পারলে বলা যায় না যে সংগীত-রস যথার্থ উপলব্ধি করা হল। সুর আপনাতেই আপনি স্ব-নির্ভর, কথার আবেদন বাদ দিয়েও তার একটা অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ আছে।

এইখানেই রাগসংগীতের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। রাগসংগীতে কথার অংশ গৌণ, এমনকি নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় বললেও চলে। বড়-বড় পুরাতন রাগ-সংগীতকার কবিদের রচিত গানে কথার অংশ এতই মামুলী যে তাঁদের আবেদন স্বচ্ছন্দে উপেক্ষা করা যায়। তানসেন সদারঙ্গ অদারঙ্গ প্রমুখ শ্রেষ্ঠ রাগসংগীতকুশলীদের রচিত গানের বাণী-অংশ ধর্তব্যের মধ্যে নয়। কিন্তু সেসব গানই যখন সুরে-তানে-লয়ে উপযুক্ত শিল্পীর কণ্ঠস্বরে রূপায়িত হয় তখন সেসব গানের জাদু শ্রোতার চিত্তকে সম্মোহিত করে রাখে। তার অর্থ এ-সব গানে সুরটাই হল মুখ্য, কথা অপ্রধান। তানসেন, বৈজু বাওরা, সদারঙ্গ প্রমুখের গানে তবু তো কথার একটা অংশ আছে, এমন অনেক প্রসিদ্ধ মধ্যযুগীয় খেয়াল গান আছে যাদের কথা-অংশ আস্থায়ীতেই মাত্র সীমাবদ্ধ এবং সেসব আস্থায়ীও অতি নিকৃষ্ট স্তরের রচনা। কিন্তু তাতে ওইসকল গানের সুররূপের যথাযথ উন্মোচনে বিশেষ ব্যাঘাত হয় না। কথার প্রতি একান্তভাবে মনোযোগপরায়ণ হলে নিশ্চয়ই রসপীড়া উপস্থিত হয় কিন্তু ততক্ষণে সুরের ইন্দ্রজাল এমন ভাবেই মনকে অধিকার করে বসে যে এই সম্মোহনকে অতিক্রম করে আর কথার দৈন্যের দিকে তাকাবার অবকাশ থাকে না। ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, কথাকে বাদ দিয়েই রাগসংগীতের ঐতিহ্য বিচারের একটা রেওয়াজ সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ, সুরই রাগসংগীতের একমাত্র ধ্যেয় বস্তু—তা যন্ত্রসংগীতেই হোক আর কণ্ঠসংগীতেই হোক। সুরের রূপ যত অ্যাবস্ট্রাক্ট অর্থাৎ বাণীরিক্ত বা বিমূর্ত হবে, তত রাগ-সংগীতের মহিমার প্রকাশ। রাগসংগীতের বেলায় কণ্ঠসংগীতও একপ্রকার যন্ত্রসংগীত, তফাতের মধ্যে শুধু এই যে, কণ্ঠসংগীতের রূপায়ণে ধ্রুপদ বা খেয়াল গান হলে কিছু মামুলি কথার আশ্রয় লওয়া হয় আর তেলেনা হলে 'দ্রিম দেরে নানা তুম তানা' প্রভৃতি কতকগুলি অর্থহীন শব্দসমষ্টিকে সুরের অবলম্বন রূপে খাড়া করা হয়। কি কণ্ঠসংগীতে কি যন্ত্রসংগীতে রাগসংগীতের মোটামুটি আদর্শ একই—সুরের ধ্যান। এক-একটি রাগ-রাগিণীকে ফুলের পাপড়ির মত পর্যায়ক্রমে উন্মোচিত করাই রাগসংগীত শিল্পীর মূল কাজ। বস্তুত হিন্দুস্থানী কণ্ঠসংগীতে সুরের এই একাধিপত্যের জন্য কেউ কেউ তাকে যন্ত্রসংগীতেরই একটি ভিন্নতর

রূপ বলে মনে করেন। এই বিচারে কণ্ঠও সেতার বা সরোদ বা বাঁশীর মত একটি যন্ত্র। সংগীতজ্ঞ অমিয় সান্ন্যাল মহাশয় কণ্ঠসংগীতকে বলেছেন 'কণ্ঠবাদন'। এটি একটি বেশ সুপ্রযুক্ত শব্দ। বাস্তবিকই তো হিন্দুস্থানী রাগাশ্রয়ী কণ্ঠ-সংগীতে বিমূর্ত সুরের এমনই একচ্ছত্র অধিকার যে গান তো সেখানে কণ্ঠে 'গীত' হয় না, 'বাদিত' হয় মাত্র। কথাটা আপাতদৃষ্টিতে যতই কেন না স্ববিরোধ-যুক্ত মনে হোক, তার ভিতর একটা গূঢ় সত্য নিহিত আছে। রাগসংগীতের হিসাবনিকাশ করবার বেলায় আমাদের এই সত্যের ছবিটি মনের সামনে সর্বদা জাগরূক রাখতে হবে।

রাগসংগীতের এ সুরময়তা, বক্তিগতভাবে, আমার বিশেষ পছন্দ। কথা-প্রধান গান অপেক্ষা আমার এই সুরপ্রধান গানই বেশী ভালো লাগে এবং আধুনিক গানে সুরের প্রভাব আরও কেন বিস্তৃত হয় না, এই নিয়ে আমার মনে আক্ষেপ আছে। রবীন্দ্রসংগীতের কথার সৌন্দর্যে আমি সবিশেষ মুগ্ধ, কিন্তু আমার এই মুগ্ধতা কাব্যের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে, অনবদ্য কাব্যময় বাণীর অনুষঙ্গে মনের ভিতর যে অপূর্ব রসানুভূতির উদ্রেক হয়, সেই রসোদ্বেলতার ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে। কিন্তু সুরের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে নয়। বরং সত্যি কথা বলতে হলে এই আমি বলব যে, রবীন্দ্রসংগীতে কথার চাপে অনেক সময় সুর ব্যাহত। কোনো কোনো গান, এমনকি, কথার ভারে কম-বেশী সুররিক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। রবীন্দ্রসংগীতে কথা ও সুরের গঙ্গা-যমুনা-সংগম হয়েছে এ কথা আমি স্বীকার করি এবং কথা ও সুরের একটি সুষ্ঠু সমন্বিত রূপের মধ্যেই যে রবীন্দ্র-সংগীতের সার্থকতা প্রকাশ পেয়েছে তাও অস্বীকার করবার কারণ দেখা যায় না। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও কবুল করা দরকার যে, রবীন্দ্রসংগীতে গঙ্গা-যমুনার মিলন গঙ্গার আধিপত্য মেনে নিয়েই, অর্থাৎ কথার সৌন্দর্যই সেখানে প্রবলতর। যমুনার ধারা ক্ষীণস্রোতে বহমানা বললেও চলে। রবীন্দ্রসংগীতে কথা ও সুরের মধ্যে সামঞ্জস্য নিশ্চয়ই ঘটেছে এবং শিল্পকুশলতার বিচারে সেই সামঞ্জস্যের নিহিত নৈপুণ্যও অপূর্ব বলা চলে, কিন্তু কথার ভূমিকা প্রধান রেখে তবেই এই সামঞ্জস্য ; কথা ও সুরের মধ্যে মর্যাদার আধাআধি বখরা কোথাও ঘটেনি।

আমার এই সমালোচনা শুধু যে রবীন্দ্রসংগীতের বেলাতেই প্রযোজ্য তা-ই নয়, সকলপ্রকার আধুনিক সংগীতের বেলাতেই প্রযোজ্য। প্রকৃত প্রস্তাবে,

বাংলা গান মাত্রেই কথার প্রতি একটু অতিরিক্ত পক্ষপাত দৃষ্ট হয়। এই পক্ষপাতিত্বের জন্য লজ্জা পাবার কোনো হেতু নেই, কেননা এ ত্রুটি বাংলা গানের স্বভাবের মধ্যেই নিহিত এবং কাব্য ও কথার প্রতি বাঙালীর সহজাত মমত্বের নিদর্শন। বাংলা গানের কথা-গৌরবকে ক্ষুণ্ণ করবার কোনো প্রয়োজন নেই বরং হিন্দুস্থানী রাগসংগীতের তুলনায় এই দিক দিয়ে যে আমাদের গানের সমৃদ্ধি অনেক বেশী সে-সম্বন্ধে সচেতন থাকা কিছু অন্যায় নয়। আত্মবিস্মৃতির প্রতিষেধক হিসাবে আত্মশ্লাঘা সময়বিশেষে কার্যকর। কিন্তু তাই বলে বাংলা গানের আপেক্ষিক সুরদৈন্য সম্পর্কে আমাদের উদাসীন থাকলে চলবে না। এ কথা আমাদের সবিনয়ে স্বীকার করে নেওয়া উচিত যে, বাংলা গানে বাণীর আতিশয্যে সুর খর্বীকৃত, কখন কখনও সুর রিক্ততার কাছাকাছি গিয়ে পৌছয়। হিন্দুস্থানী খেয়াল কিংবা ঠুংরী গানে সুর খেলাবার বিচিত্র ভঙ্গী স্বীকৃত, যাকে ইংরেজীতে সুরের improvisation বলা যেতে পাবে : বাংলায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায় সুরবিকাশ, বাংলা গানের কণ্ঠরূপায়ণে ওই বৈশিষ্ট্যটির বড়-একটা সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। বাংলা গানে সুরবিস্তারের অবকাশ খুব কম—কেবল সুরের ঢংয়ে কথার আবৃত্তি মাত্র এই গানগুলিতে অনুসৃত।

খেয়াল গানে রাগকে বিচিত্র উপায়ে খেলানো হয়, রাগের বৈশিষ্টাগুলি (পকড়) পর্যায়ভাগে বিন্যস্ত করে আরোহাবরোহক্রমে দেখানো হয়। বস্তুত রাগের এই ক্রমিক উন্মোচন-প্রক্রিয়ার মধ্যে গায়কের যে শিল্পস্ফূর্তি অবলীলায়িত ভাবে অভিব্যক্ত হয় তা তাঁর খেয়ালী মনের দ্যোতক বলে তা থেকেই খেয়াল গানের 'খেয়াল' নামকরণ হয়েছে। ঠুংরী গানে দুই বা ততোধিক রাগের মিশ্রণ সিদ্ধ ; কিন্তু সেখানেও ওই একই রাগবিস্তার প্রক্রিয়া অনুসৃত। টপ্পা গানেও রাগবিস্তার প্রসিদ্ধ, কেবল টপ্পায় দানাদার তানের আধিক্য এবং কাফি, সিন্ধু, সুরঠ, দেশ, ভৈরবী প্রভৃতি রাগগুলিকেই প্রধানত অবলম্বন করা হয় টপ্পা গানে। মোট কথা, হিন্দুস্থানী রাগসংগীতের প্রতিটি শাখাতেই সুরবিস্তারের আদর্শ বিশেষ ভাবে গৃহীত। এটি হিন্দুস্থানী রাগসংগীতের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য বা সম্পদ্ বলা যায়।

বাংলা গান বাণী সম্পদে যতই সমৃদ্ধ হোক না কেন, এই দিক দিয়ে তার গঠনে সুস্পষ্ট ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়। বাংলা গান কথাপ্রধান, আবৃত্তিভঙ্গিম, তাতে সুরের ঐশ্বর্য বিকাশের সম্ভাবনা কম। কথা থামিয়ে সুর খেলাবার

রেওয়াজ বাংলা গানে নেই বললেই চলে। ধরুন যে-কোনো রবীন্দ্রসংগীত। সেখানে ধ্রুপদের 'কলি'র মত পর্ববিভাগ অনুসরণ করে আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ পর পর যথারীতি গাওয়া হয়, কিন্তু অন্তরায় বা আভোগে অথবা আস্থায়ী মুখে পদ থামিয়ে স্বরবিস্তারের কোনো রেওয়াজ অনুসৃত হয় না। সুর নিয়ে কোনোরূপ স্বাধীন শিল্পকৃতি সেখানে স্বীকৃত নয়। ফলত রবীন্দ্রসংগীতে এ-জাতীয় শিল্পীর স্বাধীনতা গ্রাহ্য নয় বরং তা স্বাতন্ত্র্যের স্বেচ্ছাচার রূপে ধিকৃত। আর শুধু রবীন্দ্রসংগীত বলেই বা কথা কী, সব রকমের প্রচলিত বাংলা গানেই এই রীতি—কোথাও সুরের বিস্তার বা সম্প্রসারণ স্বীকৃত নয়। পদগুলিকে সুরে ফেলে সুরের ভঙ্গিমায় গাইতে পারাটাই যথেষ্ট—যেন সুরাশ্রিত কথার আবৃত্তি-ভঙ্গিম উচ্চারণের মধ্যেই গানের শ্রেষ্ঠ জাদু নিহিত। রাগসংগীতের স্বরবিস্তারের সংস্কারে যাঁদের কান তৈরী হয়েছে, রুচি লালিত, বাংলা গানের এই সাদামাঠা সুরের ভঙ্গি তাঁদের পুরাপুরি তৃপ্তি দিতে পারে না কোনোমতেই। তাঁদের কানে সর্ববিধ বাংলা গান—একমাত্র রাগপ্রধান বর্গীয় গান ছাড়া—কেমন যেন সাদা-মাঠা আর সুররিক্ত ঠেকে।

আমি প্রবন্ধের একাংশে আধুনিক বাংলা গানের অগ্রগতির জন্য রাগ-সংগীতের ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক সংগীতের পদ্ধতি-প্রকরণের সামঞ্জস্য বিধানের কথা বলেছি। রাগসংগীতের স্বরবিস্তারের আদর্শটিকে অবশ্যই বাংলা গানের গায়নরীতির সঙ্গে সংগ্রথিত করতে হবে, নয়তো বাংলা গানের আকাঙ্ক্ষিত সুরৈশ্বর্য কখনও সাধিত হবে না—তা শুধু সুরের ভঙ্গিমাযুক্ত কথাপ্রধান গান হয়েই থাকবে। বাংলা গানগুলির শিরোনামায় রচয়িতারা রাগ-রাগিণীর নাম দিয়ে দেন। যেমন, সুর ভীমপলশ্রী, জৌনপুরী বা বাগেশ্রী, ইত্যাদি। এসব নামকরণের কী মূল্য, যদি গানের ভিতর ওই বিশেষ বিশেষ রাগ বা রাগিণীর স্বররূপটিকে ফুটিয়ে তোলা না হয় উপযুক্ত স্বরবিস্তারের সাহায্যে? বাংলা গানের কণ্ঠরূপায়ণে সচরাচর যা করা হয় তা হল চিহ্নিত রাগ বা রাগিণীর ঢংয়ে গানটি আগাগোড়া কথার মাধ্যমে গেয়ে যাওয়া—কোনো সময়েই কথাংশ ছেড়ে দিয়ে সুরকে রাগিণীর স্বরূপ প্রকাশক স্বরবিন্যাসের সাহায্যে লীলায়িত করা হয় না। এ বাংলা গানের এক মূলগত ত্রুটি—এ ত্রুটির সংশোধন কাম্য।

রাগপ্রধান বাংলা গানে অবশ্য এ ত্রুটি সংশোধনের একটা চেষ্টা দেখা যায়; কিন্তু রাগপ্রধান গানের বাণী বা পদাংশ কাব্যসৌন্দর্যের দিক থেকে

আরও উন্নত হওয়ার অবকাশ রাখে। রাগপ্রধান গীতরচয়িতাদের মধ্যে নামী গীতরচয়িতার সংখ্যা খুব কমই বলা চলে। রবীন্দ্রনাথ কিংবা দ্বিজেন্দ্রলাল কিংবা কান্তকবির মত উৎকৃষ্ট গীতরচয়িতার রচিত বাণী যদি রাগপ্রধান বাংলা গানের বাণী-অংশে সংগ্রথিত করা যেত তবে কথার সৌন্দর্যে আর সুরের সৌন্দর্যে মিলে কী সোনায় সোহাগাই না হত! রাগপ্রধান বাংলা গানে সুরের দিক সমৃদ্ধ, বাণীর দিক দুর্বল; পক্ষান্তরে সুপরিচিত গীতিকারদের রচিত বাংলা গানে বাণী-অংশ সমৃদ্ধ, সুরাংশ অপেক্ষাকৃত নীরেস। সুরেব একটা ঠাট বা ভঙ্গী মাত্র এইসকল গানে অনুসৃত; সুরবিস্তারের অভাবে, ভারতীয় সংগীতেব যা প্রাণস্বরূপ, সেই মেলডির বিশেষ কোনো আস্বাদ সে-সব গানে পাওয়া যায় না। গানের কণ্ঠরূপায়ণের সময় রাগ-রাগিণীব স্বরূপ-বৈশিষ্ট্যেরই যদি পরিচয় পাওয়া না গেল, সুরবিস্তারপ্রসাদাৎ যদি রাগ বা রাগিণীর মূল কাঠ'মো বা ধারণা মনের ভিতর উপজিত না হল, তবে কী হবে কতকগুলি সুরাশ্রিত কথাব আবৃত্তিভঙ্গিম উচ্চাবণের দ্বারা? এ-জাতীয় গানে সুরকানা তথা বাগ-রাগিণী-অচেতন সাধারণ শ্রোতার মন ভুলতে পাবে কিন্তু রাগ-রাগিণীর রসে যাঁদের মন মজেছে, ভারতীয় সংগীতের শ্রেষ্ঠ মেলডিব সংস্কারের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় ঘটেছে, তাঁদের কেমন করে তৃপ্ত কবতে পারা যাবে এসব ছেলে-ভুলানো গানের দ্বারা? কথার সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে চাও তো তার জন্যে ভালো কবিতা রয়েছে, কথার রস আহরণের জন্য সংগীতের দরবারে ভিড় করা কেন? সংগীতের ক্ষেত্রে সুরই মুখ্য অন্বিষ্ট হওয়া উচিত, কথা নয়। কথা এবং সুর দুইয়েরই মূলে যদিও ধ্বনি, কিন্তু সুরের ধ্বনিমাধুর্য অনেক বেশী। স্বরক্ষেপপ্রণালীর নানা রকমারি বৈচিত্র্যের দ্বারা সুরের এমন একটা অপরূপ বিমূর্ত মহিমা প্রকটিত হয় যার নাগাল ধরা কথামাত্রসার স্বরসমষ্টিব আটপৌরে ধ্বনির সাধ্য নয়। সত্যি কথা বলতে কি, কথা প্রায়শ সুরের যথাযথ বিকাশের একটি প্রতিবন্ধক। কথার সৌন্দর্য কথার দিকেই চিত্তকে আকর্ষণ করে, বিশেষত যাঁরা অল্পবিস্তর সুর-অচেতন এবং কাব্যমুখী তাঁরা তো গান শোনার বেলায় কথার অভিমুখে এক পা বাড়িয়েই রাখেন—তাঁরা গান শুনতে বসে সুর শোনেন কি কথা শোনেন ঠাহর করা মুশকিল। ফলে, সুর উপেক্ষিত হয়, গানের মূল আয়োজনটিই যায় মাঠে মারা।

আমরা সংগীতে কথার সৌন্দর্য অবশ্যই চাই কিন্তু তা সুরের বিনিময়ে নয়। সেই গানই আমাদের বিচারে শ্রেষ্ঠ গান, যে-গানের বাণী-অংশ সুন্দর, ওদিকে সুরাংশও চমৎকার। সুরবিস্তার যে গানে নেই বা রাগরাগিণীর স্বর-বৈশিষ্ট্যের স্বাদ যে গানে পাওয়া যায় না, সে গান যথার্থ শ্রোতার দরবারে পরিবেশনযোগ্য নয়। রাগসংগীতের শ্রেষ্ঠ সংস্কার আধুনিক গানে সংযোজিত হলে তবেই শুধু আধুনিক সংগীতের সত্যিকারের উৎকর্ষ বিহিত হওয়া সম্ভব।

সবশেষে একটি কথা। কথা ও সুরের গঙ্গা-যমুনা সংগমের উপমাটি একটি কথার কথা। প্রায়ই এই উপমার স্তোকের সাহায্যে কথার অনুকূলে পক্ষপাত আকর্ষণের চেষ্টা করা হয়। যে-গানকে কথা ও সুরের অপরূপ সামঞ্জস্যের ফল বলে বর্ণনা করা হয় কার্যত দেখা যায় তাতে কথারই প্রাধান্য, সুর কথার পশ্চাদ্‌বর্তী হয়ে চলেছে মাত্র। এরকম বিভ্রমসৃষ্টিকারী কথা ও সুরের সামঞ্জস্যে আমাদের প্রয়োজন নেই। আমরা চাই এমন সামঞ্জস্য, যেখানে কথা তার নিজের মূল্যে আদৃত, সুর তার নিজস্ব গৌরবে সম্মানিত। কথার প্রতিবন্ধকতায় সুরের মানহানি যেন না ঘটে।

ঠাকুরবাড়ীর সংগীতচর্চা

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল থেকেই সংগীতের আবহাওয়ায় বড় হয়ে উঠেছিলেন। কাব্য সাহিত্য ও নাট্য চর্চার পাশে পাশে সংগীতের চর্চাতেও তিনি সেই সময় যথেষ্ট সময় ব্যয় করেছেন। তবে যাকে বলে সংগীতের প্রণালীবদ্ধ ধারাবাহিক শিক্ষা সে-জাতীয় শিক্ষার দিকে তাঁর মন কখনও আকৃষ্ট হয়নি বা সে-জাতীয় শিক্ষালাভের জন্য তিনি কখনও হাতে-কলমে প্রযত্ন করেননি। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর আকাশে বাতাসে সংগীতের স্বর ভেসে বেড়াতো, বিশেষ করে হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সংগীতের স্বর পরিব্যাপ্ত ছিল— বালক রবীন্দ্রনাথ সেই স্বরের রস বুক ভরে গ্রহণ করতেন, আস্বাদন করতেন তার অনুপম সৌন্দর্য ও মাধুর্য। তৎকালের বড় বড় ওস্তাদের দল ঠাকুরবাড়ীতে আসা-যাওয়া করতেন, ঠাকুরবাড়ীর চত্বরে ওস্তাদী গানের আসর বসতো, দাদাদের মধ্যে কেউ কেউ ওস্তাদদের কাছে নাড়া বেঁধে গান বা বাজনা শিখতেন। ওই সব বিচিত্র সাংগীতিক অভিজ্ঞতার সম্মিলিত প্রভাব কিশোর রবীন্দ্রনাথের মনে স্বরের সম্মোহন বিছিয়ে দিত, তাঁকে নব নব স্বর রচনায় উদ্বুদ্ধ করতো। কখনও হুবহু হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ বা ধামারের চালে তিনি বাংলা গান বাঁধতেন, কখনও তার থেকে কিছুটা সরে গিয়ে ধ্রুপদাঙ্গ রীতির মধ্যেই স্বকীয় ভঙ্গী আরোপ করে নতুন গান রচনায় যত্নবান হতেন। এই ক্ষেত্রে নতুনদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন একাধারে তাঁর শিক্ষক, সহাধ্যায়ী ও সতীর্থ। রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছ থেকে সংগীত-জীবনে কত যে প্রেরণা ও সহযোগিতা লাভ করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। আর শুধু কি ভারতীয় সংগীতের বেলায়, ইউরোপীয় সংগীতের বেলায়ও এই দুই ভায়ের 'জুটি' নিত্যনব চমকের সৃষ্টি করেছে, ঠাকুরবাড়ীর পরিমণ্ডলের ভিতর সংগীতের ঢল বইয়ে দিয়েছে। এইভাবে বাল্যকাল থেকে ক্রমাগত সাংগীতিক পরিবেশের ভিতর কবির জীবন বেড়ে ওঠার ফলে সংগীত তাঁর প্রাণে ও মনে নিঃশ্বাসবায়ুর তুল্য একটি সহজ সংস্কারে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। গান শুধু বালক-কবির কানে বেজেই ক্ষান্ত থাকেনি, হৃদয়েও অনুক্ষণ অনুরণনের ঝঙ্কার তুলতো।

কিন্তু গোড়াতেই বলেছি, 'নাড়া' বা 'গাণ্ডা' বেঁধে সংগীত অভ্যাস করা

রবীন্দ্রনাথের কোষ্ঠীতে লেখেনি। যেমন বিদ্যার্জনের বেলায় তেমনি সংগীত-শিক্ষার বেলাতেও তিনি মুখ্যত প্রতিভার শক্তির দ্বারা চালিত হয়েছিলেন। প্রতিভার ধর্মই এই যে, অপরের যে জিনিস আয়ত্ত করতে বহু আয়াস-অনুশীলনের প্রয়োজন হয় প্রতিভা তা অল্পায়াসে বা একপ্রকার বিনায়াসেই আয়ত্ত করে নেবার ক্ষমতা রাখে। এই ক্ষমতাকে যাঁর যেমন অভিরুচি নাম দিতে পারেন। কেউ বলবেন 'ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা', কেউ বলবেন 'জন্মার্জিত ক্ষমতা', আবার কেউ বলবেন 'দৈবানুগ্রহপুষ্ট ক্ষমতা'। কিন্তু যিনি যে-নামই দিন, প্রতিভার এই মৌলিক লক্ষণ সম্বন্ধে বোধহয় দ্বিমতের অবকাশ নেই যে, যে কোন জিনিস চট করে ধরতে পারা, বুঝতে পারা ও তাকে আয়ত্ত করতে পারা প্রতিভার এক সহজাত বৈশিষ্ট্য। কবি রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের ছাঁচে এই বৈশিষ্ট্য বিলক্ষণ মাত্রায় ছিল এবং ভূরি-পরিমাণে ছিল। তিনি তারই সহায়ে সংগীতকে তাঁর জীবনে হস্তামলক করে তুলেছিলেন। সংগীত তাঁকে আয়াস-প্রয়াস দ্বারা শিখতে হয়নি, এক অবলীলায়িত সংস্কারের মত সংগীত তাঁর সত্তায় ওতপ্রোতভাবে অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালের বিচিত্র ধারায় উচ্ছ্রিত অজস্র পরিমাণ রবীন্দ্রসংগীতসৃষ্টির উৎস সন্ধান করতে হলে আমাদের এই প্রতিভার দুয়ারে গিয়েই ঠেকে যেতে হবে।

এ বিষয়ে, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ তাঁর সংগীত-সৃষ্টির অনুপ্রেরণার বিষয়ে, স্বয়ং কী বলেছেন তাঁর বিভিন্ন পর্বের উক্তি থেকে তার একটা আন্দাজ নেওয়া যাক।

'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের একাংশ: "আমাদের পরিবারে শিশুকাল হইতে গানচর্চার মধ্যেই আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি। আমার পক্ষে তাহার একটা সুবিধা এই হইয়াছিল—অতি সহজেই গান আমার সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহার অসুবিধাও ছিল। চেষ্টা করিয়া গান আয়ত্ত করিবার উপযুক্ত অভ্যাস না হওয়াতে শিক্ষা পাকা হয় নাই। সংগীতবিদ্যা বলিতে যাহা বোঝায় তাহার মধ্যে কোন অধিকার লাভ করিতে পারি নাই।"

এই উদ্ধৃতিরই অব্যবহিত পূর্বাংশ: "এক সময়ে পিয়ানো বাজাইয়া জ্যোতিদাদা নূতন নূতন সুর তৈরী করায় মাতিয়াছিলেন। প্রত্যহই তাঁহার অঙ্গুলিনৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সুর বর্ষণ হইতে থাকিত। আমি এবং অক্ষয়বাবু (অক্ষয় চৌধুরী) তাঁহার সেই সদ্যোজাত সুরগুলিকে কথা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার

চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলাম। গান বাঁধিবার শিক্ষানবিসি এইরূপে আমার আরম্ভ হইয়াছিল।"

'ছেলেবেলা' বইয়ের একাংশ: "আমার দোষ হচ্ছে—শেখবার পথে কিছুতেই আমাকে বেশিদিন চালাতে পারেনি। ইচ্ছেমতো কুড়িয়ে বাড়িয়ে যা পেয়েছি, ঝুলি ভর্তি করেছি তাই দিয়েই। মন দিয়ে শেখা যদি আমার ধাতে থাকতো তা হলে এখনকার দিনের ওস্তাদরা আমাকে তাচ্ছিল্য করতে পারত না। কেননা সুযোগ ছিল বিস্তর। যে কয়দিন আমাদের শিক্ষা দেবার কর্তা ছিলেন সেজদাদা (হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর) ততদিন বিষ্ণুর (বিষ্ণু চক্রবর্তী) কাছে আনমনা ভাবে ব্রহ্মসংগীত আউড়েছি। কখনো কখনো যখন মন আপনা হতে লেগেছে তখন গান আদায় করেছি দরজার পাশে দাঁড়িয়ে। সেজদাদা বেহাগে আওড়াচ্ছেন 'অতি গজ গামিনীরে', আমি লুকিয়ে মনের মধ্যে তার ছাপ তুলে নিচ্ছি। সন্ধ্যেবেলায় মাকে সেই গান শুনিয়ে অবাক করা খুব সহজ কাজ ছিল।"

১৯৩৮ সালের ২১শে মার্চ তারিখে জোড়াসাঁকোর বিচিত্রাভবনে দিলীপ-কুমার রায় ও তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে গানের বিষয়ে কথোপকথনকালে কবির সংলাপের টুকরো টুকরো কয়েকটি অংশ: "ওস্তাদের কাছে নাড়া বেঁধে সংগীত শিক্ষার দহরম-মহরম করা, সে আমাকে দিয়ে কোনকালেই হল না। ভালোই হয়েছে যে, ওস্তাদের কাছে হাতে খড়ি দিতে হয়নি। আমাদের বাড়ীতে উচ্চাঙ্গ সংগীতের খুব চর্চা হত সে কথা তোমরা সবাই জানো। অথচ আশ্চর্য, এ বাড়ীর ছেলে হয়েও আমি কোনদিনও ওস্তাদিয়ানার জালে বাঁধা পড়িনি। আড়ালে-আবডালে থেকে যেটুকু শিখেছি সেটুকুই আমার শেখা। বারান্দা পার হতে গিয়ে কিংবা জানালার ওপাশে বসে থাকার কালে যে সব সুর ভেসে আসত কানে সেগুলোই মনের ভিতর গুঞ্জরণ করে ফিরত প্রতিনিয়ত। তার থেকেই পেয়েছি আমি গানের প্রেরণা। বর্ষার দিনে ভিতরে ভূপালী সুরের আলাপ চলছে, আমি বাইরে থেকে শুনছি। আর কী আশ্চর্য দেখো, পরবর্তী জীবনে আমি যত বর্ষার গান রচনা করেছি, তার প্রায় সবকটিতে অদ্ভুতভাবে এসে গেছে ভূপালী সুর। কাজেই বুঝেছ সংগীতশিক্ষাটা আমার সংস্কারগত, ধরাবাঁধা রুটিনমাফিক নয়।" ('সংগীতচিন্তা' গ্রন্থের "আলাপ আলোচনা" অংশ, পৃষ্ঠা ১২৪)

কিংবা, "ছোটবেলায়···আমার গলা খুব ভাল ছিল। সেকালের সেরা ওস্তাদ যদুভট্ট—অত বড়ো গাইয়ে বাংলায় আজ পর্যন্ত হয়েছে কিনা সন্দেহ—আমাদের বাড়ির সভাগায়ক ছিলেন। তিনি কত চেষ্টা করেছেন আমাকে গান শেখাবার জন্যে, কিন্তু মেরে কেটেও আমাকে বাগ মানাতে পারেননি। সে ধাতের ছেলেই আমি নই। কোন রকম শেখার ব্যাপারে আমার টিকিও খুঁজে পাবার যো ছিল না।" (ঐ, পৃঃ ১২৪)

এরূপ নানান উদ্ধতির সাহায্যে দেখানো যায় রবীন্দ্রনাথের সংগীতশিক্ষা ধরা-বাঁধা পাঠক্রমের প্রণালীবদ্ধ রুটিন অনুসরণ করে চলেনি, তার রস ও সংস্কার তাঁর কবিপ্রকৃতির ভিতর থেকে স্বতোৎসারিত ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যেমন একটা নিবিড় গভীর সহজ সম্পর্ক থাকে তেমনি সংগীতের সঙ্গেও তাঁর তদ্রূপ একটা সহজ-স্বাভাবিক আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। কবির মগ্ন চৈতন্যে প্রকৃতি ও সংগীত অঙ্গাঙ্গী বিজড়িত ছিল। বস্তুতপক্ষে কবিজীবনে সংগীত প্রকৃতিরই একটা অংশ হয়ে তাঁর চোখে প্রতিভাত হয়েছিল। 'ছিন্নপত্রাবলী'র একাধিক চিঠিতে তিনি তাঁর মনের এই ভাবটি প্রকাশ করেছেন তাঁর অননুকরণীয় ভাষায়। একটি চিঠিতে পাই: "প্রকৃতির সঙ্গে গানের যত নিকট সম্পর্ক এমন আর কিছু না—আমি নিশ্চয় জানি এখনি যদি আমি জানালার বাইরে দৃষ্টি রেখে রামকেলি ভাঁজতে আরম্ভ করি তা হলে এই রৌদ্ররঞ্জিত সুদূর বিস্তৃত শ্যামলনীল প্রকৃতি মন্ত্রমুগ্ধ হরিণীর মত আমার মর্মের কাছে এসে আমাকে অবলেহন করতে থাকবে। যতবার পদ্মার উপর বর্ষা হয় ততবারই মনে করি মেঘমল্লারে একটা নতুন বর্ষার গান রচনা করি।" (শিলাইদহ, ২৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫)

অন্য আরেকটি চিঠির অংশ: "সংগীতের মতো এমন আশ্চর্য ইন্দ্রজালবিদ্যা জগতে আর কিছুই নেই—এ এক নূতন সৃষ্টিকর্তা। আমি তো ভেবে পাইনে—সংগীত একটা নতুন মায়াজগৎ সৃষ্টি করে, না এই পুরাতন জগতের অন্তরতম অপরূপ নিত্যরাজ্য উদ্‌ঘাটিত করে দেয়।" (শিলাইদহ, ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৯০)

গানের সঙ্গে প্রকৃতির এই অচ্ছেদ্য সম্বন্ধের বোধ কবিচিত্তে নিয়ত ক্রিয়াশীল থেকে তাঁকে সংগীতশিক্ষার ক্ষেত্রে যত না বিধিবদ্ধ 'তালিম' নেওয়ার পথে অগ্রসর করেছে তার চেয়ে অনেক গুণ বেশী অগ্রসর করে দিয়েছে সহজিয়া সাধনার অভ্যাসের দিকে। এই অভ্যাসের ভাল মন্দ দুই দিকই আছে। সে কথা

একটু পরেই আমরা আলোচনা করে দেখার অবকাশ পাব। আপাতত এই বলাই যথেষ্ট যে, রবীন্দ্রনাথের সংগীতচর্চা তাঁর মগ্নচৈতন্যের সুরে বাঁধা ছিল। সুরের প্রতিটি আলোড়নে বিলোড়নে কম্পনে কিশোর-কবির অন্তঃপ্রকৃতি অবলীলায় কথা কয়ে উঠেছে। স্বরসাধনা তথা কণ্ঠসম্মার্জনার বাঁধাধরা সড়ক ধরে যদি কবির সংগীতশিক্ষা অগ্রসর হতো তো বড়জোর আমরা একজন নিপুণ কণ্ঠসংগীতশিল্পীকে পেতাম, কিন্তু নিত্য নব নব সৃজনোন্মেষযুক্ত এক অনবদ্য সুরস্রষ্টা ও সুরশিল্পী আমাদের অ-ধরাই থেকে যেত। সংগীত-জগতে রবীন্দ্রনাথের মূল পরিচয় সুরকার হিসাবে, কম্পোজার হিসাবে। তার অন্যবিধ সাংগীতিক পরিচয় গৌণ বিবেচনার বিষয় স্বরূপে পরিগণিত হওয়া উচিত।

ঠাকুরবাড়ীতে বড় বড় ওস্তাদদের আনাগোনা ছিল, সে কথা পূর্বেই বলেছি। এঁদের মধ্যে যদুভট্ট, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণু চক্রবর্তীর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। উল্লিখিত নামগুলির ভিতর প্রথম পাঁচজন বিষ্ণুপুর ঘরানার সঙ্গে যুক্ত ; বিষ্ণু চক্রবর্তী ছিলেন নদীয়ার অধিবাসী, ঠাকুরবাড়ীর সংগীতশিক্ষক ও আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রাথমিক অনুষ্ঠানগুলির নিয়মিত গায়ক। এঁদের সকলেই প্রথিতযশা সংগীতকোবিদ ছিলেন, তবে এঁদের মধ্যেও সেরা ছিলেন যদুভট্ট। কবি যদুভট্টকে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান দিয়ে গেছেন। বলেছেন, এত বড় মাপের গাইয়ে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার মধ্যে আর পাননি। যদুভট্ট ঠাকুরবাড়ীর সভাগায়ক ছিলেন, একাধারে তিনি ছিলেন যন্ত্রী ও কণ্ঠশিল্পী, তদুপরি সংগীত-রচয়িতা ; ভারতীয় সংগীতের মূলগত আদর্শ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল অতি মহান। রবীন্দ্রনাথ যদুভট্টের সান্নিধ্যপ্রভাবে সুরের ওই ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এবং পরবর্তী জীবনে তাকেই কাজে লাগিয়েছিলেন বিচিত্র সংগীত সৃষ্টির ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্য ঘটিয়ে। যদুভট্ট অবশ্য ঠাকুরবাড়ীর সভাগায়ক রূপে বেশিদিন থাকেননি, ত্রিপুরা রাজদরবারের আমন্ত্রণে আগরতলা চলে গিয়েছিলেন। তবে বিষ্ণুপুরের অন্যান্য ঘরানাদারদের সঙ্গে ঠাকুরবাড়ীর সংযোগ পূর্বের মতই অব্যাহত ছিল। অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিন পুত্র রামপ্রসন্ন, গোপেশ্বর ও সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরবাড়ীর ঘনিষ্ঠ সংস্রবে এসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ গোপেশ্বরের সংগীতপ্রতিভা সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন, একাধিক জায়গায় তাঁর সম্বন্ধে লিখে গেছেন, পরবর্তী জীবনে তাঁকে শান্তিনিকেতনে ডেকে নিয়ে যান উচ্চাঙ্গসংগীতবিদ্যার অধ্যক্ষ

রূপে। এই পদে গোপেশ্বর অনেকদিন অধিষ্ঠিত ছিলেন। কবি সঙ্গীতাচার্য রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর কাছ থেকেও বহুসংখ্যক ধ্রুপদ, কণ্ঠে না হলেও শ্রুতিতে আয়ত্ত করবার সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন কিশোর বয়সের সহজাত সাংগীতিক অনুরাগের সূত্রে। এদিকে পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাড়ীর সভাগায়ক ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী (তাঁর শিক্ষাও বিষ্ণুপুরে) ও তাঁর দুই প্রতিভাবান শিষ্য রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগীতচর্চার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষ যোগ ছিল। তিনি তাঁদের গানের খবরাখবর রাখতেন।

গানের জগতে শ্রুতির অভ্যাস একটা মস্তবড গণনীয় বিষয়। সবাই গায়ক হন না বা যন্ত্রী হন না, তবে তন্ময়চিত্ত শ্রবণানন্দের মাধ্যমে রাগের রূপ অন্তরস্থ করবার পথে কোন বাধা নেই। বহু রসজ্ঞ শ্রোতা আছেন যাঁরা হয়তো কণ্ঠে বা যন্ত্রে রাগরূপকে হুবহু ফুটিয়ে তোলার বিদ্যায় নিপুণ নন কিন্তু রাগের মূর্তিটি মনের পটে অবিকল মুদ্রিত করবার ক্ষেত্রে অসামান্য পারঙ্গমতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। তাঁদের শ্রুতিগত অভিজ্ঞতা এতই ব্যাপ্ত ও গাঢ় যে, তাঁরা রাগের রূপরেখাটি কণ্ঠে বা যন্ত্রে সম্যক্ ফুটিয়ে তুলতে না পারলেও রাগটিকে ঠিক ঠিক স্মৃতিতে গেঁথে নিতে তাঁদের আটকায় না। শ্রুতি এইক্ষেত্রে স্মৃতির মস্ত সহায়ক হয়ে দেখা দেয়।

রবীন্দ্রনাথও এমনিধারা এক মস্তবড় শ্রুতিধর গুণী ছিলেন। শ্রুতির অভ্যাসের সহায়ে বহু গান তিনি স্মৃতিতে ধারণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বিষ্ণুপুরের একাধিক প্রসিদ্ধ ধ্রুপদিয়ার সংস্পর্শে এসে তিনি ওই ঘরানার কত যে গান আত্মস্থ করে নিতে পেরেছিলেন তার লেখাজোখা নেই। বিষ্ণুপুরী ধ্রুপদের বিশেষ চাল-ঢঙ-প্রকাশরীতি কিশোর বয়স থেকেই কবির সহজাভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। তবে সত্যের খাতিরে একথা বলতেই হবে যে, রবীন্দ্রনাথ বিষ্ণুপুরী ধ্রুপদের শ্রুতি ও স্মৃতিতে যত অভিজ্ঞ ছিলেন, উত্তর ও পশ্চিম ভারতীয় মুসলমানী ধ্রুপদের ঐতিহ্যে ততটা কর্ষিত হবার সুযোগ পাননি। উত্তর ও পশ্চিম ভারতীয় সেরা ওস্তাদদের গান শোনবার উপলক্ষ্য তাঁর জীবনের শেষ পর্বে ভিন্ন অন্য কোন পর্বে তেমন ঘটেনি। উত্তরজীবনে তিনি মুস্তারিবাঈ, কেশরবাঈ কারকার, হীরাবাঈ বরোদেকার প্রমুখ বিশ্রুতকীর্তি ওস্তাদ গাইয়েদের (এঁরা মুখ্যত ছিলেন খেয়ালের শিল্পী) গান শুনেছিলেন কিন্তু এই সব অতি

বিলম্বিত শ্রুতিগত অভিজ্ঞতার প্রসাদ যতই সমৃদ্ধ হোক তার দ্বারা তাঁর প্রথম বয়সের শ্রুতিগত অভিজ্ঞতার অপূর্ণতার শোধন হয়নি। বিষ্ণুপুরী ধ্রুপদে সুরের বিশুদ্ধির আদর্শ যত দৃঢ়রূপে মুদ্রিত, সুরের সৃষ্টিশীলতার রস তত সার্থক ভাবে লভ্য নয়। তার জন্য উত্তর ও পশ্চিম ভারতের গুণীদের দ্বারস্থ হওয়াই পন্থা। কিন্তু ওইদিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা কিছু খাটো ছিল—উত্তর, মধ্য ও পশ্চিম ভারতের সংগীতগুণীদের গান শোনার অবসর তিনি কমই পেয়েছেন জীবনে। ফলে তাঁর শ্রুতিগত অভিজ্ঞতা একাঙ্গী হয়ে গড়ে উঠেছিল, শ্রেষ্ঠ জাতীয় সৃজনশীল সংগীতের অভিজ্ঞতার ন্যূনতার কারণে তিনি প্রায়শঃ সারা জীবনভোর ওস্তাদি গানের তথাকথিত "পালোয়ানী" ঝোঁক নিয়ে অন্যায্যভাবে আক্রমণ চালিয়েছেন। সারা ভারতে বিস্তৃত ও অনুশীলিত ওস্তাদি গানের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য সম্বন্ধে যদি তাঁর সম্যক্ পরিচয় থাকত তো তিনি ওস্তাদদের তথাকথিত রসজ্ঞানের অভাবের বিরুদ্ধে একতরফা জেহাদ পরিচালনা করতে পারতেন না। উত্তর ভারতীয় ওস্তাদরা নিরক্ষর হতে পারেন কিন্তু মোটেই রসজ্ঞানবর্জিত ছিলেন না। বরং সৃজনশীলতার শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্যে ওঁদের অধিকাংশই সমৃদ্ধ ছিলেন। এটা খুবই পরিতাপের যে, রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র বিষ্ণুপুরের অভিজ্ঞতা দিয়ে সারা ভারতের সঙ্গীতের মান বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। বিষ্ণুপুর গোটা ভারতে ছড়ানো অনেকগুলি কেন্দ্রের একটি কেন্দ্র মাত্র, তার মানদণ্ডে সমগ্র ভারতের পরিমাপ হয় না।

যাই হোক, এটা সংগীতের শ্রুতিগত অভিজ্ঞতার আপেক্ষিক সমৃদ্ধি অসমৃদ্ধির প্রশ্ন, এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অসামান্য সৃষ্টিশীল সাংগীতিক প্রতিভার মহিমার কোন সম্পর্ক নেই। উপরের অনুচ্ছেদটি সমালোচনার ছলে লেখা হলেও পাছে কেউ ভুল বোঝেন সেই জন্য পাঠককে আশ্বস্ত করে লিখছি যে, এটা নিছকই তথ্যগত একটা বিবৃতি, এর দ্বারা কবির সুরস্রষ্টার মাহাত্ম্য কিছুমাত্র খর্ব হয় না। রবীন্দ্রনাথ উত্তর ও পশ্চিম ভারতের সবসেরা ওস্তাদদের গান না শুনে তাঁদের গায়নরীতির প্রতি কটাক্ষ করে তাঁদের প্রতি কিঞ্চিৎ অবিচার করেছেন এইটুকুই শুধু এখানে বলা।

২

রবীন্দ্রসংগীতের তিনটি সুস্পষ্ট পর্ববিভাগ। প্রথম পর্ব ১৮৮০ সালের কাছা-

কাছি সময় থেকে ১৯০০ সালের আগুপাছু কিছু সময় পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ দুই ধরনের গান রচনা করেছেন। এক, বিষ্ণুপুরী ধ্রুপদের আদর্শে অগণিতসংখ্যক ব্রহ্মসংগীত ; দুই, বিদেশী সুরভঙ্গির আদলে বহুসংখ্যক অপেরাধর্মী গান, যার নমুনা ছড়িয়ে আছে 'বাল্মীকিপ্রতিভা', 'কালমৃগয়া', 'রুদ্রচণ্ড', 'মায়ার খেলা' প্রভৃতি গীতি-আলেখ্যগুলিতে। বিদেশী সুরের রচনায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। এছাড়া যৌবনারম্ভে কবির বিলাতপ্রবাসকালে চয়িত একাধিক আইরিশ মেলডির সুরও এব্যাপারে ওইজাতীয় সুররচনায় মুখ্য সহায়ক হয়ে দেখা দিয়েছিল। তবে ব্রহ্মসংগীতের কথাটাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিষ্ণুপুরী ঘরানায় গীত হিন্দুস্থানী ধ্রুপদের পদ ও সুর অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ এই পর্বে কত যে ভগবদ্ভক্তি-মূলক গান রচনা করেছিলেন তার হয়ত্তা নেই। এই গানগুলিই কালক্রমে 'ব্রহ্মসংগীত' রূপে পরিচিত ও প্রচারিত হয়। এই পর্বের কয়েকটি গানের দৃষ্টান্ত : তাহারে আরতি করে চন্দ্রতপন, আজি প্রণমি তোমারে চলিব নাথ সংসার কাজে, কার মিলন চাও বিরহী, আনন্দধারা বহিছে ভুবনে, হৃদয় নন্দন বনে নিভৃত এ নিকেতনে, জগতে আনন্দযজ্ঞে তোমার নিমন্ত্রণ, ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পর্বের কালসীমা বিশ শতকের গোড়াগুড়ি থেকে ১৯২০-২১ সালের পরিধিতে বিস্তৃত। এই পর্বের গানে হিন্দী ধ্রুপদ খেয়াল ও টপ্পার ছাঁচে প্রচুর গান লেখা হলেও মূল ঝোঁকটা যেন 'হিন্দীভাঙা' গান থেকে সরে গিয়ে বাংলার প্রবহমান লোকসংগীতের সুরভঙ্গির দিকে বেশী বেশী যেতে লাগলো। লোক-সংগীতের সুরের মধ্যেও আবার বাউল আর ভাটিয়ালির দিকে ঝোঁক দেখা দিল বেশী, বাউলই প্রধান। এ কথার সবচেয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ ১৯০৫ সাল ও তৎসন্নিহিত আগে-পরের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে কবি যত স্বদেশী গান রচনা করেছেন তার অধিকাংশেরই ভিতর বাউল আর ভাটিয়ালির লীলা লক্ষ গোচর হয়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, কুষ্টিয়ার শিলাইদহ কুঠিতে থাকতে তিনি একাধিক আউল-বাউল ফকির দরবেশের সঙ্গলাভ করেছিলেন। তবে লালন শাহের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল বলে যে কথাটা শোনা যায় সেটা নেহাৎ জনশ্রুতি মাত্র, তার পিছনে সত্যের ভিত্তি নেই।

বাউলদের গানের সুরভঙ্গির ছাঁচ স্পষ্টতই স্বদেশভাবাত্মক গানগুলির ওপর ছাপ ফেলেছিল। যেমন, বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এতই শক্তিমান, ওদের বাঁধন

যত শক্ত হবে মোদের বাঁধন টুটবে, ও আমার দেশের মাটি তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা, বাংলার মাটি বাংলার জল বাংলার বায়ু বাংলার ফল, সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, ইত্যাদি। অন্যপক্ষে ভাটিয়ালির আদল বহন করছে এইসব স্বদেশী ও প্রকৃতিবিষয়ক গান— আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি, গ্রামছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ আমার মন ভোলায় রে, বসন্তে ওই ফোটা ফুলের মেলা, ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের জমিদারী এস্টেটের কাজ দেখাশুনা করার কালে অনেক দিন পদ্মানদী-বক্ষে বোটে বাস করেছিলেন। ওই সুযোগে পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের ভাটিয়ালি সুরের মধুর রূপটি অন্তরে মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল। তারই ছাপ পড়েছে এই পর্বের ভাটিয়ালিভঙ্গিম সুররচনাগুলির ওপর। তবে তুলনামূলকভাবে ভাটিয়ালি অপেক্ষা বাউলের প্রভাবই রবীন্দ্র-সংগীতে বেশী।

রবীন্দ্র-জীবনের তৃতীয় সাংগীতিক পর্বের শুরু এই শতকের বিশের দশক থেকে এবং ওই পর্ব মৃত্যুকাল (১৯৪১) পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ কি শাস্ত্রীয় বন্ধন কি লৌকিক বন্ধন—সমস্ত বন্ধনের আনুগত্য থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন তাঁর গানরচনার ভিতর। সুরে মুক্তি, তালে মুক্তি, ছন্দে মুক্তি—প্রকৃতপক্ষে সংগীতের অনুষঙ্গে সর্বসংস্কারমুক্তির এক হৃদয়াবেগ জীবনের সায়াহ্নভাগে তাঁর জীবনকে বেষ্টন করে এক অপূর্ব স্বাধীনতার আনন্দে স্ফূর্তিময় হয়ে উঠেছিল। সংগীতের ক্ষেত্রেই যেন বাধ্যবাধকতার বশ্যতা থেকে মুক্তির কামনা বেশী প্রকট হয়ে উঠেছিল দেখতে পাই। কেননা দেখা যায় এই শেষ পর্বের একাধিক গানে তিনি না তাঁর চিরাচরিত ধ্রুপদের সংস্কার মান্য করেছিলেন, না তাঁর মধ্যবয়সের অভ্যস্ত সুরভঙ্গি বাউল-ভাটিয়ালির ধরাবাঁধা ছকের ওপর দাগা বুলিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে তাতে মূর্ত হয়ে উঠেছিল এক বাঁধনছেঁড়া কামনার দুর্বার আবেগ। দেশী বিদেশী নানা সূত্র থেকে তিনি এই পর্বে গানের সুর আহরণ করেছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি কোন পূর্ব-সংস্কারকেই মানেননি। সর্বসংস্কারমুক্তির এই মহোৎসবের কিছু ফসল হল— ওগো তুমি পঞ্চদশী (মৌলিক একটি সুরের ছাঁচ), নীলাঞ্জন ছায়া (দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীত), বেদনা কী ভাষায় রে (মাদ্রাজী সুর), বঁধু কোন্ মায়া লাগলো চোখে (অসমীয়া সুর), কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি (কবিতায় কীর্তনাঙ্গ সুরের আরোপ), তোমার হল শুরু আমার হল সারা (বিদেশী

সুরভঙ্গী), প্রাণ চায় চক্ষু না চায় (বিদেশী সুর), ইত্যাদি।

৩

রবীন্দ্রনাথ কীর্তন সংগীতের গভীর অনুরাগী ছিলেন, এটিকে তিনি বাংলার নিজস্ব জাতীয় প্রতিভার জারক রসে জারিত স্বকীয় সংগীত বলে মনে করতেন। কীর্তন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন—"বাংলাদেশে কীর্তন সংগীতের উৎপত্তির আদিতে আছে একটি অত্যন্ত সত্যমূলক গভীর এবং দূরব্যাপী হৃদয়াবেগ। এই সত্যকার উদ্দাম বেদনা হিন্দুস্থানী গানের পিঞ্জরের মধ্যে বন্ধন স্বীকার করতে পারলে না, সে বন্ধন হোক না সোনার, বাদশাহী হাটে তার দাম যতই উঁচু হোক। অথচ হিন্দুস্থানী সংগীতের রাগরাগিণীর উপাদান সে বর্জন করেনি। সে সমস্ত নিয়েই সে আপন নূতন সংগীতলোক সৃষ্টি করেছে। সৃষ্টি করতে হলে চিত্তের বেগ এমনই প্রবল হওয়া চাই।" (ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রের একটি অংশ, 'সুর ও সংগতি')। অন্যত্র তিনি বলেছেন, "উচ্চ অঙ্গের কীর্তন গানের আঙ্গিক খুব জটিল ও বিচিত্র, তার তাল ব্যাপক ও দুরূহতার পরিসর হিন্দুস্থানী গানের চেয়ে বড়ো। তার মধ্যে যে বহুশাখায়িত নাট্যরস আছে তা হিন্দুস্থানী গানে নেই।" (ঐ, সুর ও সংগতি)। ওই একই ভাবের অনুরূপ কথা তিনি দিলীপকুমার রায়কে লেখা একটি পত্রাংশেও ব্যক্ত করেছেন—"কীর্তন সংগীত আমি অনেক কাল থেকেই ভালোবাসি। ওর মধ্যে ভাবপ্রকাশের যে নিবিড় ও গভীর নাট্যশক্তি আছে সে আর কোনো সংগীতে এমন সহজভাবে আছে বলে আমি জানিনে।⋯ কীর্তনসংগীতে বাঙালীর এই অনন্যতন্ত্র প্রতিভায় আমি গৌরব অনুভব করি।" (সংগীতচিন্তা, পৃ° ২৩৮)

রবীন্দ্রনাথের সুরারোপিত কীর্তনাঙ্গ কয়েকটি গান হল—ওহে জীবনবল্লভ, ঐ আসনতলের মাটির 'পরে আজি এ নিরালা কুঞ্জে, না চাহিতে যারে পাওয়া যায়, বিনা সাজে সাজি, ইত্যাদি।

সাধারণের মধ্যে একটা ধারণা আছে যে, কীর্তনাঙ্গ সুর সর্বদাই ধর্মীয় অনুষঙ্গে রচিত হয়ে থাকে, তাতে ভক্তিভাবের প্রবলতা থাকে। রবীন্দ্রনাথ এই সংস্কার সব ক্ষেত্রে মান্য করেননি, তাঁর কোন কোন কীর্তনাঙ্গ গানে প্রেমমূলক ভাবেরও ব্যঞ্জনা লক্ষ্য করা যায়। যেমন এই কয়টি গানে—তবু মনে রেখো, আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে, কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি, ইত্যাদি।

৪

রবীন্দ্রনাথ সংগীতজীবনের সূচনাকাল থেকেই সংগীত সম্বন্ধে প্রবন্ধ নিবন্ধ লেখার অভ্যাস করেছিলেন। তাঁর সংগীতসম্বন্ধীয় প্রথম প্রবন্ধের নাম "সংগীত ও ভাব"। এটি ১৮৮১ সালের ১৯ এপ্রিল তারিখে বেথুন সোসাইটিতে লিখিত বক্তৃতার আকারে পরিবেশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের জীবনীকার প্রয়াত প্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে এইটিই কবির প্রথম "পাবলিক ভাষণ"। এই সভাটি মেডিকেল কলেজ-হলে অনুষ্ঠিত হয় এবং তাতে সভাপতিত্ব করেন রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে সেটি 'ভারতী' পত্রিকায় (জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধের সঙ্গে 'ভারতী' সম্পাদকের প্রদত্ত 'নোট' থেকে জানা যায়, নিবন্ধটি পাঠ করবার কালে রবীন্দ্রনাথ একাধিক গানের উদাহরণ দিয়ে তাঁর বক্তব্য পরিস্ফুট ও দৃঢ়তর করে তোলেন। বিভিন্ন ভাবের প্রকাশক বিভিন্ন গান কণ্ঠযোগে ব্যঞ্জিত করে তিনি এইটাই প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন যে, আনন্দে বা বিষাদে বা অন্য কোনরূপ ভাবের উত্তেজনায় মানুষের কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন হয় ও তাতে সুরের সঞ্চার হয়। রবীন্দ্রনাথ যখন এই নিবন্ধ রচনা করেন তখন তাঁর বয়স কুড়ি বছর পূর্ণ হয়নি। রচনায় ব্যক্ত মতটি পুরাপুরি মৌলিক বলা যায় না। প্রসিদ্ধ সমাজতাত্ত্বিক পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সারের মতের প্রতিফলন· এই প্রবন্ধের ভাবের ভিতর লক্ষ্য করা যায়। এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার ঠিক একমাস পরে 'ভারতী'তে (আষাঢ় ১২৮৮) "সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা" নামে আর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ততদিনে কিশোর কবি হার্বার্ট স্পেন্সারের The Origin and Function of Music রচনাটি পড়ে ফেলেছেন এবং স্পেন্সারের মতের সঙ্গে নিজ মতের কমবেশী সাদৃশ্য দেখে উল্লসিত বোধ করে একই ভাবের বিস্তার সাধন পূর্বক দ্বিতীয় আরেকটি প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করেছেন। এই দুটি নিবন্ধে স্পেন্সারের মতের অনুবর্তন করে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ছিল: "রাগরাগিণীর আলাপ ভাষাহীন সংগীত। গানের কবিতা সাধারণ কবিতার সঙ্গে কেহ যেন এক তুলাদণ্ডে ওজন না করেন। সাধারণ কবিতা পড়িবার জন্য ও সংগীতের কবিতা শুনিবার জন্য।··গানের কবিতা পড়িয়া বিচার না করাই উচিত। খুব ভাল কবিতাও গানের পক্ষে হয়ত খারাপ হইতে পারে এবং খুব ভাল গানও হয়ত পড়িবার পক্ষে ভাল না হইতে পারে।"

এই উদ্ধৃতিটি এখানে দেবার উদ্দেশ্য, সংগীতের মূল্যমান নিরূপণে সবিশেষ গ্রাহ্য

হলেও এই মত রবীন্দ্রনাথ আঁকড়ে থাকেননি, পরে সেটি বর্জন করেছিলেন। তাঁর গান-রচনায় তিনি সুরের একাধিপত্য স্বীকার করেননি। যাই হোক, কবি পরবর্তী জীবনে সংগীত-বিষয়ক বহু প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা করেছেন, চিঠিপত্র আর আলাপ-আলোচনাতেও তাঁর এই সম্পর্কিত ভাবনাচিন্তা প্রকাশের পরিমাণ কম নয়। চিঠিপত্রের আধারে এই সংক্রান্ত চিন্তা সবচেয়ে বেশী প্রকাশিত হয়েছে দিলীপকুমার রায় ও ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রগুলির মধ্যে। দিলীপকুমারের 'সাংগীতিকী' ও 'তীর্থঙ্কর' গ্রন্থে এবং ধূর্জটিপ্রসাদের 'সুর ও সংগতি' গ্রন্থে এই পত্রগুলি মুদ্রিত হয়েছে।

নজরুল-গীতির পরিচয়

বাঙালি জনমানসে কাজী নজরুল ইসলামের যে ভাবচ্ছবি প্রতিষ্ঠিত, তা হলো একজন বিদ্রোহী কবির। ওই বিদ্রোহী কবি-সত্তার সূত্র ধরেই তিনি আবার নিপীড়িত-শোষিত জনের বন্ধু, বাংলা কবিতায় প্রথম সাম্যবাদী চিন্তা-চেতনার পথপ্রদর্শক, আন্তর্জাতিক সৌভ্রাত্রের একজন সার্থক বাণীবাহক, দেশপ্রেমের এক প্রজ্বলন্ত অগ্নিশিখা, সর্বোপরি হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের এক অকৃত্রিম উদ্‌গাতা। কিন্তু নজরুলের ব্যক্তিত্ব-বৈশিষ্ট্য এতেই নিঃশেষিত নয়, তাঁর আরও একটি পরিচয় আছে এবং সে-পরিচয় তাঁর অন্যবিধ পরিচয়ের গৌরবের সঙ্গে সমান না হলেও তুলনীয় গৌরব দাবি করতে পারে নিশ্চয়।

পরিচয়টি বাংলা সংগীতজগৎকে ঘিরে আবর্তিত। নজরুল এক অনন্য সংগীতস্রষ্টা। গীতিকার ও সুরকার—এই উভয় ভূমিকাতেই তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। কম করেও এক জীবনে তিনি প্রায় সাড়ে তিন হাজার গান রচনা করেছিলেন। এটি বাংলা গানের ক্ষেত্রে সংখ্যার হিসাবে সর্বোচ্চ রেকর্ড। কারও কারও দাবি, এটা বিশ্ব সংগীতের ইতিহাসেও অন্য সব পরিসংখ্যান অতিক্রমকারী এক শীর্ষস্পর্শী সংখ্যা।

বাংলা গানের সীমানায় এলে দেখতে পাই, রবীন্দ্রনাথ সব মিলিয়ে সোয়া দু'হাজারের মতো গান লিখেছিলেন। সেইস্থলে নজরুলের জানিত গানের সংখ্যাই তিন হাজারের বেশি হবে। ভক্ত-অনুরাগীদের ফরমায়েস অনুযায়ী আরও অনেক গান তিনি লিখেছিলেন বলে জানা যায় কিন্তু এখন আর সেগুলির কোনো হদিস মেলে না। কোথায় হারিয়ে গেছে, তার ঠিক-ঠিকানা পাওয়াই মুশকিল। নজরুল সংগীতরচনায় বহুপ্রজঃ হলেও নিজের সৃষ্টির বিষয়ে ছিলেন চূড়ান্ত রকমের উদাসীন। আপন সন্তানের প্রতি এমন নির্মম অবহেলার মনোভাব পশুমাতার মধ্যেও বুঝি দেখা যায় না। হাজারো প্রকার লোকের আবদার-অনুরোধ-উপরোধ অনুযায়ী গান লিখেছেন, তাতে সুর দিয়েছেন, সুরারোপের পর সেগুলি কাউকে-কাউকে শেখানোর কষ্টও স্বীকার করেছেন। কিন্তু তার পরেই সেসব গানের কথা বেমালুম ভুলে গেছেন। সৃজনী প্রতিভায় তিনি ছিলেন অক্লান্ত, কিন্তু সংরক্ষণী প্রতিভার ছিটেফোঁটাও তাঁর মধ্যে ছিল না। রূপকথার

সোনার গাছ, রুপোর গাছের মতো তাঁকে নাড়া দিলেই সোনার ফল, রুপোর ফল গাছ থেকে টুপটুপ করে ঝরে পড়ত—কিন্তু সেগুলি কুড়িয়ে-বাড়িয়ে ডালা ভর্তি করে রাখার দায় আর যাঁরই থাকুক, নজরুলের সে-সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা ছিল না। এমত অবস্থায় তাঁর বহুসংখ্যক গান যে বিস্মৃতির অন্ধকারে অবলুপ্ত হয়ে যাবে, তাতে আর আশ্চর্য কী!

নজরুল 'একজীবনে' এত সব গান লিখেছেন বলেছি। আসলে কিন্তু তাঁর গান রচনার কাল মাত্র বাইশ বছরের সময়সীমার দ্বারা বদ্ধ ও খণ্ডিত। ১৯২০ সাল নাগাদ তিনি করাচি থেকে কলকাতায় ফেরেন। যুদ্ধের বছরগুলিতে সৈনিক বৃত্তি অবলম্বন করে যিনি করাচিতে শিবির-গাড়া ৪৯ নং "বাঙালী পল্টন"-এর হাবিলদার পদ পর্যন্ত উঠেছিলেন, তিনি সামরিক জীবনে ইতি ঘটিয়ে কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর সম্পূর্ণ নতুন জীবনে প্রবেশ করলেন—শিল্প-সংস্কৃতির জীবন। কবি-গীতিকার-সুরকার এবং সাংবাদিকরূপে তাঁর নয়া পথ-পরিক্রমা শুরু হল। ওই বছরে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর গান রচনার পর্বারম্ভ, আর সেই পর্বের শেষ হয় ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে, যখন একদিন কলকাতা বেতারকেন্দ্রে প্রোগ্রাম করতে করতে তিনি অকস্মাৎ বাক্‌হারা হয়ে যান। বাক্যবিলোপের সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিবিলোপও আস্তে আস্তে তাঁকে অধিকার করে। তারপর আরও ৩৭ বছর-কাল তিনি বেঁচে ছিলেন, কিন্তু সে বেঁচে থাকা বেঁচে না থাকারই শামিল। সেটা পরিপূর্ণ নিষ্ক্রিয়তার কাল। প্রকৃতপক্ষে, বাঙ্ময় জীবনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সৃষ্টিশীল জীবনেরও অবসান ঘটে গিয়েছিল।

অতএব গাণিতিক হিসাব অনুসারে ১৯২০-১৯৪২—মাত্র এই বাইশ বছরের সময়সীমা কবি-সঙ্গীতকার নজরুলের সক্রিয় সৃষ্টিশীলতার কাল। বাইশ বছরের কালপরিধির ভিতর কম করেও তিনি প্রায় সাড়ে তিন হাজার গান রচনা করেছিলেন ভাবতেও মাথা ঘুরে যায়। এ যে কত বড়ো একটা কীর্তি, তার আন্দাজই শুধু করা যায়, পরিমাপ করা দুঃসাধ্য।

প্রাচুর্য গুণের সঙ্গে তুলনীয় নয় জানি, 'কোয়ান্টিটি' 'কোয়ালিটি'র সমানু-পাতিক কখনই হতে পারে না। কিন্তু নজরুলের গানের বেলায়, গুণের হিসাব ছেড়েই দিচ্ছি, তার পরিমাণটাই একটা মস্ত বিস্ময়ের বস্তু। কথায় কথায় যাঁর কলমে গান বেরোয়, কণ্ঠ থেকে অবিরল ধারায় সুর ঝরে পড়তে থাকে, তাঁর এই খাতের সৃষ্টির অজস্রতা আপনিই একটা তাক লাগিয়ে দেবার মতো বিষয়।

সৃষ্টির এমনতর হাঁফ-ধরানো সংখ্যাবাহুল্য অসামান্য প্রাণশক্তিরই এক প্রকাশ। প্রাণশক্তি যাঁর অফুরন্ত, তাঁর জীবনে সৃষ্টির প্রাচুর্য একই বিন্দুতে এসে মিলে যায়। প্রাচুর্য সেখানে ঐশ্বর্যের হাত-ধরাধরি করে চলে।

আর প্রাচুর্যের খাতেও কত রকমারি নমুনার দেখা পাই আমরা। কত বিচিত্র ধরনের গান যে নজরুল বেঁধেছিলেন, তার লেখাজোখা নেই। গজল দিয়ে সঙ্গীত-জীবনের সূত্রপাত করেছিলেন, তারপর একে একে কাব্যসঙ্গীত, জাতীয়তার ভাবদ্যোতক কোরাস ও একক গান, বিদেশী সুরভঙ্গির গান, রাগপ্রধান গান, হাসির গান, ভক্তিগীতি (কীর্তন-ভজন-শ্যামাসঙ্গীত ও ইসলামী), লোক-সঙ্গীত (ভাটিয়ালি, বাউল, ঝুমুর ইত্যাদি) ও সবশেষে 'হারামণি' পর্যায়ে লুপ্ত-অর্ধলুপ্ত হিন্দুস্থানী রাগ-রাগিণী অবলম্বনে রচিত বাংলা গান ও একান্ত স্বকপোল-উদ্ভাবিত নয়া রাগ সৃষ্টি—কত হাজারো পথে যে তাঁর প্রতিভার উৎস হতে উৎসারিত সুরের ঝর্নাধরা নানা মুখে বয়ে গিয়েছিল তার সীমা-সংখ্যা নেই। এই ক্ষেত্রেও অর্থাৎ রকমারি গান সৃষ্টির ক্ষেত্রেও নজরুল আজও পর্যন্ত অপরাজেয় রয়েছেন। বিচিত্রতায় তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

এখন, নজরুল রচিত গানের শ্রেণীরূপগুলির পরের পর একটা হিসাব নেওয়া যাক।

গজল

নজরুল উত্তর ভারতের আকাশে-বাতাসে পরিব্যাপ্ত দিল্লি-আগ্রা-বেনারস-লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি শহরের পথে পথে অনুরণিত গজল-গীত-নাত-কাওয়ালি-কাজরী-হোরী বর্গের গানের একজন সিদ্ধ শিল্পী ছিলেন, বিশেষ করে পারসিক গজলের সুরে ভরপুর তাঁর গজল গান, আর শ্রোতার প্রাণমনকে মাতোয়ারা করে দিতে এই গানের জুড়ি নেই। দু-চারটি নমুনা এখানে তুলে ধরছি—বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে দিসনে আজি দোল, আমারে চোখ ইশারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদী, ভুলি কেমনে আজো যে মনে বেদনা সনে রহিল আঁকা, এত জল ও কাজল চোখে পাষাণী আনলে বল কে, পথ চলিতে যদি চকিতে কভু দেখা হয় পরানপ্রিয়, চেয়ো না সুনয়না আর চেয়ো না ওই নয়ন বাণে, কেন আন ফুল-ডোর আজি বিদায় বেলায়, কেউ ভোলে না কেউ ভোলে অতীত দিনের স্মৃতি, ইত্যাদি। কাজরী গানের নমুনা—সখি, বাঁধ লো বাঁধ লো ঝুলনিয়া, 'গীত'

পর্যায়ের গানের নমুনা—উচাটন মন ঘরে রয় না, ইত্যাদি। নজরুলের গজল গান একদা (বিশের দশকে) বাংলার আকাশ-বাতাসে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতো। খেটে-খাওয়া মেহনতী স্তরের মানুষ, যেমন বিড়ি-শ্রমিক আর কারখানার শ্রমজীবী বন্ধুদের ডেরা থেকে শুরু করে ধনাঢ্য ব্যক্তির ড্রইং-রুম পর্যন্ত সর্বত্র এই গানের সমান গতায়াত ছিল। নজরুলের এই শ্রেণীর গানের জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রে শহর-গ্রামের পার্থক্য ঘুচে গিয়েছিল।

জনপ্রিয়তা আরও বৃদ্ধি পায় সুরসুধাকর দিলীপকুমার রায়ের দৌলতে। তিনি বিলেত থেকে পাঠান্তে ফিরে এসে নজরুলের গজল নিয়ে মাতলেন। সে এক দিন গেছে। সেই সময় গীতপ্রেমী এমন লোক খুঁজে পাওয়া মুশকিল ছিল, যাঁর কণ্ঠে ওইসব গজলের কোনো-না-কোনো কলি গুঞ্জরিত হয়ে না ফিরেছে। গজল হাল্কা সুরের গান—তার সুরের বাঁধুনিতে পিলু-বারোয়াঁ-খাম্বাজ-কাফি প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত হাল্কা রসের রাগিণীগুলিরই সমধিক প্রয়োগ ছিল। এসব সান্ধ্যকালে গেয় রাগ-রাগিণীগুলিই যেন ছিল গজল সুরের প্রাণ। কিন্তু ব্যতিক্রমও দেখা যায়। যেমন অপেক্ষাকৃত ভারী রসের প্রাতঃকালীন রাগ যোগিয়াতেও নজরুলের গজল গান রয়েছে— দিতে এলে ফুল হে প্রিয় কে আজি সমাধিতে মোর। এটি নজরুল স্বয়ং গ্রামোফোন রেকর্ডে গেয়েছিলেন। রেকর্ডের অপর পিঠে ছিল পাষাণের ভাঙালে ঘুম, কে তুমি সুরের ছোঁয়ায় নামক অনবদ্য ভঙ্গির 'লাওনী' শ্রেণীর একটি গান।

কাব্যগীতি

এরপর কাব্যগীতি। এই পর্যায়ে নজরুল অজস্র গান রচনা করেছিলেন। বেশির-ভাগই প্রণয়-সঙ্গীত কিংবা বিরহ-সঙ্গীত। বলতে গেলে নজরুলের অনুষঙ্গে কাব্যগীতি আর প্রেমগীতি সমার্থক ছিল। এই বর্গের কয়েকটি সুপরিচিত গানের প্রথম পঙ্ক্তি এখানে উল্লেখ করছি—মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর নমো নম (ভৈরবী), প্রিয় যেন প্রেম ভুলো না এ মিনতি করি হে (কানাড়া মিশ্র), কেমনে রাখি আঁখিবারি চাপিয়া (রাগেশ্রী), আমার না মিটিতে আশা ভাঙিল খেলা (দেশী-টোড়ী), ভরিয়া পরান শুনিতেছি গান আসিল আজি বন্ধু মোর (বেহাগ), অবিরত বাদর বরষিছে ঝরঝর (মিঞাকি মল্লার), ইত্যাদি। এই বর্গের আরও বহু গান আছে।

তালিকা বাড়িয়ে লাভ দেখি না। লক্ষণীয় যে, আধুনিক বাংলা গানের কয়েকজন সেরা কণ্ঠশিল্পী যথা, শ্রীমতী আঙ্গুরবালা দেবী, শ্রীমতী ইন্দুবালা দেবী ও শ্রীমতী কমলা ঝরিয়া এইসব গানকে গ্রামোফোন ডিস্কে অমর করে রেখে গেছেন।

দেশপ্রেমের গান

নজরুল জাতীয়ভাবোদ্দীপক, দেশপ্রেমমূলক গানও বিস্তর লিখেছেন। তার ভিতর একক (সোলো) ও সম্মেলক (কোরাস)—এই দুই বর্গের গানই আছে। এই পর্যায়ের কয়েকটি প্রসিদ্ধ গান হলো—কারার ওই লৌহকপাট ভেঙে ফেল কর রে লোপাট ; এই শিকল পরা ছল আমাদের শিকল পরা ছল ; তোরা সব জয়ধ্বনি কর (প্রলয়োল্লাস), আজি রক্তনিশি ভোরে ; দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে, ইত্যাদির মধ্যে শেষের কোরাস গানটি নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম। এমন কোরাস গান লাখে না মিলয়ে এক। কথিত আছে যে, এই গানটি নজরুল ১৯২৮ সালের মে মাসে কৃষ্ণনগরে প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার কালে সুভাষচন্দ্রের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে রচনা করেন। এক ঘণ্টার ভেতর গানের কথা ও সুর দুই-ই তৈরি হয়ে যায়—নজরুল তখন-তখনই সেটা সম্মেলন-মঞ্চে গেয়ে শোনান।

জাতীয় ভাবের উত্তেজক গানের পাশেপাশে ওই ভাবেরই সংশ্লিষ্ট আরও কিছু কিছু গান রচনা করেছিলেন কম-বেশি একই সময়ে। যথা, ১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রজা সম্মিলনীর অধিবেশন উপলক্ষ্যে রচিত 'শ্রমিকের গান'—ওরে ধ্বংসপথের যাত্রীদল ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল ; 'কৃষকের গান'—ওঠরে চাষী জগদ্বাসী ধর কষে লাঙ্গল ; নারী-জাগরণের গান—জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা ; ছাত্র-সংহতির গান—আমরা শক্তি আমরা বল/আমরা ছাত্রদল ; কুচকাওয়াজের গান—টলমল টলমল পদভরে/বীরদল চলে সমরে ; কিংবা, উর্ধ্বে গগনে বাজে মাদল নিম্নে উতলা ধরণীতল/অরুণ প্রাতের তরুণ দল, চলরে চলরে চল ; সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির গান—মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান, ইত্যাদি।

সেই সঙ্গে বিশ্ববিশ্রুত 'ইন্টারন্যাশনাল' গানেরও প্রথম ভারতীয় তর্জমার কৃতিত্ব তাঁর। তিনি এর নাম দেন "অন্তরন্যাশনাল" সঙ্গীত—জাগো অনশন-বন্দী

ওঠরে যত/জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যহত, ইত্যাদি। গানটি ভীমপলশ্রী সুরে বাঁধা, অপ্রতিরোধ্য সেই সুরের আবেদন।

রাগপ্রধান

নজরুল হিন্দুস্থানী রাগ-রাগিণীর ভিত্তিতে একাধিক গান প্রণয়ন করেছিলেন। তবে এগুলি ঠিক অনুকরণ সঞ্জাত 'ভাঙা' খেয়াল বর্গের গান নয়, রাগ-রসের সঙ্গে বাংলার জাতীয় কাব্যরসের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে সম্পূর্ণ মৌলিক চেহারায় এগুলির অবয়ব তিনি খাড়া করেছিলেন। এর বাঁধুনিতে ক্লাসিক ও রোমান্টিক এই দুই প্রকার উপাদানেরই পোষকতা রয়েছে। সুরের দিক থেকে ক্লাসিক, বাণীর দিক থেকে রোমান্টিক। ইংরাজীতে 'ক্লাসিকো-মডার্ন সঙস্' একেই বলে।

এই পর্যায়ের কয়েকটি প্রসিদ্ধ গান হলো—শূন্য এ বুকে পাখি মোর (ছায়ানট), এ কি তন্দ্রা বিজড়িত আঁখিপাত (মালকোষ), অনিমেষ আঁখি আমার (বাগেশ্রী), আমায় বোলো না ভুলিতে বোলো না (বেহাগ), পিউ পিউ বিরহী পাপিয়া বলে (ললিত), দামিনী দমকে (জয়জয়ন্তী), শ্মশানে জাগিছে শ্যামা অন্তিমে সন্তানে দিতে কোল (কৌশিকী-কানাড়া), আজি নিঝুম রাতে কে বাঁশি বাজায় (দরবারী কানাড়া), অরুণকান্তি কে গো যোগী ভিখারী (আহীর ভৈরব), অগ্নিগিরি ঘুমন্ত উঠিল জাগিয়া (লঙ্কাদহন সারং), কেন করুণ সুরে হৃদয়পুরে বাজিছে বাঁশরি (দেশ-সুরট), কুহু কুহু কুহু কুহু কোয়েলিয়া (খাম্বাজ-মিশ্র), আজি নন্দদুলাল মুখচন্দ নেহারি (খাম্বাবতী), গুঞ্জ মালা গলে কুঞ্জে এসো হে কালা (মালগুঞ্জ), অঞ্জলি লহ মোর (তিলং), প্রভৃতি।

এই পর্যায়ে কর্ণাটী অর্থাৎ দক্ষিণ-ভারতীয় রাগ অবলম্বনেও তিনি কিছু কিছু গান বেঁধেছিলেন। যথা, হে পার্থ সারথি, বাজাও বাজাও পাঞ্চজন্য তব শঙ্খ (শিবরঞ্জনী), কাবেরী নদী জলে কে গো বালিকা (কর্ণাটী সামন্ত), নীলাম্বরী শাড়ি পরি নীল যমুনায় কে যায় (নীলাম্বরী), পরদেশী মেঘ যাও রে ফিরে (সিংহেন্দ্র-মধ্যমা), নারায়ণী উমা খেলে হেসে (নারায়ণী), ইত্যাদি।

নজরুলের স্বয়ংসৃষ্ট রাগ-রাগিণীর কয়েকটি গান—চপল আঁখির ভাষায় হে মীনাক্ষি (মীনাক্ষি), হাসে আকাশে শুকতারা হাসে (অরুণরঞ্জনী), শোন ও সন্ধ্যামালতী বালিকা তপতী (সন্ধ্যামালতী), সতীহারা উদাসী ভৈরব কাঁদে

(উদাসী ভৈরব), মৃত্যু নাই, নাই দুঃখ—আছে শুধু প্রাণ (আশা-ভৈরবী), ইত্যাদি।

বিদেশী সুরভঙ্গির গান

নজরুল বহুদিগ্‌দেশাগত সুরভঙ্গির সংযোজনার দ্বারা বাংলা গানের প্রচলিত ও পরিচিত সুররূপের উল্লেখযোগ্য বৈচিত্র্য সাধন করেছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা হয়তো দ্বিতীয়রহিত নয়, তবে তিনি যে এক্ষেত্রে একটি অগ্রগণ্য স্থানে আছেন, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

অদ্ভুত মাদকতাময় সুরের জাদুতে তাঁর এই বিদেশী গানগুলির অবয়ব গঠিত। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—চমকে চমকে ধীরু ভীরু পায় / পল্লী বালিকা এক বনপথে যায়। (আরবী সুরের গান), দূরদ্বীপবাসিনী, চিনি তোমারে চিনি (দক্ষিণ সমুদ্র-দ্বীপের গান), মোমের পুতুল মমীর দেশের মেয়ে নেচে যায় (মিশরীয় নাচের সুর), রুম ঝুম ঝুম ঝুম রুম ঝুম ঝুম (মুরিশ মেলডি), শুকনো পাতার নূপুর পায়ে নাচিছে ঘূর্ণিবায় (এটিও আরবী সুরের গান), ইত্যাদি। এই গানগুলির সুর হালকা ধরনের হলেও সুরের আবেদনের দিক থেকে অসাধারণ।

লোকগীতি

এই পর্যায়ে কাজী নজরুল বাউল, ভাটিয়ালি, ঝুমুর, কাজরী, জংলা প্রভৃতি নানা ধরনের গানই লিখেছিলেন—তবে, ভাটিয়ালি আর ঝুমুরের সংখ্যাই বেশি। ভাটিয়ালি পূর্ববঙ্গের নদীপথের গান, আর ঝুমুর বিহার-বাংলার প্রত্যন্ত সীমায় বসবাসকারী সাঁওতাল, মুণ্ডা প্রভৃতি আদিবাসীদের গান। ভাটিয়ালির নমুনা—পদ্মার ঢেউ রে / মোর শূন্য-হৃদয়-পদ্ম নিয়ে যা যা রে ; কোন্ কূলে আজ ভিড়লো তরী অকূল সোনার গাঁয় ; আমার শাম্পান যাত্রী না লয় / ভাঙা আমার তরী, ইত্যাদি।

ঝুমুর গানের নমুনা—"চোখ গেল চোখ গেল" কেন ডাকিস রে ; হলুদ গাঁদার ফুল, রাঙা পলাশ ফুল ; মেঘলা নিশি ভোরে মন যে কেমন করে ; এই রাঙা মাটির পথে লো, মাদল বাজে, বাজে বাঁশের বাঁশি, ইত্যাদি।

ভক্তিগীতি

পরিশেষে ভক্তিসংগীত। এই পর্যায়ে নজরুল ভজন, কীর্তন, শ্যামাসংগীত, ইসলামী প্রভৃতি নানা ধরনের গান কথায় ও সুরে বদ্ধ করেছিলেন। কবির এই-জাতীয় গান রচনার পিছনে ভক্তির আকূতি নিশ্চয়ই ছিল কিন্তু তার চেয়েও বোধহয় বেশী ছিল বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনসাধনের অভীপ্সা। সাম্প্রদায়িক ঐক্যের আদর্শের এক অশ্রান্ত প্রচারক নজরুল বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের আশ্রয়ী ভক্তিগীতি লিখে সম্ভবতঃ এইটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, মূল অনুভবের ক্ষেত্রে কোনো ধর্মের সঙ্গেই কোনো ধর্মের পার্থক্য নেই—পার্থক্য যা প্রতীয়মান হয়, তা বহিরাঙ্গিক আচার-অনুষ্ঠানের ভিন্নতাপ্রসূত। সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সকল মানুষের মূলগত ঐক্যটাই হলো আদত কথা, বাইরের দৃশ্যমান ভেদাভেদগুলি খোলস মাত্র।

নজরুল-সংগীতের সিদ্ধশিল্পীদের মধ্যে কতিপয়ের নাম আগে করেছি। অবশিষ্ট-জনদের নাম—কমল দাশগুপ্ত (প্রয়াত), শচীন দেববর্মণ (প্রয়াত), চিত্ত রায় (প্রয়াত), ডাঃ অঞ্জলি মুখার্জি (প্রয়াত), শ্রীমতী ফিরোজা বেগম (বাংলাদেশ), শ্রীমতী লায়লা আর্জুমান্দ বানু (বাংলাদেশ), সুধীন দাশ (বাংলাদেশ), শ্রীমতী সুপ্রভা সরকার, সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র (ফেলুবাবু), ধীরেন্দ্রনাথ বসু, সুকুমার মিত্র, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী হৈমন্তী শুক্লা, শ্রীমতী পূরবী দত্ত, বিমান মুখোপাধ্যায়, অনুপ ঘোষাল, বিমলভূষণ, অধীর বাগচী প্রমুখ।

সুরস্রষ্টা ভীষ্মদেব

কণ্ঠশিল্পী ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় বাংলার রাগসংগীতের ‘ক্ষেত্রে আমাদের এক প্রধান গৌরবের পাত্র। খেয়াল গানে তাঁর আগে ও পরে বাংলায় বহু প্রথিত-যশা শিল্পীর আবির্ভাব হয়েছে, কণ্ঠের সম্পদে ও স্বরের মিষ্টত্বে তাঁদের কেউ কেউ নিঃসন্দেহেই ভীষ্মদেবের তুলনায় উৎকৃষ্টতর পর্যায়ের গায়ক—যেমন জ্ঞানেন্দ্র-প্রসাদ গোস্বামী, তারাপদ চক্রবর্তী প্রভৃতি ; কিন্তু সুরসৃষ্টির কৃতিত্ব দিয়ে যদি গায়কের শিল্পপ্রতিভার বিচার করতে হয় তাহলে অবধারিতভাবেই ভীষ্মদেবের নাম সকলের পুরোভাগে স্থাপন করতে হয়। তাঁকে গায়ক বললে খুব কমই বলা হয় অথবা প্রায় কিছুই বলা হয় না ; বলা উচিত তিনি স্রষ্টা, তিনি কণ্ঠস্বরের আশ্রয়ে সুরের জাদুকর। প্রবন্ধের শিরোনামে ‘সুরস্রষ্টা’ কথাটি এই নিরিখেই বিচার্য।

কেন ভীষ্মদেবকে স্রষ্টার সম্মানে ভূষিত করা হচ্ছে তা একটু বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে।

গায়ক হলেই তিনি স্রষ্টা হন না, এমনকি কণ্ঠস্বরের স্বীকৃত ঐশ্বর্য ও মাধুর্য সত্ত্বেও না। খুব ভালো গাইয়ে, মিষ্টি গলা, নামধাম প্রচুর, অথচ দেখা যায় স্বীয় সংগীতগুরুর কাছ থেকে শিক্ষালব্ধ গানসমূহের যথাযথ পুনঃপ্রকাশ ক্ষমতা ছাড়া তাঁর নৈপুণ্যের আর কোনো বিশেষ নিদর্শন মেলে না। এই যথাযথ পুনঃপ্রকাশের দক্ষতা, এটাও বড়ো একটা গুণ সন্দেহ নেই ; কিন্তু তা সত্ত্বেও বলতে হয় এই গুণ আসলে অনুকরণাত্মক, এর মধ্যে সৃষ্টির লক্ষণ তেমন নেই। সৃষ্টিগুণান্বিত শিল্পী তাঁকেই বলা যায় যিনি শিক্ষার্জিত বিদ্যা কেবলমাত্র হুবহু পরিবেশন করেই ক্ষান্ত থাকেন না, তাতে নিজেও কিছু যোগ করেন। স্বীয় প্রতিভার দ্যুতিতে তিনি গাওয়া গানকে আরও বেশী আলোকিত করে তোলেন।

জলসায় ও আসরে গাওয়া গানের সচরাচর দুটি আয়তন থাকে—একটি আয়তন ওস্তাদের কাছ থেকে পাওয়া, দ্বিতীয় আয়তনটি হলো গায়কের স্বকীয় কণ্ঠসম্পদ। এই দুই আয়তনেই বেশীর ভাগ গান সীমিত থাকে, তৃতীয় আয়তনের দেখা মেলে খুব কম ক্ষেত্রেই। স্রষ্টা গায়ক এই তৃতীয় আয়তনটি যোগ করেন তাঁর গানে স্বকীয় প্রতিভার বলে আর তার ফলে সুরের অপূর্ব সম্মোহন সৃষ্টি করে

তোলেন জলসা বা আসরের আবহের মধ্যে—শ্রোতার কানে যেন মধু ঝরতে থাকে যতক্ষণ তিনি গান গাইতে থাকেন সেই সময়টায়। এই অর্থেই ভীষ্মদেব স্রষ্টা গায়ক, সুরের জাদুকর কণ্ঠশিল্পী।

ভীষ্মদেবের কণ্ঠ খুব উচ্চাঙ্গের নয়। সাধারণতঃ তিনি হারমোনিয়মের স্কেলের "এফ শার্পে" খরজ বেঁধে গান করেন। অর্থাৎ খেয়াল গায়কেরা ঠুংরী গাইবার সময় সচরাচর যে-স্কেলে সুর বেঁধে গান করেন—মধ্যম কিংবা পঞ্চম পর্দায়—সেটা ভীষ্মদেবের খেয়াল গাইবার বরাবরকার স্কেল। তার অর্থ, ভীষ্মদেবের স্বাভাবিক কণ্ঠ কিছু চড়া, উদারায় আওয়াজ তেমন ভালো খোলে না, তার উপর আওয়াজ নারীকণ্ঠসুলভ ধাতব ক্রেঙ্কারযুক্ত হওয়ায় কিছুটা বা কর্কশ। এর উপর আবার তিরিশের দশকে—যে-সময়টায় ভীষ্মদেবের প্রতিভা সৃজনী উৎকর্ষের শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করেছিল—তিনি প্রায়ই 'ফ্যারিংজাইটিসে' ভুগতেন (এই গলার অসুখ তাঁর অনেক দিন ছিল)। ফলে নানা দিক দিয়ে বাধাগ্রস্ত হয়ে বরাবর তাঁকে গান করতে হয়েছে। জ্ঞান গোঁসাই-এর মতো উদাত্ত কণ্ঠ কিংবা তারাপদ চক্রবর্তীর মতো 'বোলন্দ্' আওয়াজ যদি ভীষ্মদেবের থাকত তাহলে তাঁকে একজন সর্বাঙ্গসুন্দর গায়ক বলা যেতে পারতো। কিন্তু দুর্ভাগ্য, ভীষ্মদেবকে কণ্ঠের সহজাত ত্রুটী নিয়েই সংগীত সাধনা করে যেতে হয়েছে আকৈশোর। তাঁর চোদ্দ বছর বয়সের গাওয়া টপ্পাভঙ্গিম যে দুটি বাংলা গান গ্রামোফোন রেকর্ডে শোনা যায়, তার মধ্যেও আমাদের এ কথার সত্যতার প্রমাণ মিলবে বলে মনে করি। সুতরাং আক্ষরিক অর্থেই 'আকৈশোর' কথাটা এখানে গণনীয়।

কিন্তু আশ্চর্য ভীষ্মদেবের ক্ষমতা। ওই বাধাগ্রস্ত কণ্ঠ নিয়েই তিনি কী অসাধারণ সুরের জাল রচনা করেন গানে! কি সুরের বিস্তারে, কি সরগম প্রয়োগে, কি তানকর্তব বা বোলতানের সংযোজনায় তাঁর নিত্য নব নব উদ্ভাবনী নৈপুণ্যের কোনো তুলনা হয় না। বেহাগে (আবহো লালন ম্যায় কি) তিনি যে সুরের বিস্তার করেন, ললিতে (পিউ পিউ রটত পাপিহরা বোলে) তিনি যে অপূর্ব ছন্দ ও লয়ের ব্যঞ্জনাময় সরগম করেন, কিংবা রাগেশ্রী-বাহারে (ঋতু বসন্ত আয়িরি) তিনি যে অবলীলায়িত অদ্ভুত দ্রুত তানকর্তব করেন তার কি কোনো প্রতিস্পর্ধী দৃষ্টান্ত আছে বাংলা খেয়াল গানের জগতে? আমি বলতে চাই যে, তাঁর এই সুরবিস্তার, সরগম, তান ও বোলতানের কোনো পূর্ব-নজীর নেই বাংলার উচ্চাঙ্গ সংগীতের দরবারে—এ একেবারেই তাঁর নিজস্ব স্বকীয় অবদান—

প্রতিভার জাদুস্পর্শে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির লক্ষণে ভূষিত। প্রথম শ্রেণীর কল্পনাশক্তি না থাকলে কোনো গায়কের পক্ষে তাঁর গানে এমনতরো অভিনব সৃজনী বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব।

কিংবা ধরা যাক ভীষ্মদেবের তথাকথিত রাগপ্রধান গানগুলি। জয়জয়ন্তী (ফুলের দিন হলো যে অবসান), দেশী টোড়ী (তব লাগি ব্যথা ওঠে গো কুসুমি), ভৈরবী (নবারুণ রাগে তুমি সাথী গো), রামকেলি (আলোক লগনে) প্রভৃতি রচনা নামেই রাগপ্রধান গান—কোনো একটি বর্গের মধ্যে রচনাগুলিকে ফেলতে হবে বলেই সেগুলির উপর রাগপ্রধানের লেবেল এঁটে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আসলে এর প্রত্যেকটি গান একটি নতুন সৃষ্টি, অনবদ্য সৃষ্টিসুখের উল্লাসের এক একটি অশ্রুতপূর্ব অভিব্যক্তি, যার কোনোটির উপরেই প্রচলিত বর্গীকরণের নিয়ম খাটে না। এ এক প্রতিভাবান সুরস্রষ্টার আপন খেয়ালের উদ্দীপ্ত রচনা, যার পূর্ব-নজীর বা পর-নজীর কোনোটাই খুঁজে পাওয়া যাবে না। অনুকরণের অসাধ্য এর স্বরের স্বকীয়তা। বড়ো জোর সুরের কাঠামোর অনুকরণ করা চলতে পারে, কিন্তু স্বরের কাঠামোর অন্তর্নিহিত যে সুরের সৌন্দর্য—তাকে কেমন করে অনুকরণ করা যায়? প্রতিভাকে কি অনুকরণ করা যায়? গানগুলির সুর বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করব না—সে চেষ্টা নিরর্থক—শুধু একটি কথা বলেই এ গানগুলির প্রসঙ্গের ইতি ঘটাব। ছন্দের কাজে ভীষ্মদেব যে কী পরিমাণ দুর্ধর্ষ তার ধারণা পাওয়ার জন্য তাঁর "আলোক লগনে" গানটি গ্রামোফোন রেকর্ডে শুনতে সকলকে অনুরোধ করি। আর সুরের বিস্তারে তাঁর জাদুসৃষ্টির ক্ষমতার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ রয়েছে "নবারুণ রাগে" গানটির সেই সেই অংশে যেখানে তিনি ইচ্ছাপূর্বক ভৈরবীর সঙ্গে বিলাসখানি টোড়ীর খোঁচ মিশিয়েছেন খরজে উপনীত হবার পূর্বমুহূর্তে। আলোচনার দ্বারা এই মিশ্রণের মাধুর্য বোঝানো যায় না, গানটি শোনাই গানটির সৌন্দর্য উপলব্ধির শ্রেষ্ঠ উপায়।

ভীষ্মদেব বাল্যে ও কৈশোরে নগেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। পরিণত বয়সে ওস্তাদ বাদল খাঁ সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও দীর্ঘকাল তাঁর কাছ থেকে তালিম নেন। এই দুই পর্বেই দেখতে পাওয়া যায় তিনি মধ্য ও দ্রুত লয়ের গান বেশী গাইতেন এবং যেসব গানে তানের অবকাশ সমধিক সেগুলি গাইবার সময় প্রায়ই দ্রুতলয়ের গান বেছে নিতেন। ফলে তাঁর গানে একটা চঞ্চলতা প্রকাশ পেত, যেটা রসোপভোগের ক্ষেত্রে স্থির ভাবের

পরিপন্থী। সুরের চাপল্যে অনেক সময় রসের গাঢ়তা বাধাপ্রাপ্ত হতো। আমার মনে হয় ভীষ্মদেবের কণ্ঠের পূর্বোক্ত অপূর্ণতাগুলিই এইজন্য প্রধানতঃ দায়ী। দ্রুত লয়ের গান গাইতে তিনি ভালোবাসতেন, তার কারণ দ্রুত লয়েই তাঁর কণ্ঠ খুলত সবচেয়ে বেশী; বিলম্বিত অর্থাৎ ঢিমা লয়ের গান তিনি এড়িয়ে চলতেন, তার কারণ ঢিমা লয়ের গানে তাঁর কণ্ঠের বিচ্যুতিগুলি সহজেই প্রকট হয়ে উঠত। ঝড়ের বেগে গান গেয়ে ও তানকর্তব করে তিনি তাঁর বিচ্যুতিগুলি ঢাকতে চেষ্টা করতেন। গলার অসুখ যে তাঁকে কত ভাবে ভুগিয়েছে তা যাঁরাই তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন তাঁরাই জানেন। সুখের বিষয়, যখন থেকে ভীষ্ম-দেব ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের কাছে গান শিখতে লাগলেন—সেটা ১৯৩৭-৩৮ সালের কথা হবে—তখন থেকে তাঁর কণ্ঠে ক্রমেই বেশী করে ভাবের দ্যোতনা প্রকাশ পেতে থাকলো, মধ্য ও দ্রুত লয়ের গান ছেড়ে তিনি বিলম্বিত লয়ের গানে বেশী সময় ও মনোযোগ দিতে লাগলেন। আগে যেখানে বাহার, সুহা, সুঘরাই, আড়ানা, বসন্ততিলক প্রভৃতি উল্লাসজ্ঞাপক রাগের রূপায়ণমূলক গানে সুরের উদ্দাম ঘোড়া ছুটিয়ে ও তানের দ্রুত ফুলঝুরি কেটে শ্রোতার তাক্ লাগিয়ে দিতেন, সেই স্থলে এখন বেছে বেছে ধীর ও গম্ভীর রসের বাগরাগিণী নির্বাচন করে সেগুলির উপরেই সুরসৃষ্টির সমস্ত আবেগ ঢেলে দিতে লাগলেন। এই-জাতীয় রাগরাগিণীর কয়েকটি হলো—ইমন, আল্লাহিয়া-বিলাবল, আশাবরী, জৌনপুরী, দেশী টোড়ী, চর্জু-কি-মল্লার, মলুহা-কেদার, পুরিয়া প্রভৃতি। কিন্তু সেখানেও দেখা যায়, উত্তরাঙ্গপ্রধান রাগগুলির দিকেই তাঁর সমধিক ঝোঁক প্রকাশ পেত, পূর্বাঙ্গপ্রধান রাগ মনোনয়ন তিনি কমই করতেন। এর কারণ আর কিছুই নয়, পূর্বাঙ্গপ্রধান রাগের রূপায়ণে উদারায় অর্থাৎ ইংরেজীতে যাকে বলে bass, তাতে গলা ভালো খোলা চাই। আর ঠিক এই ক্ষেত্রেই ভীষ্মদেবের গলার বিচ্যুতি ছিল সবচাইতে স্পষ্ট।

চল্লিশের দশকের গোড়ায় ভীষ্মদেব সংগীত-সাধনাকে পিছনে ফেলে রেখে ও তাঁর অগণিত গুণানুরাগীকে হতচকিত করে দিয়ে পণ্ডিচেরীতে চলে যান শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে তিনি দীর্ঘ আট বৎসর অতিবাহিত করেন এবং যখন তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন তখন আর তাঁকে চেনা যায় না। শরীর ভগ্ন, বিষাদে ও অবসাদে মন নিদারুণ ক্লিষ্ট; সুরের জগৎ থেকে বলতে গেলে বাণপ্রস্থ অবলম্বনকারী। গাইতে বারংবার অনুরোধ করলেও গান করেন না, কোনো

সংগীত আসরে বা সম্মেলনে পারতপক্ষে যান না, সদাসর্বদা লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকতেই ভালোবাসেন। ইতোমধ্যে এই আট বছর তাঁর কীভাবে কেটেছে, কী ঘটেছে—কিছুই জানবার উপায় নেই, আমরা শুধু ভীষ্মদেবের পূর্বতন সত্তার ছায়াটিকে মাত্র কলকাতার জীবন ফিরে পেলাম। কৃতিত্ব ও গৌরবের শীর্ষদেশে যখন তিনি অধিষ্ঠিত সেই সময়ে তিনি স্বেচ্ছায় সব-কিছুর মায়া ত্যাগ করে কলকাতা ছেড়েছিলেন ; যখন প্রত্যাবর্তন করলেন তাঁকে যেন আবার গোড়া থেকে নতুন করে জীবনারম্ভ করতে হবে এমনি ভাগ্যের ফেরে তাঁকে পড়তে হলো। অদৃষ্টের পরিহাস ছাড়া আর একে কী বলা যায় !

ভীষ্মদেবের পণ্ডিচেরী প্রয়াণের অনেকে অনেক রকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন। জানি না তার কোন্‌টা ঠিক। কেউ বলেন আধ্যাত্মিক জীবনে সার্থকতা লাভের আশায় তিনি শ্রীঅরবিন্দের যোগপন্থার শরণ নিতে গিয়েছিলেন ; কেউ বলেন কলকাতার কলকোলাহলময় অন্তঃসারশূন্য দাপাদাপির জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে দিলীপকুমার রায় মহাশয়ের পরামর্শে মানসিক শান্তির অন্বেষণে কিছুদিন আশ্রমে বিশ্রাম করতে গিয়েছিলেন এবং জায়গাটা ভালো লাগায় সেখানেই থেকে গিয়েছিলেন। কেউ বলেন, যৌগিক প্রক্রিয়ায় গলার অসুখ সারানোই ছিল তাঁর আশ্রমে যাবার প্রধান উদ্দেশ্য। এ সব অনুমান, অনুমানের সুরেই সীমারদ্ধ থাকতে বাধ্য, কেননা যাঁকে জিজ্ঞাসা করলে এসব জল্পনা-কল্পনার সদুত্তর পাওয়া যেত তিনি এবিষয়ে নিশ্চুপ ছিলেন, প্রশ্ন করলেও প্রশ্নকারীকে উত্তরদানে বাধিত করবার কোনো গরজ তাঁর মধ্যে দেখা যেত না। তবে কারণ যাই হোক, এটা অন্ততঃ স্পষ্ট যে, মধ্যবয়সে ভীষ্মদেবের সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে পণ্ডিচেরী চলে যাওয়ায় তাঁর সাংগীতিক জীবনের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। তাঁর ব্যক্তিগত ক্ষতি অপেক্ষাও ক্ষতি হয়েছে বেশী দেশের ও জাতির—বাংলার ও বাঙালীর। আট বছর ও তারও পরেকার একটা উল্লেখযোগ্য সময় বাংলার সঙ্গীতজগৎ তার শ্রেষ্ঠ জীবিত প্রতিনিধির প্রাণঢালা অমেয় সুরপ্রবাহ থেকে বঞ্চিত থেকেছে, তাঁকে ফিরে পাওয়ার পরও তাঁর সুরের ধারায় নিজেদের যথোচিত তৃপ্ত করতে পারেনি।

তবে বাংলার উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রাণপ্রিয় ভীষ্মদেব মৃত্যুর আগের কয়েক বছর আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন, তিনি-বিভিন্ন জলসায় আসরে কনফারেন্সে পুনরায় আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন, গাইছিলেনও হৃদয়ের সবটুকু

দরদ ঢেলে আগের দিনগুলির মতো। দেখে-শুনে মনে হয়েছিল, তিনি তাঁর পুরনো 'ফর্ম' ফিরে পেতে চলেছেন, সুরসৃষ্টির আবেগ পুনরায় নেমে এসেছে তাঁর কণ্ঠের কৃতিত্বে—যে-ভীষ্মদেবকে আমরা যৌবনে জানতাম, আমাদের এবং তাঁরও পরিণত বয়সে, তাঁকে যেন আবার পুনরাগত দেখতে পেয়েছিলাম আসরে ও বৈঠকে। বৃদ্ধ হলে কী হবে, তাঁর এক এক দিনকার গান শুনলে মনে হতো এখনও তিনি সুরের ভেল্কি দেখাতে সমান পারঙ্গম।

ভীষ্মদেব আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। তাঁর জাদুকণ্ঠ চিরকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু তাঁর সেই জাদুকণ্ঠের স্মৃতি কোনোদিনই মলিন হবার নয়। বাংলার সংগীতজগতের ইতিহাসে ভীষ্মদেবের নাম অক্ষয় হয়ে থাকবে।

সুরসুধাকর দিলীপকুমার রায়

প্রসিদ্ধ গায়ক, সুরকার, লেখক, চিন্তাবিদ্, সংস্কৃতিনায়ক শ্রদ্ধেয় দিলীপকুমার রায় আর ইহজগতে নেই। বেশ কিছুদিন হলো তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়েস হয়েছিল তিরাশি বছর। প্রায় সব পত্র-পত্রিকাতেই দিলীপকুমারের শোক-সংবাদ প্রকাশিত হয়ে গেছে এবং তদুপলক্ষ্যে তাঁর গুণাবলীর মাহাত্ম্যও কীর্তিত হয়েছে নানাভাবে। সেই তুলনায় আমার এই বিয়োগ-নিবন্ধ প্রকাশে কিছু বিলম্ব হয়ে গেল। তবু যে এই বিলম্বিত রচনা লিখতে উদ্যত হয়েছি তার কারণ দিলীপকুমারের কাছে আমার কিছু ঋণ আছে—এক সময়ে দিলীপকুমারের কাছ থেকে অপরিমিত স্নেহলাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল—সেই ঋণ স্বীকারের তাগিদ থেকেই আজকের এই শ্রদ্ধানিষিক্ত স্মৃতিতর্পণ প্রয়াস।

আমাদের দেশবাসীর কাছে দিলীপকুমারের গায়ক সত্তাটাই তাঁর ব্যক্তিত্বের সবচেয়ে গণনীয় দিক বলে প্রতিভাত হয়েছিল এবং বিয়োগ-পঞ্জীগুলিতে দেখলুম তাঁর এই গায়ন কৃতিত্বটাকেই সবচেয়ে বড় করে দেখানো হয়েছে অধিকাংশ লেখায়। কিন্তু এই লেখকের ক্ষুদ্র বিবেচনায় তাঁর গায়কসত্তা অপেক্ষাও বড় ছিল তাঁর সুরকার-সত্তা এবং সুরকার-সত্তা অপেক্ষাও আবার বড় ছিল তাঁর সাংস্কৃতিক সত্তা—বহু অধীত, বহু ভ্রাম্যমাণ, দেশ-বিদেশের একাধিক প্রথম শ্রেণীর মনীষী, ভাবুক ও শিল্পীর সান্নিধ্যচর্চাকারী এক সত্যিকারের বিদগ্ধ জনের ভাবমূর্তিটাই আমার চোখে সব ছাড়িয়ে উজ্জ্বল রেখায় প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে যখনই এই মানুষটি সম্পর্কে কিছু ভাবতে বা লিখতে যাই। বহির্বিশ্বে ভারতবর্ষের শিল্প-সাহিত্য, সঙ্গীত, সংস্কৃতি, আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় ঐতিহ্য ইত্যাদির প্রচারে যে কয়জন ভারতীয় সন্তান সারা জীবন অনলস ভাবে পরিশ্রম করে গেছেন তাঁদের মধ্যে তাঁর স্থান ছিল অনেকেরই পুরোভাগে। এই ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা অতিশয় উচ্চ প্রশংসার অপেক্ষা রাখে এবং বস্তুত এই দিক থেকেই তাঁর মহিমা আমার সবচেয়ে মূল্যবান বলে মনে হয়, অন্য দিকগুলি যেন তুলনায় কিছু গৌণতায় পর্যবসিত।

সাংস্কৃতিক দূত

এক হিসাবে দেখতে গেলে দিলীপকুমার ছিলেন আমাদের দেশের একজন অগ্রগণ্য বেসরকারী সাংস্কৃতিক দূত, যিনি বিশ্বের সঙ্গে এদেশের ভাবের আদান-প্রদানের এক প্রধান মাধ্যম রূপে কাজ করে গেছেন আজীবন। পাশ্চাত্ত্য ভূভাগ ও ভারতের মধ্যে তিনি ছিলেন সংস্কৃতির যোজক সেতুবন্ধ স্বরূপ। প্রকৃত প্রস্তাবে, তাঁর দৌলতেই আমরা আমাদের কৈশোরে প্রথম বহির্বিশ্বের আলোক দেখতে শিখেছিলাম—তাঁর লেখা থেকেই প্রথম রোমাঁ রোলাঁ, বার্টর‍্যাণ্ড রাসেল, জর্জ ডুহামেল, জাঁ পল রিশার, আল্ডুস হাক্সলী, আয়ার্লাণ্ডের কৃষিবিজ্ঞানী কবি জর্জ রাসেল ওরফে 'এ-ঈ' প্রমুখের চিন্তাধারা ও শিল্পকৃতি সম্পর্কে অবহিত হবার সুযোগ পাই। তিনি আমাদের দৃষ্টির সামনে বাইরের জগতের জানালাটি খুলে দিয়েছিলেন। তেমনি আবার বাহিরকে আমাদের ঘরে নিয়ে এসেছিলেন। ঘরে-পরে তাঁর এই মহিমময় সাংস্কৃতিক দৌত্যের কাছে আমাদের যে ঋণ—অন্ততঃ আমার যে-ঋণ—তা এক কথায় অপরিশোধ্য। ঋণ স্বীকার এক কথা, ঋণ পরিশোধ অন্য কথা। ঋণ পরিশোধ করতে চাইলেই ঋণ পরিশোধ করা যায় না।

এ তো গেল দিলীপকুমারের কাছে আমার অপ্রত্যক্ষ ঋণ অর্থাৎ যে সময়ে দিলীপকুমারের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় হয়নি সেসময়কার ঋণ। পরে কুমিল্লা থেকে স্কুল-কলেজের পাঠ সাঙ্গ ক'রে যখন ভাগ্যান্বেষণে কলকাতা আসি—সেটা ১৯৩৪-৩৫ সালের কথা হবে—তখন থেকে তাঁর সঙ্গে সংগীতের সূত্রে আমার প্রত্যক্ষ যোগ সাধিত হয়। আমার তখন প্রসিদ্ধ ওস্তাদ ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছে উচ্চাঙ্গ সংগীতের তালিম গ্রহণ আর অবসর সময়ে সাহিত্য-চর্চা করে সময় কাটে। ওই সময়ে পণ্ডিচেরী আশ্রম থেকে দিলীপকুমার একদফা কলকাতা আসেন—প্রতিবছরই তিনি আশ্রমের ধর্মীয় আবহাওয়া থেকে স্বাদ-বদলের প্রকরণ রূপে একবার কি দু'বার কলকাতা ঘুরে যেতেন। আর যতদিন কলকাতায় থাকতেন উৎসবে সমারোহে, সাংগীতিক ও সাহিত্যিক জমায়েতে এই শহরকে চঞ্চল করে তুলতেন। এমনি এক কলকাতা-সফরকালে কী করে জানি না তাঁর সঙ্গে আমার সংযোগ হয় এবং সেই সংযোগ দীর্ঘকাল অব্যাহত থাকে। তিনি আমাকে তাঁর অন্তরঙ্গ মণ্ডলীর একজন করে নেন এবং বয়সের যথেষ্ট পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আমাকে তাঁর অন্যতম ঘনিষ্ঠ সুহৃদের মর্যাদা দেন।

আমাদের দুজনার মধ্যে সংগীত ও সাহিত্য বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গীর ঐক্য হয়ত ছিল না কিন্তু এই দুই বিষয়ের প্রতি উভয়েরই প্রভূত অনুরাগ ও উৎসাহ ছিল। পরিচয়ের অত্যল্পকাল মধ্যেই পরিচয় অন্তরঙ্গতায় পরিণত হওয়ার সেইটাই বোধ করি আসল কারণ।

মূল্যবান মধ্যস্থতা

আমি দিলীপকুমারের কাছ থেকে অপরিমিত স্নেহ পেয়েছিলাম, সে কথা পূর্বেই বলেছি। একজন সাহিত্যিক অগ্রজের কাছ থেকে একজন সাহিত্যিক অনুজ যে-স্নেহ পায় এ স্নেহ তার তুল্য, সম্ভবত তার কিছু বেশী। এই অভাজনের প্রতি ওই খ্যাতিমান গুণবন্ত মানুষটির কী পরিমাণ উদারতা ছিল তার ধারণা দেবার জন্য কয়েকটি তথ্যের উল্লেখ করি। দিলীপকুমারের কলকাতা প্রবাসজীবনে একটা সময় গেছে যখন তিনি আমাকে ছাড়া কোনো আসরে গান গাইতে যেতেন না, যখনই যেখানে উল্লেখযোগ্য কোনো অনুষ্ঠানে যেতেন আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে ভুলতেন না। এইভাবে দিলীপকুমারেরই মধ্যস্থতায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রমুখ দেশমান্য ব্যক্তিদের খুব নিকট-সান্নিধ্য থেকে সন্দর্শন করবার সুযোগ পাই। বিশেষ করে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে এককালীন 'বিচিত্রাভবন' নামে যে লালবাড়ীটি বিদ্যমান সেখানে এক দফায় এবং বরানগর 'গুপ্তনিবাসে' আর এক দফায় দিলীপকুমারের দৌতো কবির সঙ্গে আমাদের যে মুখোমুখি পরিচয় ও সংগীত বিষয়ে বার্তা-বিনিময় হয়েছিল তার স্মৃতি কখনই ভোলবার নয়। দিলীপকুমারের মধ্যবর্তিতার জন্যই আমা-হেন তরুণ বয়সী নগণ্য ব্যক্তির পক্ষে এইসব দিকৃপালদের নাগাল পাওয়া সম্ভব হয়েছিল, সে কথা বলাই বাহুল্য। সেই সময়ে তাঁর অনুগ্রহ না পেলে কলকাতার উচ্চতর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে বৃহত্তর জীবনের স্বাদ লাভের সুযোগ আমার কাছে অনেক দিন অবরুদ্ধ হয়ে থাকতো। একশো বার স্বীকার করব দিলীপকুমার বা দিলীপদাই আমার সামনে প্রথম কলকাতার জ্ঞানীগুণী মহলের দরজা খুলে দেন।

যে সময়ের কথা বলছি সেটা হলো ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৯ অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার বৎসর পর্যন্ত কমবেশী চার-পাঁচ বছর কাল। এই সময়মধ্যে তাঁর সঙ্গে কতবার দেখা হয়েছে এবং কত যে পত্র-বিনিময় হয়েছে তার সীমা সংখ্যা

নেই। তিনি ছিলেন অক্লান্ত পত্রলেখক—পণ্ডিচেরী থেকে তাড়া-তাড়া চিঠি লিখতেন। তাঁর চিঠি পেয়ে খুশী হতুম ঠিক, আবার আতঙ্কগ্রস্তও হতুম। তাঁর চিঠির অন্তহীন প্রবাহের সঙ্গে সমান তালে তাল রেখে চলা রীতিমত একটা কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। জবাব দিতে দিতে হিমসিম খেয়ে যেতে হতো। পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হতে তিনি তাঁর স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ তাঁর "তরঙ্গ রোধিবে কে ?" উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডের একটি ভাগ আমাকে উৎসর্গ করেন এবং পরে তাঁর 'স্মৃতিচারণ' নামক আত্মজীবনীমূলক দুই খণ্ড গ্রন্থের একটি গোটা খণ্ড আমার নামে উৎসর্গিত হয়। আমিও কৃতজ্ঞতার প্রতিদান হিসাবে আমার 'সাহিত্যের সমস্যা' নামক প্রবন্ধের বইটি তাঁকে সমর্পণ করি। আমাদের দুজনার সৌহার্দ্য শুধু ভাবরাজ্যেই সীমিত ছিল না, দিলীপদা আমার বেকারত্ব দশা ঘুচিয়ে আমাকে আর্থিক নিরাপত্তায় প্রতিষ্ঠিত করতেও সচেষ্ট হন। তিনি আমাকে রিপন স্কুলে (অধুনা সুরেন্দ্রনাথ স্কুল) একটি শিক্ষকতার কাজ জুটিয়ে দেন। ঢাকা অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে কর্মভার গ্রহণের আগে পর্যন্ত—প্রায় আড়াই বছর অমি এই শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত ছিলাম।

মতদ্বৈধের সূচনা

কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ দিলীপকুমারের সঙ্গে আমার গভীর প্রীতি-স্নেহের সম্পর্ক শেষ অবধি স্থায়ী হয়নি। সংগীত, সাহিত্য ও ধর্ম সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী ও মতামতের প্রশ্নে আমাদের সম্পর্কে চিড় ধরে যায় এবং একসময়ে তা ছিন্ন হয়। সম্পর্কছেদের ব্যাপারে আমি দিলীপদা'কে দায়ী করব না। এক্ষেত্রে আমার দোষটাই বোধহয় বেশী ছিল, কারণ একদা আমার স্বভাব ছিল একবগ্‌গা, একরোখা ; নিজের যুক্তিবুদ্ধিটাকেই প্রবলভাবে আঁকড়ে ধরে থাকতুম, অপরের মতটাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনতে চাইতুম না। তা সে অপর ব্যক্তি যতই শ্রদ্ধেয় আর মান্য হোন। তার উপরে ছিল সংসারজ্ঞানের অপরিপক্বতা, মনুষ্যচরিত্র সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টির অভাব। না জেনে আমি দিলীপদা'র সবচেয়ে অভিমানের জায়গাটিতে ঘা দিয়েছিলাম—তাঁর গানের প্রতিকূল সমালোচনা করেছিলাম। তাঁর গান, স্বরক্ষেপের পদ্ধতি, পরিবেশন প্রণালী সবই আমার সমালোচনার বিষয়ীভূত হয়েছিল এবং আমার সে মনোভাবকে আমি প্রকাশ্যে ভাষা দিতেও ইতস্ততঃ করিনি। শুধু প্রবন্ধ-নিবন্ধেই যে এই মত ব্যক্ত করি

তা নয়, দিলীপদা'র কাছে লেখা একাধিক চিঠিতেও ওই মতের জানান দিই।

সেইটাই আমার কাল হয়েছিল। আমি অকপট বিশ্বাসে আমার স্বাধীন মত ব্যক্ত করেছিলুম এই ভেবে যে, দিলীপদার মত মুক্ত মনের মানুষ ও বহুদর্শী ভাবুক আমার সেই সমালোচনাকে গায়ে মাখবেন না, হয়ত উড়িয়েই দেবেন। কিন্তু তিনি যে শিশুর মত অভিমানী-চিত্ত এবং ভিতরে ভিতরে অতিশয় প্রশংসাকাতর এক মানুষ তা আমি কেমন করে বুঝব ? তিনি যে সর্বদাই আমার কাছ থেকে কেবল একটানা প্রশংসাই আশা করে এসেছেন, অপ্রশংসায় তাঁর মন নিতান্ত মারাত্মক ভাবে সংকুচিত হয়ে থাকে সে-বিষয়ে সঠিক ধারণায় উপনীত হওয়ার আগে আমার আরও বেশী সংসার-অভিজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু হায়, সেখানেই ছিল আমার স্বভাবের আসল খাঁকতি। লোকচরিত্র আমি ধরতে পারতুম না, আজও পারি এমন দাবি করব না। তবে ঠেকে শিখে শিখে এখন আগের চেয়ে অনেক বেশী সতর্ক হয়েছি সে-কথা বলতে পারি।

এসব অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ লিখতে ইচ্ছা হয় না, লিখতে গিয়ে নিজের ভিতর থেকেই যেন কেমন বাধা পাই। বিশেষ, যাঁর সম্বন্ধে আলোচনা, তিনি এখন আমাদের সমস্ত ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেছেন। মৃতের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশের কি কোন অবকাশ আছে ? না, সেটা উচিত হয় ? এসব বিষয়ে 'চলা অবিরাম' নামক আমার আত্মজীবনীধর্মী রচনায় আমি অপেক্ষাকৃত বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। বইটি প্রকাশের অপেক্ষায়। বই বেরলে অনুসন্ধিৎসুরা বইয়ের সংশ্লিষ্ট অংশ নেড়েচেড়ে দেখতে পারেন।

আমি গোড়াতেই বলেছি যে, দিলীপকুমারকে অমি গায়ক অপেক্ষা সুরকার হিসাবে বেশী মূল্য দিই। কেন তাঁর গায়ক সত্তা আমার কাছে তাদৃশ প্রণিধান-যোগ্য নয় সে-বিষয়ে বিস্তৃত সমালোচনার মধ্যে আমি এখানে যেতে চাই না। কেন যেতে চাই না তার কারণ একটু আগেই ব্যক্ত করেছি পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদের বয়ানের মধ্যে। যে-মানুষ সদ্য প্রয়াত হয়েছেন তাঁর শোকাবহ তিরোধানের বিমর্ষ ছায়ার তলায় বসে তাঁর শিল্পের দোষ-ত্রুটি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে আমার বাধছে। ভারতীয় সংস্কার অনুযায়ীই বাধছে। তবে তাঁর সুর-যোজনার কৃতিত্ব সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত হতে কোনো বাধা নেই। সেই কাজটাই এখন করতে চাই।

দিলীপকুমার সুর-রচনার দিক দিয়ে বাংলা গানকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করে-

ছিলেন। প্রথমতঃ তিনি তাঁর পিতৃদেব দ্বিজেন্দ্রলালের কোরাস গানগুলিকে এ একালের যৌথ গানের উপযোগী উচ্চারণ ও স্বরক্ষেপ অনুযায়ী (পাশ্চাত্য চার্চ মিউজিকের ধরনে) অনেক বেশী জোরালো ভঙ্গীতে পরিবেশনের রীতির প্রবর্তন করেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, নানা দেশের সুরভঙ্গীর অনুসরণে বাংলা গান রচনা করে তিনি বাংলা গানের ডালিটিকে ভরিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছিলেন নানা ভাবে। এ বিষয়ে তিনি ছিলেন কাজী নজরুল ইসলামের সহযাত্রী—এই দুজনাই বিদেশী গানের সুরে বাংলা গানের ভাণ্ডার সবচেয়ে সমৃদ্ধ করে গেছেন এযাবৎ। বিদেশী সুরভঙ্গীর আদলে রচিত দিলীপকুমারের কয়েকটি গান—ক্রীশ্চিয়ান 'আভে মারিয়া' গানের বাংলা তর্জমা, বুলবুল মনফুল সুরে ভেসে (রুশ লোক-সঙ্গীত), চাঁদের হাসি বাজলো আকাশ ছেয়ে (ফরাসী সুর), অকূলে সদাই চল ভাই ছুটে যাই (ইংরেজী সুর), বন্ধন নাশো মন্ত্রবরে, অথবা ঘুম যাই মা, আজ ঘুম যাই মা (জার্মান সুর), তোমারি পানে অকূল টানে (ইতালীয় সুর), মধুর স্বরে শয়নে স্বপনে (জিপসী সুর), মা তোর ঐ হাসি (প্রসিদ্ধ মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গ গায়ক পল রবসন অনুসরণে), ইত্যাদি। এসব বিচিত্র ধরনের বৈদেশিকী ভঙ্গীর গান থেকেই তাঁর সর্বত্রগামী সুরান্বেষী মনটির একটা স্পষ্ট আভাস পাওয়া যেতে পারে। গানের জগতে তিনি ছুৎমার্গে বিশ্বাস করতেন না—সুরের অবাধ চলাচল আর মুক্ত আদান-প্রদানের নীতির উপর তিনি তাঁর সঙ্গীতের আদর্শটিকে স্থির প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। তাঁর 'অনামী', 'ত্রিবেণী', 'সুরবিহার' প্রভৃতি বইতে তাঁর এসব গানের নমুনা দেওয়া আছে।

বুর্জোয়া ভাবুক

জীবন ও মানুষ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে দিলীপকুমার ছিলেন ষোল-আনার উপরে আঠারো-আনা বুর্জোয়া ভাবুক। বিত্ত-সচ্ছলতার আবহাওয়ায় আবাল্য বর্ধিত এবং ধনিক ও অভিজাতদের দ্বারা সর্বদা পরিবেষ্টিত দিলীপকুমার যে-পরিমণ্ডলে বিচরণ করতেন তার মধ্যে মানবতা ও উদারতা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল কিন্তু সে-মানবতা ও উদারতা হলো বিগত যুগের বুর্জোয়া লিবারেলিজম ঘরানার—এ কালের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তার যোগ কম। এ কালের প্রলেটারিয়ান সাহিত্যের প্রতি তাঁর আদৌ উৎসাহ ছিল না, বরং এক প্রকারের বিরূপতা

ছিল। এবং এ যুগের সংগ্রামী গণতান্ত্রিক সমাজবাদী চিন্তা সম্পর্কে তাঁর মনে যে-পরিমাণ বিমুখতা ছিল ঠিক সেই পরিমাণেই আত্যন্তিক অনুরাগ ছিল ধর্মের প্রতি। ধর্ম নিয়ে তিনি একটু বেশী বাড়াবাড়ি করতে ভালবাসতেন বলেই আমার ধারণা। তিনি শেষদিকে সব রকমের গানকে কীর্তন আর ভজনের এলাকায় টেনে না আনা পর্যন্ত স্বস্তি পেতেন না, তাঁর মতে ভজনই হলো শ্রেষ্ঠ গান। এ মতে সায় দেওয়া আমার পক্ষে শক্ত ছিল।

আমি আজও বুঝতে পারি না যিনি একসময়ে বার্টর‍্যাণ্ড রাসেল, রোমাঁ রোলাঁ প্রমুখ মানবদরদী সংগ্রামী চিন্তানায়কদের সঙ্গে সঙ্গ করেছেন তিনি কী করে গণপ্রেমী সংগ্রামের পথ ছেড়ে ধর্মের কোলে আত্মসমর্পণ করতে পারলেন? তাঁর পণ্ডিচেরী প্রযাণ ও পরে পুণায় নিজের স্বতন্ত্র আশ্রম প্রতিষ্ঠা তাঁকে জন-জীবন থেকে কত দূরে সরিয়ে নিয়েছিল তার আন্দাজ বোধ হয় তাঁর কাছেও স্পষ্ট ছিল না। আজীবন সুবিধাভোগী কায়েমী স্বার্থবাদীদের মহলেই কাটিয়ে গেলেন, জনজীবনের স্তরে কখনও নেমে এলেন না। আমার কেমন যেন এক এক সময় মনে হয় ধর্ম সম্পর্কে তাঁর অতিরিক্ত প্রাণের টান বলে যা তিনি প্রচার করতেন তা তাঁর স্বভাবসম্মত ছিল না। প্রত্যয়ের গভীরতা কিংবা আন্তরিক বিশ্বাস অপেক্ষা তাতে দেখানোপনার ভাবটাই বেশী ছিল বলে সন্দেহ হয়। আজীবন তিনি প্রদর্শনবাদী ব্যাধিতে ভুগেছেন, শেষজীবনেও এই exhibitionism-এর কবল থেকে তিনি মুক্তি পাননি।

যাই হোক, আমি আবার সমালোচনার এলাকায় চলে এসেছি। যা করব না বলে সংকল্প করেছিলুম অতর্কিতে সেই সংকল্প ভঙ্গ করে পুনরায় সমালোচনার ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছি। সুতরাং আলোচনার এইখানেই ইতি ঘটাই।

মিশ্র-সংগীত

ভারতীয় সংগীতের দু'টি স্বীকৃত প্রসিদ্ধ রূপ : রাগসংগীত ও লোকসংগীত। ভারতীয় সংগীতের বর্ণালীর একপাশে আছে রাগ বা মার্গসংগীত। অন্যপাশে আছে লোকসংগীত। এই দুই প্রান্তীয় মৌলিক সংগীতরূপের মাঝের স্তর-গুলিতে যে গীতরূপগুলি বিদ্যমান, সেগুলিকে বলা যেতে পারে মিশ্র-সংগীত। রবীন্দ্রসংগীত, দ্বিজেন্দ্রসংগীত, রজনীকান্ত ও অতুলপ্রসাদের গান, নজরুলগীতি, আধুনিক বাংলা গান প্রভৃতি সবই এই মিশ্র সংগীতের পর্যায়ে পড়ে।

মিশ্র-সংগীতগুলিকে ভারতীয় সংগীতের বিশুদ্ধরূপ বলা যায় না, সেগুলি সবই মিশ্রণজাত সংগীতের প্রকারভেদ মাত্র। হয় সেগুলির মধ্যে রাগসংগীতের আমেজ আছে, নয় লোকসংগীতের আমেজ—অথবা দুই ধরনের আমেজই একসঙ্গে বর্তমান। কখনও কখনও ভিন্নদেশীয় সূত্র থেকেও স্বরের মিশাল এসে মিশ্র-সংগীতের অবয়বে প্রবেশ করেছে। যেমন, রবীন্দ্রনাথের কোনো-কোনো গানে আইরিশ বা ইতালীয় মেলডির সুর প্রবেশ করেছিলো, দ্বিজেন্দ্র-রচিত কোরাসের সুরে ইউরোপীয় চার্চ-মিউজিকের ধাঁচ, কিংবা নজরুলের কিছু-কিছু গানের সুররূপের ভিতর 'মুরিশ মেলডি' কিংবা 'সাউথ-সী আইল্যাণ্ডস্'-এর সুরের প্রভাব। মোট কথা, 'মিশ্র-সংগীত' নামটির মধ্যেই তার মিশ্র প্রকৃতির প্রকাশ।

রবীন্দ্রসংগীতের প্রথমদিকের রচনাগুলিতে রাগসংগীতের সবিশেষ প্রভাব বিদ্যমান ছিল। ধ্রুপদাঙ্গ ব্রহ্মসংগীত-পর্যায়ের অনেক গানই বিশেষ-বিশেষ হিন্দুস্থানী ক্লাসিকাল গানের হুবহু অনুসরণে রচিত। যেখানে হুবহু অনুসরণ নেই, সেখানেও হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ গানের রূপ ও রীতি সজ্ঞানে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এর পরে এমন একটা সময় এলো যখন রবীন্দ্রনাথ হিন্দুস্থানী ক্লাসিকাল গানের মডেল ছেড়ে একান্তরূপে বাংলার লোকসংগীতের সুরাদর্শকে আশ্রয় করলেন। এই শতাব্দীর গোড়া থেকে শুরু করে দুইদশক-আড়াইদশক কাল জুড়ে রবীন্দ্রসংগীতের সুরের গঠনে বাংলার লোকসংগীতের সুরের লীলারই প্রাধান্য। বিশেষ, বাউল সুরের। জীবনের শেষপর্যায়ের গানে অবশ্য কোনো বিশেষ সুররূপকে তিনি আর আঁকড়ে থাকেননি, না হিন্দুস্থানী ক্লাসিকাল

সুরভঙ্গি, না লোকসংগীতের সুরাদর্শ। এই অধ্যায়ের গান-রচনায় নানারকমের সুরভঙ্গিকেই তিনি গ্রহণ করেছেন, দেখা যায়। বিদেশী-দেশী-ভিন্নপ্রদেশীয় সব ধাঁচের সুরেরই প্রয়োগ চোখে পড়ে এই-পর্যায়ের সুররচনার ধারা-ধরনের ভিতর। ভিন্নপ্রদেশগত সুরের নমুনার মধ্যে বিশেষভাবে কর্ণাটী ঘরানার সুরভঙ্গির উল্লেখ করতে হয়। তার মধ্যেও আবার মহীশূরী ভজনের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

অবরোহী সংগীত

একদিকে রাগসংগীত অন্যদিকে লোকসংগীত, এই দু'টিই হলো ভারতীয় সংগীতের মৌলিক বা খাঁটি রূপ। বাদবাকি মধ্যবর্তী-পর্যায়ের সুররূপগুলিকে ওই দুই মৌলিক সুররূপের প্রভাবিত সংগীত মনে করা যেতে পারে। সেইদিক থেকে এই মিশ্র-সংগীতগুলিকে যদি অবরোহী (derivative) সংগীত আখ্যা দেওয়া যায় তাহলে কিছু অন্যায় বলা হয় না। অবরোহী বলেই এগুলিকে ঠিক খাঁটি সংগীত বলা যায় না—এগুলি হলো মৌলিক বা আদি সুররূপের কাঠামো থেকে আহরিত মিশ্র-সুররূপ। খেয়াল থেকে নেওয়া বাংলা খেয়ালকে বলে 'ভাঙা খেয়াল'। এ-ও অনেকটা সেইজাতীয় 'ভাঙা' গানের শ্রেণী।

ভারতের প্রত্যেক প্রদেশেই এই মিশ্র-সুরগুলির এক-এক রূপ। বাংলার মিশ্র-সুররূপগুলির কথা আগেই বলেছি। উত্তর ভারতে এই পর্যায়ের গানের শ্রেণীর মধ্যে পড়ে—কাজরী, হোরী, গীত-গজল-কাওয়ালি, লাউনি, পাহাড়ী প্রভৃতি। গুজরাটে মাঁঢ়, গরবা গান ; পাঞ্জাবে দেহাতী ধুন ও আধুনিক পর্যায়ের নানান ধরনের গান ; মহারাষ্ট্রে গীত ও ভজন ; দক্ষিণী রাজ্যগুলিতে কর্ণাটী সুরভঙ্গি থেকে আহরিত আধুনিক পর্যায়ের হরেক রকমের গান। উল্লিখিত সবধরনের গানের মধ্যেই কিছু-না-কিছু রাগসংগীতের সুরের রেশ খুঁজে পাওয়া যাবে, কিংবা লোকসংগীতের সুরের আমেজ, অথবা এককালীন দুই সুরভঙ্গিরই খানিকটা করে প্রভাব। তবে এগুলি হলো প্রকৃতিগতভাবে মিশ্র-সুরের গান। অর্থাৎ এসব নমুনাকে কোনোক্রমেই রাগসংগীত বা লোকসংগীতের কোঠায় ফেলা চলবে না, এগুলিকে মূলতঃ মিশ্রণজাত গানের নমুনা হিসেবেই ধরতে হবে।

এবং যেহেতু এগুলি হলো মিশ্রণজাত গান, সেই কারণে এগুলির সঙ্গে আধুনিক রুচির খুব নিকট-সম্বন্ধ। আধুনিককালীন শ্রোতারা ঠিক এইধরনের

গানই বেশি শুনতে ভালোবাসেন, অবিকৃত যা শুদ্ধ রাগসংগীত শুনতে তেমন পছন্দ করেন না। আবার একেবারে খাঁটি নির্ভেজাল গ্রাম্য সুরের লোকগীতিরও তাঁরা তেমন সমঝদার নন। তাঁরা চান আধুনিক গানের ভিতর এখানে-সেখানে লোকগীতির খোঁচ, যা তাঁদের প্রাণ ও কানকে তৃপ্তি দিতে পারে, দিয়ে থাকে।

এইসব মিশ্র সুররূপের আজকাল যথেষ্ট চাহিদা। রেডিওতে, দূরদর্শনে, সিনেমায় সর্বত্র এইজাতীয় গানের জনপ্রিয়তা। রেডিওতে 'সুগমসংগীত' বলে যে একধরনের গান বেশ কিছুকাল ধরে চালু আছে, তা আসলে রাগসংগীত ও লোকসংগীতের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার থেকে এককালীন আহরিত এই শ্রেণীর মিশ্র-গান। এইসব গানে টপ্পা-ঠুংরী-ভজন-গীত-গজল-কাওয়ালি-হোরী-কাজরী, দেহাতী ধুন প্রভৃতি নানান জাতের সুরভঙ্গির আদল একাধারে মেলে। উন্নাসিকেরা যাই বলুন, এসব গান শুনতে বেশ ভালোই লাগে, হাল্কাচালের গান বলে এগুলির প্রতি নাক সিঁটকোবার কোনোই কারণ থাকতে পারে না। এইসব গানের সুররূপের ভিতর ভারতীয় সংগীত-ঐতিহ্যের একটা ধারাবাহিকতার যোগ রয়েছে, আছে আত্মীয়তার সম্পর্ক। 'পপ' বা 'ডিস্কো' গানের মতো এগুলি উট্‌কো গান নয় বা দেশীয় ধারার সুরাদর্শ থেকে বিচ্যুত নয়। হাল্কা হলেই গান খারাপ হয় না, দেখতে হবে তাতে মেলডি আছে কিনা, আর সেই মেলডি জাতীয় সাংগীতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগযুক্ত কিনা। এই দু'টি সর্ত পরিপূরিত হলে হাল্কাচালের হয়েও গান প্রাণ-মন ভরিয়ে দিতে পারে।

সিনেমার গান

সিনেমার গান সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। প্রকৃতিগতভাবেই সিনেমার গান কিছু হাল্কা ধাঁচের হয়ে থাকে। তা বলে তার সব গানই বাতিল বলে গণ্য করা চলে না। এমন অনেক সিনেমার গান আছে, যা কান পেতে বারবার শুনতে ইচ্ছা করে। এমনকি হিন্দী ছবির গানও এই মন্তব্যের বহির্ভূত নয়। বরং হিন্দী ছবিতেই আকর্ষণীয় গানের সংখ্যা বেশী। নওসাদ, শঙ্কর জয়কিষেণ, শচীন দেববর্মণ, আর ডি বর্মণ প্রমুখের সুর দেওয়া এমন বহু হিন্দী ছবির গান আছে, যা বারবার শুনেও তৃপ্তি হয় না। আবারও শুনতে ইচ্ছা করে। তেমনি বাংলা ছায়াছবিতে রাই বড়াল, পঙ্কজ মল্লিক, অনুপম ঘটক, কমল দাশগুপ্ত, হিমাংশু দত্ত, দুর্গা সেন, রবীন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সংগীত-পরিচালকদের সংযোজিত সুরের

গানগুলিও যথেষ্ট তৃপ্তিবিধায়ক। পণ্ডিত রবিশঙ্কর অবশ্য সিনেমা ছবিতে খুববেশি সুর-সংযোজন করেননি, খুব অল্পসংখ্যক ছবিতেই তিনি সংগীত পরিচালনা করবার অবসর পেয়েছেন। তবে আর-কোনো ছবির সুরযোজনা যদি তিনি নাও করতেন, তাঁর 'পথের পাঁচালী'র সুর-পরিচালনা একাই একশো। এ-রকম অনবদ্য আবহসংগীত আর-কোনো ছবিতে শুনেছি কিনা সন্দেহ। আবহসংগীত অবশ্য গান নয়; তবে সুর তো বটে। সুরের জাদু যখন মনপ্রাণ অধিকার করে তখন সে-সুর কণ্ঠাশ্রিতই হোক আর যন্ত্রাশ্রিতই হোক, তার খেয়াল থাকে না। যন্ত্র আর কণ্ঠে তফাৎ কী, কণ্ঠও তো একপ্রকার যন্ত্রই বটে!

তেমনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্র-পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের পরিচালিত 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ও 'হীরক রাজার দেশে'র গান। এ-রকম অভিনব চালের স্বাদু সুরের গান ভারতীয় ছবিতে আর শুনেছি বলে মনে পড়ছে না। উল্লিখিত দুই ছবিরই গানের অপূর্ব সুরভঙ্গির স্বাদুতার মূলে আছে এই ঘটনা যে, সত্যজিৎ রায় এইসব গানের সুর-রূপায়ণে কর্ণাটী সংগীতের ভাণ্ডার থেকে দু'হাতে সুর আহরণ করেছেন। প্রত্যেকটি গানেব মধ্যেই কোনো-না-কোনো কর্ণাটী সুরের ছায়া। বাংলা গানে কর্ণাটী সুরভঙ্গির প্রথম প্রয়োগ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও কাজী নজরুল, তারপর করলেন এই সত্যজিৎ। তবে প্রথম দুই সুরকারের সঙ্গে সত্যজিতের পার্থক্য এখানে যে, তিনি এই সুব-প্রয়োগের ক্ষেত্র হিসাবে বিশেষ করে সিনেমার পর্দাকে বেছে নিয়েছেন। বাংলা সিনেমায় কর্ণাটী সুরভঙ্গির প্রবর্তক-রূপে সত্যজিতের ভূমিকা নিশ্চিতই একজন পথিকৃতের

তবে সিনেমার সব গানই নির্বিচারে ভালো বলা চলবে না। এ-বিষয়ে যে যথেষ্ট সতর্কতার প্রয়োজন আছে, সে-কথা বিশদ করে বলার আবশ্যকতা নেই। বিদেশী 'পপ' 'রক-অ্যাণ্ড-রোল' 'ডিস্কো'-জাতীয় যন্ত্র-সংগীতের কোলাহল-মণ্ডিত একধরনের গান আজকাল সিনেমায় হামেশাই শুনতে পাওয়া যায়। এগুলি অপসংস্কৃতির ক্ষতিকর নমুনা হিসেবে সর্বপ্রযত্নে বর্জনীয়। এই শ্রেণীর গানে ভারতীয় সংগীতের সুরের লেশমাত্র ছোঁয়া খুঁজে পাওয়া যাবে না, বিদেশী সুরভঙ্গিরও অপকৃষ্ট নমুনাগুলিই শুধু এগুলিতে পরিবেশিত হতে দেখা যায়।

কি সিনেমায় কি স্টেজে কি সাধারণ গানের আসরে এই-জাতীয় গান যদি ক্রমাগত প্রশ্রয় পেতে থাকে তাহলে ভারতীয় সংগীত-ঐতিহ্যে কর্ষিত শ্রবণ-

অভ্যাসের ভরাডুবি ঘটতে বাধ্য। ভালোমন্দ নির্বিশেষে কান যদি একবার যে-কোনোরকমের স্বরভঙ্গিতে ক্রমাগত অভ্যস্ত হয়ে যেতে থাকে, অপকৃষ্ট সুরের অনুপ্রবেশ বা অন্তঃসঞ্চারকে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিরোধ না ক'রে, তাহলে এমন একটা সময় আসতে পারে যখন কান আর সুর-বেসুরের তফাৎ ধরতে পারবে না, আসুরিক গানকেও স্বর্গীয় গান মনে করার কুহকে মজে শ্রোতা সুরের জগৎ থেকেই নির্বাসিত হয়ে পড়বে। কুসঙ্গে পড়লে যেমন মানুষ খারাপ হয় তেমনি অবিরত সুরবিহীন গান শুনলেও রুচির অধঃপতন হয়। উৎকৃষ্ট গানে তখন বিস্বাদ জন্মায়, পরন্তু নিকৃষ্টস্তরের গানে কান আনন্দ পায়। এরকম অবাঞ্ছিত সম্ভাবনা যাতে কখনও না ঘটে তার জন্যে 'পপ' 'রক-অ্যাণ্ড-রোল' 'ডিস্কো'-জাতীয় গান শোনার ব্যাপারে খুবই সাবধানতা আবশ্যক। গানের জগতে অপ-সংস্কৃতির ছলাকলা-সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকার প্রয়োজন কোনো সময়েই ফুরোবার নয়।

গণসংগীত

বাংলা মিশ্র-সংগীতের সাম্প্রতিকতম রূপটি হলো গণসংগীত। গণসংগীত প্রায়শই যৌথ-সংগীতের আকারে পরিবেশিত হয়। তা বলে গণসংগীত আর যৌথ-সংগীত একার্থ নয়। যৌথ-সংগীতের যথার্থ ইংরেজী প্রতিশব্দ হলো 'কোরাস'। সংস্কৃত প্রতিশব্দ 'বৃন্দগীতি'। অনেক কণ্ঠ একত্র মিলিয়ে যে-গান তা বৃন্দগীতি বা সম্মেলক গান। তবে কোরাস কথাটাই বাংলায় বহুল ব্যবহৃত। বাংলা গানের অনুষঙ্গে কোরাস আর গণসংগীতের মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে, কোরাস জাতীয়-ভাবোদ্দীপক গান, আর গণসংগীত সমাজতন্ত্রের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ সম্মেলক বা একক গান। গণসংগীতের সম্মেলক রূপটাই সমধিক প্রচলিত।

অবিভক্ত বাংলায় স্বাধীনতা পাওয়ার আগে পর্যন্ত কোরাস গানেরই প্রাধান্য ছিল। যেহেতু স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতার আকূতি এই গানগুলির মূলকথা, সেই-কারণে তখনকার মুক্তি-আন্দোলনের ভাবের আবহের সঙ্গে এই গানগুলির বাণী ও সুর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে গিয়েছিলো। তবে চল্লিশের দশক থেকে কোরাস গানের প্রচলন কমে যায় এবং তার জায়গায় দেখা দেয় সমাজতান্ত্রিক ভাবনা-চেতনায় অনুপ্রাণিত গণসংগীত নামক নয়া এক সাংগীতিক শ্রেণীরূপ। প্রকৃতপ্রস্তাবে কোরাসের কোটর থেকেই গণসংগীতের শ্রেণীরূপের উদ্ভব।

গণসংগীত রচয়িতাদের অব্যবহিত পূর্ববর্তী গীতি ও স্বরকার হলেন কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁরই ধারা বেয়ে চল্লিশের দশকে দেখা দিলেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, সলিল চৌধুরী, বিনয় রায়, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, পরেশ ধর প্রমুখ গণসংগীতের গীতি ও স্বরকারগণ। এইসব রচয়িতারা নিজেদের তৈরি গানে ও কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য, বিমলচন্দ্র ঘোষ, দিনেশ দাস, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ গণমুখী ও গণদরদী কবিদের কবিতায় সুর-আরোপ দ্বারা সেগুলিকে গণসংগীতের আকারে পরিবেশন করে বাংলা সংগীতের এক নতুন শ্রেণীরূপের জন্ম দিলেন। পরে এই-পথে আরও অনেকে পরিক্রমা করেছেন, যথা অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, শম্ভু চৌধুরী, দিলীপ সেনগুপ্ত, মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, শুভেন্দু মাইতি, স্বপ্না ভট্টাচার্য প্রমুখ।

গণসংগীত বর্তমানে যে-রীতিতে ও যে-ভঙ্গিমায় পরিবেশিত হয় সে-সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। প্রায়ই দেখা যায়, এইসব গানের স্বরাংশে প্রকৃত সুরের রস কম, গায়ন-প্রণালীতে একধরনের কৃত্রিম রীতি সচরাচর অনুসরণ করা হয়। যেহেতু সর্বসাধারণের মনে সমাজচৈতন্যের আবেদন-সৃষ্টি গানগুলির লক্ষ্যে একটা বড়রকমের উজ্জীবকরূপে কাজ করে, সেই-কারণে এগুলির পরিবেশন-প্রণালীতে একটা নাটকীয় ভাব জাগানোর সচেতন চেষ্টা করা হয় প্রায়শঃ। আর এই নাটকীয় ভাব-সৃষ্টির উপায়রূপে হেঁচকি দিয়ে গান করাটা যেন গণসংগীত পরিবেশনকারীদের একটা মজ্জাগত রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রেওয়াজ তো নয় রীতিমতো একটা মুদ্রাদোষ। "হেইয়ো হো" "হেই জোয়ান", প্রভৃতি কাটা-কাটা কথার তরঙ্গ সৃষ্টি করে আর সেগুলিকে staccato রীতিতে গেয়ে এই ধারণাটাই শ্রোতার মনে সঞ্চারিত করবার চেষ্টা করা হয় যে, উদ্দীপনা-সৃষ্টিই যখন গান-গুলির মূল উদ্দেশ্য তখন তার সুরের দিক দিয়ে সমৃদ্ধ হওয়ার বিশেষ কোনো দায় নেই, সেগুলির সুর নিতান্ত দীন হলেও কোনো ক্ষতি নেই। যে-কোনোরকমের একটা সাদামাঠা সুরের কাঠামোই তাদের অবলম্বন হওয়া যথেষ্ট। মিশ্র-সংগীতে আবার সুরৈশ্বর্যের কী প্রয়োজন ?

কিন্তু এ-ধারণা ঠিক নয়। মিশ্র-সংগীত হলেই তাকে সুরের দিক দিয়ে হ্যাড়া হতে হবে এটা ভ্রমাত্মক প্রত্যয়। শুধু গণসংগীত বলে কথা কেন, যে-কোনো-রকমের মিশ্র-সংগীতেরই সুর-রূপায়ণে সুরের আরও বেশি সমৃদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। আর তা করতে গেলেই রাগসংগীতের ও লোকসংগীতের অফুরন্ত উৎস থেকে

দু-হাত ভরে উপকরণ-উপাদান আহরণ করা অত্যাবশ্যক। এ-দু'টি মৌলিক শ্রেণীরূপ থেকে যতই আমরা উপাদান আহরণ করি না কেন, তাদের সঞ্চয় ফুরোবে না। গণসংগীতের বাণী-অংশে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রভাব থাকাই যথেষ্ট নয়, তার সুরাংশে আরও বেশি রাগের রস থাকা প্রয়োজন। এই কাজটি একেবারেই হচ্ছে না। কথায় ও সুরে উভয়ত কেবলই 'মার-মার কাট-কাট' ভাব, সুরভঙ্গিমায় রাগ-রাগিণীর বিশেষ কোনো আমেজ পাওয়া যায় না। গণসংগীতের এই সুর-দারিদ্র্য ঘোচাতেই হবে, যদি তাকে জনগণের কাছে সত্যি-সত্যি চিত্তাকর্ষক করে তুলতে হয়।

গণজীবনের সম্পৃক্ত গান হলেই তাকে সুরের দিক দিয়ে রিক্ত হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। সমাজতান্ত্রিক তথা গণতান্ত্রিক ভাবধারায় গণসংগীতের বাণী বা কথাংশ যতই সমৃদ্ধ হোক না কেন, তার দ্বারা তার সুরদারিদ্র্য ঢাকা যায় না, বা ঢাকা উচিত নয়। যাত্রাগানও তো জনজীবনের খুব কাছাকাছি সুরের শিল্প, কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যাত্রাপালার গানের সুরভঙ্গিমায় প্রায়ই ভারী-ভারী রাগ-রাগিণীর ভর চাপানো হতো। কই, সেসব রাগসমৃদ্ধ গান তো জনগণের গ্রহণ করতে কখনও বাধতো না—গভীর আগ্রহে গ্রামের মানুষ একদা সেসব গান শুনতো। সুরৈশ্বর্য গণসংগীতের সমাদরের পথে প্রতিবন্ধক নয়, উল্টো তার এক অপরিহার্য অঙ্গস্বরূপ।

তেমনি,অন্যান্য-ধরনের মিশ্র-সংগীতের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। আমরা আধুনিক গানই গাই আর যাই গাই, তার ভিতর যতবেশি রাগসংগীতের আমেজ ঢোকাতে পারা যায়, ততই মঙ্গল। লোকসংগীতের রসেও সেসব গানের বাঁধুনি আরও বেশি প্রাণবন্ত হওয়া দরকার। মনে রাখতে হবে, রাগসংগীত ও লোকসংগীত এই দু'টি হলো সংগীতের বুনিয়াদী শ্রেণীরূপ ; সুতরাং তাদের ভাবে আঞ্চলিক বা মিশ্র বা সমসাময়িক বা আধুনিক সকল স্তরের গানকেই আরও বেশি সুরময় করে তোলা আবশ্যক। আমরা বাণীর সমৃদ্ধিও চাই, সুরের সমৃদ্ধিও চাই। নিছক বাণী-অংশের সমৃদ্ধি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার দিন চলে গেছে। সর্বপ্রকার মিশ্র-সংগীতেই সুরের ঐশ্বর্য আরও অনেক বেশি প্রত্যাশিত।

গণসংগীতের স্বরূপ

'সংবর্ত' পত্রিকার এক সংকলনে আমি গণসংগীত ও লোকসংগীতের তুলনামূলক আলোচনা করে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। তাতে এই বলতে চেয়েছিলাম যে, লোকসংগীতের মূল গ্রামজীবনে প্রোথিত ও তার প্রকাশ কম-বেশী অমার্জিত ও স্বতঃস্ফূর্ত। পক্ষান্তরে গণসংগীতের জন্ম নাগরিক আবহাওয়ায় এবং তার প্রকাশ-শৈলীতে সচেতন শিল্পকর্মের ছাপ অতি স্পষ্ট, যে-বৈশিষ্ট্য লোকসংগীতে দেখা যায় না।

বিষয়টির আলোচনা করতে গিয়ে প্রসঙ্গতঃ কোরাস আর গণসংগীতের তুলনামূলক বিচারের প্রশ্নও এসে পড়েছিল। সেই সূত্রে আমি এই বক্তব্য রেখেছিলাম যে, বাংলা গানে কোরাস বলতে যে-শ্রেণীর গান বোঝায় তা স্বদেশপ্রেমের ঐতিহ্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। বস্তুতঃ কোরাস গান আর দেশপ্রীতির ভিত্তিতে রচিত সম্মেলক গান অভিন্ন বললেও চলে। দেশপ্রেম কোরাস গানে নানারূপে আত্মপ্রকাশ করে। যথা, স্বাধীনতার দুর্বার কামনা, পরাধীনতার বেদনা, ভারতের অতীত ঐতিহ্যের গৌরব, জাত্যভিমান, ঐক্য ও সংহতির আহ্বান, মুক্তি-সংগ্রামের প্রেরণা, ইত্যাদি। আমাদের দেশের প্রত্যেকটি প্রসিদ্ধ কোরাস গানেই উল্লিখিত ভাবগুলির কোন-না-কোন একটি ভাব অথবা একাধিক ভাব এককালীন পরিস্ফুট হতে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ, মুকুন্দ দাস এবং কাজী নজরুল—এঁদের প্রত্যেকেরই কোরাস গানের মূল ভাব জাতীয়তা-বোধক অর্থাৎ স্বদেশী।

অন্যদিকে গণসংগীতের মূল ভাবভিত্তি হলো সমাজতান্ত্রিক চিন্তাদর্শ, যা কিনা জাতীয়তার আদর্শ থেকে বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে রয়েছে। বিবর্তনের কয়েকটি স্তর অতিক্রম না করা পর্যন্ত জাতীয়তা সমাজতান্ত্রিকতায় রূপান্তরিত হওয়া সম্ভব নয়। কোন দেশ যখন পরাধীন থাকে, সে দেশে সমাজতন্ত্রের প্রবর্তন আশা করা অলীক স্বপ্ন মাত্র। দেশ মুক্তিপ্রাপ্ত হলে অথবা মুক্তিপ্রাপ্তির সূচনা দেখা দিলে তবেই শুধু সে দেশে সমাজতন্ত্রের অভ্যুদয় প্রত্যাশা করা চলে। আমাদের দেশে এইরকমের একটি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ চলতে থাকাকালে। জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ও বিপ্লবী আন্দোলন এই দুই

আন্দোলনের যুক্ত চাপে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসকের অবস্থা ক্রমেই কোণঠাসা হয়ে আসছিল এবং তার ফলে জাতীয় স্বাধীনতা প্রায় দ্বারপ্রান্তে এসে উপনীত হবার উপক্রম হয়েছিল। ঠিক সেই সময়ে বাংলায় গণসংগীত রূপ নতুন এক গীত শ্রেণীর উদ্ভব।

স্বাধীনতা লাভের আশু সম্ভাবনা আর সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা মণ্ডিত গণসংগীতের আবির্ভাব আপাতদৃষ্টিতে দুটি পরস্পর বিযুক্ত ঘটনা হলেও ঘটনা দুটি নেহাৎ অসম্পর্কিত নয়। দুয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষ কার্য-কারণগত যোগ রয়েছে। দেশ স্বাধীন হলে অথবা হবার সম্ভাবনা দেখা দিলে তবেই সমাজতন্ত্রের আদর্শ অনুযায়ী দেশ গড়ার কথা আসে। আগে জাতীয় মুক্তি তারপর ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যের অবসান, শোষক ও শোষিতের বিপুল ব্যবধানের উচ্ছেদ। হস্তপদ থেকে পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন হলে তখনই শুধু খোলা পরিবেশে আপন খুশীমত বিচরণ সম্ভব এবং দেশকে মনোমত বাসনা অনুযায়ী আকাঙ্ক্ষিত রূপ দেওয়া চিন্তনীয়।

ঠিক এই পরিপ্রেক্ষিতটি মনে রাখলে বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় কেন কোরাস গানের পরে গণসংগীতের জন্ম হয়েছিল। গণসংগীত কোরাস গানের ন্যায়সংগত পরিণতিমুখে সম্প্রতি-সৃষ্ট এক নয়া গীতশ্রেণী, যার অনুমোদন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর তৎকালীন বাস্তবভিত্তিক সামাজিক অবস্থা-ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত ছিল বলা যায়। কথাটা ঘুরিয়ে এই ভাবেও বলা যায় যে, গণসংগীত হলো কোরাস গানের ন্যায়ানুমোদিত অনিবার্য অনুসৃতি—একটির সঙ্গে আরেকটির যোগ অবশ্যম্ভাবী পূর্বপরের যোগ, অব্যবহিত পরম্পরার যোগ।

কোরাস গান আর গণসংগীতের সহাবস্থান যে হয় না এমন নয়। দেশ পরাধীন থাকা কালেও কোরাসের পাশে পাশে গণসংগীত রচনা করা চলে। প্রত্যুত, এই পর্বে আমাদের দেশে কিছু কিছু গণসংগীত রচিত যে না হয়েছে এমনও নয়। কিন্তু কোরাস গান আর গণসংগীতের একত্র সহাবস্থান স্বাভাবিক বলা চলে না। আগের কাজ আগে, পরের কাজ পরে। দেশে যখন স্বাধীনতার আন্দোলন চলতে থাকে তখন জাতীয় মুক্তির সমস্ত আবেগ একত্র সংহত হয়ে যৌথ গানের আকারে কোরাস গানে রূপ পাওয়াই প্রত্যাশিত। এবং সেইটেই স্বাভাবিক। তখন জাতীয় ভাবোদ্দীপক গানের পাশে পাশে সমাজতান্ত্রিক ভাবোদ্দীপক গণসংগীত লেখা হলে মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা

থাকে। এই জন্যই দেখা যায় কাজী নজরুল ইসলাম ভাবাদর্শের দিক দিয়ে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার একজন প্রধান উদ্গাতা হলেও তিনি যে সমস্ত যৌথ বা কোরাস গান লিখেছিলেন তার অধিকাংশই জাতীয়তাবাদী সংগীতের পর্যায়ে পড়ে। তিনি ইচ্ছা করলে গণসংগীত লিখতে পারতেন কিন্তু লেখেননি তার কারণ, সে সময় দেশ সাম্রাজ্যবাদী শাসক শক্তির সঙ্গে জীবন-মরণ যুদ্ধে নিয়োজিত ছিল সুতরাং জাতির সবটুকু ভাবাবেগ, সবটুকু উদ্যম সে-সময় জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের খাতে প্রবাহিত হওয়া অত্যাবশ্যক ছিল। তাই জেনেশুনেই তিনি তাঁর গানের অঞ্জলি ও সুরের উপচার একান্তভাবেই মুক্তিকামনার দুর্দম আকুলতা সূচক জাতীয়তাবাদী কোরাস গানের বেদীমূলে উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন। 'কারার ওই লৌহকপাট', 'শিকল পরা ছল', 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কোরাসগুলির সবকটিই জাতীয়তাবাদী কোরাস অর্থাৎ স্বদেশী সম্মেলক গান।

তবে এ কথা ঠিক নজরুল থেকেই গণসংগীতের যাত্রাপথের আরম্ভ। তিনি আর মুকুন্দদাস এ দুজনাই বিশেষ করে পরবর্তীকালের গণসংগীতের অভ্যাগমের ভূমি প্রস্তুত করেছিলেন। তাঁরা উভয়ে জমি তৈরী করে গিয়েছিলেন বলেই পরে গণসংগীত তার দাঁড়াবার মাটি খুঁজে পেয়েছিল। নজরুলের 'অন্তর-ন্যাশনাল' সংগীত, কৃষকের গান, শ্রমিকের গান, নওজোয়ানের গান ইত্যাকার রচনা নিঃসন্দেহেই পরবর্তীকালীন গণসংগীতের অগ্রদূত। এদিকে মুকুন্দদাসেরও কিছু কিছু রচনায় চাষীর শোষণ ও বঞ্চনার বেদনাকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, যদিচ সত্যের খাতিরে এ কথা বলা ভাল মুকুন্দদাসের দৃষ্টিভঙ্গী একান্তরূপেই জাতীয়তা আশ্রিত, তাঁর চিন্তাধারায় সমাজতান্ত্রিক ভাবনা-ধারণার উদ্বোধন কখনও ঘটেনি। তিনি ছিলেন অশ্বিনী দত্ত, জগদীশ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বরিশালের প্রখ্যাত ভাববাদী নেতাদের চ্যালা, জাতীয়তার ভাবধারায় তাঁরা আপাদমস্তক নিষ্নাত ছিলেন, এঁদের সময়ে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাচেতনা তাঁদের মানসগঠনে ছাপ ফেলার বিশেষ অবসর পায়নি। মুকুন্দদাস চাষীর দুঃখের গান লিখেছেন বাস্তবের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, সমাজতান্ত্রিক চিন্তাদর্শের প্রভাব বশত নয়। সেটা তখন সম্ভবও ছিল না।

২

এবার গণসংগীতের স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। গণসংগীতের বাণীরূপ নিয়ে এযাবৎ অনেক আলোচনাই হয়েছে, সেই তুলনায় তার সুরের কাঠামো, সুরের ধরন ইত্যাদি নিয়ে বিশেষ আলোচনা হয়েছে বলে মনে হয় না। এইটি হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। কারণ গণসংগীত এখন গীতশ্রেণী হিসাবে সমাজের ব্যাপক স্বীকৃতি পেয়েছে, তা জনসমাদৃত হয়েছে। তার আবেদন শহরের সীমা ভেদ করে এমনকি আভ্যন্তর গ্রামঘরেও এখন প্রবেশ করেছে। আজ দেখা যায় লোকসংগীতের কথার মধ্যেও গণসংগীতের ঢেউ এসে লেগেছে। এক সময়ে শেখ গুমানি দেওয়ান, রমেশ শীল, নিবারণ পণ্ডিত প্রমুখ প্রসিদ্ধ কবিয়াল ও লোক-গীতিকাররা গণসংগীতের ধাঁচে গান বেঁধে গণসংগীতের প্রভাবকে গ্রামের সীমায় সম্প্রসারিত করে দিয়েছিলেন। তাঁদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আজ দেখা যাচ্ছে নিতান্ত আটপৌরে বাউল গান আর আদিবাসী সংগীতের কথার মধ্যেও গণসংগীতের ভাবের আদল প্রবেশ করছে। ত্রিপুরা রাজ্যের একটি অজ-পাড়াগাঁয়ের বাউল গানর কথায় পাই—

আমার মনটা কেবল যেতে চায়
কাস্তে হাতুড়ী আর তারায়।

এ আর কিছুই প্রমাণ করে না, প্রমাণ করে এই কথা যে, গণসংগীত আজ একটি গীতরূপ হিসেবে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে, তার প্রভাব অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে। কোন গীতশ্রেণী বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে কিনা তা নিরূপণ করবার একটা প্রধান নিরিখ হলো যেখান থেকে ওই গানের সৃষ্টি হয়েছে তার গণ্ডী অতিক্রম করে তার আবেদন আরও অনেক বৃহত্তর সীমায় ছড়িয়ে পড়া। নদীর স্রোত যেমন তার উৎসের বন্ধন ছাড়িয়ে ও ছাপিয়ে ক্রমশ সমতলে প্রবাহিত হয়ে বিস্তৃত অঞ্চলে আপনাকে বিছিয়ে দেয়, তেমনি জনপ্রিয় গানও উৎসমুখে সীবাবদ্ধ থাকে না, তা ক্রমেই বৃহত্তর সীমানায় ব্যাপ্ত হতে হতে এমন এক পর্যায়ে এসে উপস্থিত হয় যখন লোকের মুখে মুখে সে গানের কলি গুঞ্জরিত হয়ে ফেরে। শহরে সে গানের উদ্ভব হলেও সেই সীমাতেই তার প্রভাব থেমে থাকে না, তা গ্রামে গঞ্জে, হাটে-বাটে, মাঠে-প্রান্তরে প্রসারিত হয়। রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলসংগীত এইভাবেই আজ তাদের উৎসভূমি কলকাতা শহরের সীমাবদ্ধ পরিধি অতিক্রম করে তাদের সুরকে আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে

দিতে পেরেছে।

গণসংগীত সম্পর্কেও ওই কথা। সলিল চৌধুরী, হেমাঙ্গ বিশ্বাস প্রমুখ সুপরিচিত গণসংগীতকারদের রচিত ও সুরারোপিত কিছু কিছু গান আছে যেগুলিকে অনায়াসে আজ জনসাধারণের সম্পদরূপে গণ্য করা যায়। জনগণের মধ্যে তাদের প্রচার ও প্রসার তাদের জন্মের ইতিহাসটিকে মুছে দিয়েছে। এমনকি এসব গানের কারা রচয়িতা তাও হয়ত আজ অনেকের অজানা। এটাও জনপ্রিয়তার একটা বড় নিশানা। আমাদের দেশের সংগীতের ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্যই এই যে, জনপ্রিয়তার স্রোতমুখে কালক্রমে রচয়িতার নাম হারিয়ে যায়। সেটা রচয়িতার দুর্বলতার প্রমাণ নয়, শক্তিমত্তারই প্রমাণ।

গণসংগীতের এই যদি সামাজিক মূল্যমান হয় তাহলে গণসংগীতের যেমন বাণীরূপ তেমনি সুরক্ষপেরও পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা হওয়া দরকার। সেই বাঞ্ছিত কাজটি এখনও যথোচিত পরিমাণে হয়েছে বলে মনে হয় না। যথোচিত কেন, সামান্য পরিমাণেও হয়েছে কিনা সন্দেহ। সুতবাং বিষয়টির প্রতি মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য।

৩

বাংলা গানের জগতে এপর্যন্ত গণসংগীতের আদলে যত গান রচিত হয়েছে তার সুররূপ পরীক্ষা করে দেখলে দেখা যায়, সেগুলির বেশীরভাগই অত্যন্ত সহজ সাদামাঠা চালে রচিত। অনেকটা আবৃত্তির ঢঙয়ে গাওয়া তাদের কথা, কেবল কবিতার আবৃত্তির সঙ্গে এগুলির তফাৎ এইখানে যে, এগুলি সুরের আবৃত্তি, নিছক কথার আবৃত্তি নয়। তা হলেও গানগুলির কাঠামো বিচার করলে এই মৌলিক তথ্যটি গোপন করবার উপায় থাকে না যে, এসব গানের সুরের বাঁধুনিতে ভারতীয় রাগসংগীতের প্রভাব নামমাত্র পরিলক্ষিত হয়, বলতে গেলে এ প্রভাব শূন্য বলা যায়। হাঁ, সলিল চৌধুরী, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, পরেশ ধর, অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ সেনগুপ্ত কিংবা গণনাট্য সংঘের অন্যান্য সুরকারদের সুর রচনা বিচার করেই একথা বলছি। সম্পূর্ণ সজ্ঞানেই আমার এ অভিযোগ।

অভিযোগটিকে বিশদীকৃত করে বললে তার বয়ান এইরকম দাঁড়াবে। গণসংগীতের সুরযোজনায় কিংবা সুর পরিবেশনায় রাগের রস আদপেই পাওয়া যায়

না, পেলেও সে রসের ছিটেফোঁটা মাত্র অনুভব করা যায়, তাতে শ্রোতার কান ভরে না। মন ভরা তো আরও পরের কথা। আমি বলতে চাই না যে, উল্লিখিত সুরকারদের ভারতীয় রাগসংগীতের ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয় নেই। বলতে চাই যে, তাঁদের সে পরিচয় থাকলেও তাঁদের সুরারোপিত গানগুলি ওই পরিচয়ের ছাপ বহন করে না—নিতান্ত সাদামাঠা, আটপৌরে সহজ সরল আবৃত্তিভঙ্গিম তাঁদের গানের ধাঁচ ও ধরন। আবৃত্তির ঢঙে বাঁধা গানে লয়ের প্রাধান্য, সুরের কারুকার্য বা সামান্য অলঙ্কারও কোথাও চোখে পড়ে না।

আলোচ্য সুরকারদের হয়ত ধারণা, গণসংগীত প্রথমতঃ কোরাস, তার উপরে জনগণের গান। কাজেই তেমন গানে রাগের বৈশিষ্ট্য চাপাতে গেলে তা আর জনমুখী গান থাকবে না, হয়ে দাঁড়াবে দরবারী সংগীতের মত বিশেষ অনুশীলন-সাপেক্ষ সংগীত। আমার ধারণা কিছু ভিন্ন। আমার বিনীত অভিমত এই যে, গণসংগীতের উপর রাগের ভর চাপিয়েও গণসংগীতকে গণসংগীত রূপে অবিকৃত রাখা যায়, তার জনমুখী চরিত্রের কিছু মাত্র ক্ষতি হয় না। কথাটা সুরের অধিকতর সমৃদ্ধি বিধানের প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। এর সঙ্গে গণসংগীতের জনচরিত্র অক্ষুণ্ণ থাকার বা হারাবার প্রশ্নের কোন সম্পর্ক নেই। সুর যদি নিছকই আবৃত্তি-ভঙ্গিম হয় আর সুররূপ নিতান্ত হাল্কা ও আটপৌরে, তাহলে সুরের রিক্ততা নিয়ে নালিশ না জানিয়ে গত্যন্তর থাকে না। আমরা তো শুধু গণসংগীতে কথা চাই না, কথার আকর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে সুরের আকর্ষণও চাই। সেই সুরের দিক-টাতে দৃষ্টিগ্রাহ্য (শ্রুতিগ্রাহ্য ?) ঘাটতি থাকলে কেমন করে গণসংগীত নিয়ে অত্যুৎসাহবোধ করা যায় ? গানের কথাবস্তুই তো সব নয়, গানের সুরের দিকটা সম্বন্ধেও যে সম্যক্ অবহিত হওয়া দরকার।

আমাদের গণসংগীতকারদের অনেকরই এই রকমের একটা ধারণা হয়েছে যে, গানকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শব্দমুখর আর কোলাহলতাড়িত করে গাইলেই বুঝি গানের সম্মেলক তথা গণচরিত্র বজায় থাকে। এটা ভ্রমাত্মক মনোভাব। আধুনিক গানে যেমন যন্ত্রসংগীতের কোলাহল রীতিমত শ্রুতিপীড়াকর তেমনি গণসংগীতেও কথার কোলাহল একটা অত্যাচার বিশেষ। অত্যাচারকে আরও বেশী অসহনীয় করে তোলা হয় যেখানে-সেখানে, প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে, "হেইয়ো হো", "হেই জোয়ান", "সাবাস ভাই" জাতীয় কণ্ঠোল্লাসমূলক হেঁচকি টান দিয়ে গেয়ে গেয়ে গানটিকে লোকসংগীতের সারি (নৌকাবাইচের গান) বা

ছাদ-পেটানো গানের yelling-এর সমপর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়। staccato বা কাটা-কাটা ছাঁদে হেঁচকি-তোলা কথার কোলাহল জায়গাবিশেষে হয়ত শুনতে খুব খারাপ লাগে না, কিন্তু কেবলই যদি জায়গায়-অজায়গায় এর নির্বিচার প্রয়োগ হতে থাকে তাহলে আপত্তি জানাতেই হয়।

আসলে এ-সমস্ত কোলাহলধর্মী গায়ন-প্রক্রিয়া সুরদৈন্য ঢাকবার একটা কৌশল ভিন্ন আর কিছু নয়। গানকে যত বেশী কথার সীমায় আবদ্ধ রাখা যায় আর সুরসমৃদ্ধি থেকে দূরে সরিয়ে রেখে তার মধ্যে অতিসরল অতিসহজের চাল আমদানী করা যায় ততই ভুল করে ভাবা হয় গানটিকে জনগণমুখী করে তোলা হচ্ছে। কিন্তু এ কথা ভুলে গেলে চলবে না, আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ সুরের ভাল মন্দ বেশ বুঝতে পারে, রাগসংগীতের সুরের আবেদন যে তাদের প্রাণে আকাঙ্ক্ষিত সাড়া জাগায় না এর কোন প্রমাণ নেই। বরং পরীক্ষিত প্রমাণ এই যে, ক্লাসিকাল গানের সুরের ধাঁচ-ধরনের সঙ্গে খেটে-খাওয়া মেহনতী স্তরের মানুষের অনেকেরই শ্রুতিগত পরিচয় আছে, ব্যাকরণগত পরিচয় নাই থাকল। এবং তাঁরা সে গানের সুর থেকে এক ধরনের রসও আহরণ করতে জানেন। এখনকার যাত্রাপালার গানের কথা বলছি না, আজ থেকে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে গ্রামে-গঞ্জে যে-সব যাত্রাপালার অভিনয় হতো, রাগসংগীতের সুরের রসে সেগুলির আবেদন ভরপূর ছিল বললেও চলে। অথচ গ্রামের সাধারণ শ্রোতার দল সে-সব সুর কী সমাদরের সঙ্গেই না গ্রহণ করতেন, কত আগ্রহের সঙ্গেই না সে-সব গান শুনতেন! রাগের গান তাঁদের উপভোগের পথে মোটেই বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি বরং সমৃদ্ধতর সুরের রস তাঁদের প্রাণ মন ভরিয়ে দিয়েছে তার সাক্ষ্য মেলে।

গণসংগীতে রাগসংগীতের সুর আরোপ করলে নাকি ওই গানের জাত যায় সুতরাং তাঁরা ওই তথাকথিত জাতরক্ষার তাগিদে গানকে যত বেশী ন্যাড়া আর আটপৌরে করতে পারা যায় তার সাধনায় ব্যস্ত। রাগের ছোঁয়া বাঁচাতে তাঁদের চেষ্টার সীমা-পরিসীমা নেই। রাগের প্রতি এই অনাগ্রহ ও অনীহা গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি যত না অনুরাগের দ্যোতক তার চেয়ে অনেক বেশী রাগসংগীত সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচায়ক। রাগসংগীতের অজ্ঞানতাকে ঢাকবার জন্যই প্রায়শঃ এঁরা সুর-সারল্যের অজুহাত খাড়া করেন, সুরের আটপৌরে রূপের মহিমা কীর্তন করেন। জনগণের গান বলেই সে গানকে সুররিক্ত করতে হবে

তার কোন কথা নেই।

আমাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকারী শিল্পী-সাহিত্যিক ও সংগীতকারদের মধ্যে কারও কারও এরকমের একটা অদ্ভুত ধারণা আছে যে, গণতান্ত্রিক কথাবস্তু সমন্বিত গানের সুরের সঙ্গে রাগসংগীতের সুরের অহি-নকুল সম্পর্ক বিদ্যমান। কিন্তু ধারণাটি ভুল।

সত্য বটে রাগসংগীতের বিকাশ হয়েছিল সামন্ততান্ত্রিক আবহাওয়ার পরিবেশে, গণতান্ত্রিক পরিবেশে নয়। কিন্তু তার জন্য সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে রাগসংগীতের ঐতিহ্যকেও বিদায় দিতে হবে তার কোন কথা নেই। গামলার জলের সঙ্গে সঙ্গে শিশুটিকেও ভাসিয়ে দেবার কোন যুক্তি নেই। রাগসংগীতের কাঠামোর যুগোপযোগী পরিবর্তন করে আমরা এখনও তাকে নানা কাজে ব্যবহার করতে পারি। গণসংগীতের সুরের সমৃদ্ধি বিধান এই রকমের একটি কাজ। এই কাজে তৎপর হওয়ার পথে কোনই বাধা দেখা যায় না।

কেউ কেউ বলেন সব দেশের গণসংগীতের সুরই নাকি সাদামাঠা, সহজ। সুতরাং এখানেও তার ব্যতিক্রম হওয়ার কোন কারণ দেখা যায় না। সব দেশের গণসংগীতের সুরই সাদামাঠা সরল ছাড়া এ কথা ঠিক নয়। পল রবসনের গণসংগীতের সুরের মধ্যে 'নিগ্রো স্পিরিচ্যুয়াল'-এর প্রভাব তো আছেই, পাশ্চাত্য 'জ্যাজ মিউজিক'-এর প্রভাবও কম নয়। আর জ্যাজ মিউজিক ক্লাসিকাল গানের সুরের ঐতিহ্যে ওতপ্রোত বললেও বলে। প্রখ্যাত রুশ সংগীতস্রষ্টা গ্লিঙ্কা বলেছেন "সব গানই জনগণের গান"। এখানে গান বলতে চিরায়ত লৌকিক জনমুখী সব রকমের গানকেই বোঝানো হয়েছে।

অতএব গণসংগীত হলেই তাকে ক্লাসিকাল বা চিরায়ত সংগীতের ঐতিহ্য থেকে বিযুক্ত করতে হবে তার কোন যুক্তি নেই। ক্লাসিকাল সুরের রস অনুপ্রবিষ্ট করিয়েও গণসংগীতের চারিত্র অক্ষুণ্ণ রাখা যায়। বরং তাতে সুর আরও অনেক বেশী সমৃদ্ধ হবার সম্ভাবনা থাকে। আর সেইটেই গণসংগীতকারদের করণীয় বলে মনে করি।

আমীর খশরু

মধ্যযুগে ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে আমীর খশরু একটি অবিস্মরণীয় নাম। তিনি ভারতীয় সংগীতকে যে কত দিক দিয়ে সমৃদ্ধ করে গেছেন তার ইয়ত্তা নেই। কণ্ঠ ও যন্ত্র—সংগীতের এই দুই বিভাগেই তাঁর সমান দক্ষতা ছিল, তবে তুলনামূলকভাবে বলতে গেলে কণ্ঠসংগীতে তাঁর অবদান শ্রোতাদের কাছে অধিকতর মনোহারী হয়ে দেখা দিয়েছিল। তার কারণ যন্ত্রসংগীতের যাবৎ নৈপুণ্যের আবেদন তিনি কণ্ঠসংগীতেও সুপ্রয়োগ করবার কৌশল জানতেন। তাঁর গান যন্ত্রসংগীতের সৌন্দর্যে ভরপুর ছিল বলে জানা যায়। এক হিসাবে দেখতে গেলে কণ্ঠও এক প্রকার যন্ত্র, শারীর যন্ত্র, সেই যন্ত্রে তিনি তারযন্ত্র অথবা সুষির যন্ত্রের (যে-যন্ত্র ফুৎকারে বাজানো হয়) মাধুর্যের অবতারণা করে তাকে একটি মিশ্ররসের সংগীতে পরিণত করতে পারতেন এরূপ জনশ্রুতি আছে।

আমীর খশরুদের আদিনিবাস ছিল মধ্য এশিয়ার কুশনগরে। এই শহরটি সোভিয়েট রাশিয়ার অন্তর্গত বর্তমান তাজিকিস্তান ও উজবেকিস্তানের খুব কাছাকাছি জায়গায় অবস্থিত—আফগানিস্থান ও ইরাণের সীমান্ত থেকে খুব দূরে নয়। এখান থেকে আমীর খশরুর পিতা আমীর সৈফুদ্দিন মাহমুদ ভাগ্যান্বেষণে ভারতে এসেছিলেন। আমীর খশরুর জন্ম ভারতবর্ষে, উত্তর প্রদেশের এটোয়া জেলার পাতিয়ালি নামক স্থানে। জন্মসাল ১২৫০ খ্রীস্টাব্দ। জাতিতে এঁরা তুর্কী, সম্ভ্রান্ত মুসলমান বংশের সন্তানবিধায় শিক্ষা-সংস্কৃতির ঐতিহ্যে এঁদের সহজাত কর্ষণা ছিল। বিশেষ, খশরু শিক্ষা-সংস্কৃতির বৈদগ্ধ্যের ওপরে অতিরিক্ত সংযোজন হিসাবে সংগীতকেও আপন ব্যক্তিত্বের অলংকার-শোভা করে নিয়েছিলেন। গোঁড়া মুসলিম পরিবারে সংগীতের প্রবেশ নিষেধ, কিন্তু যেহেতু এঁরা ছিলেন মুক্তবুদ্ধির দ্যোতক সুফী ভাবের আবহে লালিত সেই কারণে সংগীত এঁদের পরিবারে অনাচরণীয় ছিল না, বরং সোৎসাহে অনুশীলিত হতো। আমীর খশরু ভারতের রাগসংগীতের জগতে একাধিক ইরাণীয় (পারসিক) যন্ত্রের প্রচলন করেছিলেন। পারসিক যন্ত্রে তাঁর ব্যুৎপত্তি তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্য থেকে সংস্কারগতভাবে পাওয়া—সেই ব্যুৎপত্তি তিনি ভারতীয় রাগসংগীতের ঐশ্বর্য বিধানে পুরোমাত্রায় কাজে লাগিয়েছিলেন।

এদিকে পারসিক গজল, মসনবী, কানিদা, রুবাইত ও গীত জাতীয় গানে তাঁর অধিকার ছিল হস্তামলকবৎ। গজল, গীত, কাওয়ালি বর্গের গান তিনি কত যে রচনা করেছিলেন তার লেখাজোখা নেই। কথিত আছে যে, তিনিই এদেশে কাওয়ালি সংগীতের প্রবর্তক। কাওয়ালি লোকমনোরঞ্জক হাস্যরসের এক শ্রেণীর মধুর গান, সহজ তার আবেদন (সচরাচর কাহারবা তালে গীত এই শ্রেণীর গান উত্তর ভারতের স্ট্রীট-সিঙ্গারদের মুখে প্রায়শ শুনতে পাওয়া যায় যার থেকে তাঁদের নামই হয়েছে 'কাওয়াল' গাইয়ে বলে। ভাবতে অবাক লাগে, যে আমীর খশরু ইমন, সরফর্দা বিলাবল, ফিরোদাস্ত, পূর্বী প্রভৃতি ভারী ভারী রাগের সৃষ্টি করেছিলেন তিনিই আবার তাঁর শিল্পী মেজাজের অন্য একটি ফেরতার কালে কাওয়ালি, গীত, গজল প্রভৃতি লৌকিক ধারার গান অজস্র সৃষ্টি করেছিলেন। অর্থাৎ, রাগসংগীতের আদর্শ ও লোকসংগীতের আদর্শ এই দুই-ই তাঁর শিল্প-পরিকল্পনায় প্রায় সমান আদরে গৃহীত হয়েছিল। লোকপ্রিয় সুরসৃষ্টির দ্বারা জনসাধারণকে আনন্দদানের ইচ্ছা তাঁর সাংগীতিক আভিজাত্যবোধের ধারণাকে কখনও ক্ষুণ্ণ করেনি। সাধারণ মানুষের প্রতি মমত্বই এর মূল কারণ।

আমীর খশরুর বহুমুখী পাণ্ডিত্য সংগীত জগতের একটি প্রায় প্রবাদতুল্য সংঘটন। তিনি এদেশে গজল সংগীতের প্রবর্তন করেছিলেন কিংবা কাওয়ালির জন্ম দিয়েছিলেন এতেই তাঁর পথিকৃৎপ্রতিভা নিঃশেষিত হয়ে যায়নি। শোনা যায় আনদ্ধ সংগীতের অন্যতম বিশিষ্ট অঙ্গ তবলা তাঁরই উদ্ভাবন। তিনি মৃদঙ্গ বা পাখোয়াজকে মধ্য অংশে দু-ভাগ করে কর্তিত দুটি অংশকে যথাক্রমে বাঁয়া ও তবলার রূপ দিয়েছিলেন। এদিকে 'তত' বা তারযন্ত্রের মধ্যে সবচেয়ে শ্রুতিমধুর সেতার—তাও নাকি তাঁরই আবিষ্কার।

আমাদের দেশের পুরাতন প্রচলিত তারযন্ত্রের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ বীণ বা বীণা। কেউ কেউ বলেন, ভারতের নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত চিত্রবীণাই পরবর্তীকালে সপ্ততন্ত্রী বীণা বা সেতারের আকার প্রাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু এ যুক্তি বোধ হয় অগ্রাহ্য করা চলে। কেননা আমাদের দেশের পুরাতনবাদীদের স্বভাবই এই যে, সব কিছুর মূল এঁরা সনাতনে খোঁজবার চেষ্টা করেন এবং তা থেকে এক ধরনের দেশাভিমান চরিতার্থ করতে চান। সেতার যদি চিত্রবীণারই আধুনিক সংস্করণ হতো তো বিশেষ করে আমীর খশরুকেই তার আবিষ্কর্তা বলে চিহ্নিত করবার প্রয়োজন দেখা দিত না। এক্ষেত্রে যেটা হওয়া সম্ভব তা হলো এই যে,

আমীর খশরু ভারতের সনাতন বীণযন্ত্র আর পারস্য থেকে আনীত রবাব, সারেঙ্গী, সরোদ প্রভৃতি তারযন্ত্রের মধ্যবর্তী একটা মিশ্রযন্ত্রের উদ্ভাবন করা যায় কি-না সে-চেষ্টায় ব্যাপৃত হয়েছিলেন; আর সে-চেষ্টারই ফলশ্রুতি হলো—সেতার। তবে সেতার তাঁর নিজস্ব উদ্ভাবন হলেও গোত্রসাযুজ্যের দিক দিয়ে বীণার সঙ্গেই যে এর বেশী মিল সে কথা অস্বীকার করা যায় না।

আমীর খশরুর নতুন কয়েকটি রাগরাগিণী আবিষ্কারের কথা আগেই বলেছি। তাঁর সর্বমোট নবাবিষ্কৃত রাগরাগিণীর সংখ্যা হলো দশ। যথা—ইমন (কল্যাণ ঠাটের অন্তর্গত), উশশাখ (মাধ্যাহ্নিক আজানের সুর), মুহায়িক (মূলতানির অনুরূপ), ঘুণম (পূর্বী ঠাটের অন্তর্গত), বখারজ, ফরগণা (এ দুটি রাগের নাম অঞ্চলবিশেষের নাম থেকে নেওয়া—খশরুর উদ্ভাবিত দুটি জনপ্রিয় রাগ), ফিরোদাস্ত ('রাগতরঙ্গিণী' প্রণেতা লোচনের মতে, খশরুর আবিষ্কৃত এই রাগটি ঠিক মৌলিক রাগ নয়—পূর্বী, গৌরী, শ্যাম, বরারী ও বঙ্গ এই পাঁচ রাগিণীর মিশ্র রূপ), সরফর্দা (বিলাবল ঠাটের অন্তর্গত, 'রাগমঞ্জরী'র রচয়িতা বিঠ্‌ঠলের মতে সরফর্দা বিলাবল রাগ, পারসিক রাগ 'রাস্ত'-এর স্বগোত্র), গারা (খাম্বাজ ঠাটের অন্তর্গত—গজনীর ঘোর অঞ্চলের সুর, তার থেকে নাম হয়েছে 'গারা' বা ঘারা), সর্বশেষ মুয়াফিক (এই রাগটি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না)। কোন কোন সংগীত-ঐতিহাসিকের মতে পিলু, সুহা, সুঘরাই এগুলিও খশরুর উদ্ভাবিত রাগরূপের মধ্যে পড়ে।

খেয়াল ও তারানাও নিঃসন্দেহে আমীর খশরুর সৃষ্টি। তবে ধ্রুপদের তৎকালীন সার্বিক প্রাধান্যের যুগে খেয়াল খশরুর সমসাময়িককালে খুবই অনাদৃত অবস্থায় ছিল, কাওয়ালি বা গীত জাতীয় লঘু রসের গানের বাড়া মর্যাদা তাকে দেওয়া হতো না। এই অবস্থা অনেক দিন চলেছিল, অবস্থার লক্ষণীয় পরিবর্তন হয় মুঘল রাজত্বের একেবারে শেষ আমলে। কথিত আছে, মুঘল সাম্রাজ্যের পতন-কালীন অন্যতম বাদশা মুহম্মদ শাহ্‌ (অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ)-এর দরবার-গায়ক সদারঙ্গ ও তাঁর পুত্র (কারও কারও মতে, ভ্রাতা) অদারঙ্গের মিলিত চেষ্টায় খেয়াল লৌকিক গানের স্তর থেকে উন্নীত হয়ে কুলীন শ্রেণীর গানরূপে স্বীকৃতি পায়। সদারঙ্গ ঢিমা খেয়ালের প্রবর্তন করে ধ্রুপদের সঙ্গে তার পার্থক্য কমিয়ে আনেন। তার আগে জৌনপুরের সুলতান হুশেন শাহ্‌ শরকী এক ধরনের খেয়ালের প্রচলন করেছিলেন বটে; তবে তার সঙ্গে কাওয়ালি গানের

বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। অর্থাৎ আমীর খশরুর ঢঙটাই তিনি বলবৎ রেখেছিলেন।

'তারানা' বা 'তেলেনা' খেয়ালের বাণীবর্জিত নিছক স্বরাশ্রয়ী রূপ। ত্রিম-দেরে-নানা-তাদের-দেরদের জাতীয় কতকগুলি অর্থহীন ধ্বন্যাত্মক ('অনো-মেটোপোয়িক') শব্দের সমবায়ে গঠিত এই গান খেয়ালের আস্থায়ী-অন্তরা এই দুই স্বরভঙ্গীরই স্বররূপ হুবহু বজায় রাখে, তবে তাতে পূর্বোক্ত শব্দসমষ্টি ভিন্ন অন্য কোন রূপ অর্থপূর্ণ কথা থাকে না। এ গান লয়প্রধান ও তার চাল দ্রুত। তানকর্তবের এতে একটি বিশেষ ভূমিকা থাকে।

খশরু এই শ্রেণীর গানরূপের প্রবর্তন করেছিলেন খুব সম্ভব খেয়ালের কাঠামোটিকে তার অবিকৃতরূপে দেখানোর উদ্দেশ্যে। এতে গানের প্রাণ না থাকলেও গানের অবয়বটিকে পাওয়া যায়। শিক্ষার্থীদের পক্ষে তার মূল্য অনেক, আর তাছাড়া যথার্থ খেয়ালেও কথার মূল্য সামান্যই, তার সুররূপটাই আসল। এই বিচারেও তারানা বা তেলেনার প্রায়োগিক উপযোগিতা কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। এই শ্রেণীর গানের শিক্ষাগত দিকের যথেষ্ট দাম আছে:

উপরের বিবরণাদি থেকেই বোঝা যায় আমীর খশরু সংগীতের ক্ষেত্রে কতবড় সৃষ্টিশীল প্রতিভা ছিলেন। তাঁর সৃজনী আবেগ ছিল যেমন অফুরন্ত, তেমনি পাণ্ডিত্যের প্রকৃতিও ছিল বিচিত্র। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতকে নানাদিক দিয়ে তিনি সমৃদ্ধ করে গেছেন। এই ক্ষেত্রে পারসিক 'মোকাম' বা স্বরভঙ্গীর অভি-নবত্বের দ্বারা ভারতীয় সংগীতের রূপৈশ্বর্যের বৃদ্ধি তাঁর বিশিষ্ট মৌলিক অবদান।

বহুমুখী প্রতিভা

কিন্তু সংগীতই তো আমীর খশরুর একমাত্র বিচরণের ক্ষেত্র ছিল না। এটি তাঁর বহুমুখী প্রতিভার একটি দিক্ মাত্র। উজ্জলদ্যুতিসম্পন্ন বহুকোণবিশিষ্ট হীরক-খণ্ডের মত তাঁর প্রতিভা বিভিন্ন দিকে ঔজ্জ্বল্য বিকিরণ করতো। আমীর খশরু ছিলেন একাধারে সংগীতজ্ঞ, কবি, গীতিকার, ঐতিহাসিক, দার্শনিক, বহু-ভাষাবিদ্, দেশপ্রেমিক, রাজনীতিজ্ঞ, আমীর-ওমরাহবর্গের ন্যায় প্রতিপত্তিশালী রাজপারিষদ, ধর্মপ্রবণ সুফী মনীষী এবং সেই সুবাদে অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী ভাবুক, সুনাগরিক, ইত্যাদি। তিনি ছিলেন তদানীন্তন প্রসিদ্ধ সুফী সাধক শেখ নিজামুদ্দিন আওলিয়ার এক পরম অনুগত শিষ্য এবং তাঁরই প্রদর্শিত পথের

পথিক। সত্য বটে সর্বদাই সম্রাটের দরবারের কাছাকাছি থাকার ফলে—কম করেও তিনি এগারোজন পাঠান বাদশাহ বা বাদশাহের অনুরূপ ক্ষমতাশালী জায়গীরদারের দরবারের সভাসদ ছিলেন এবং তাঁদের উত্থান-পতনের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। তাঁর ভিতর এক ধরনের আমীরী ভাবের প্রাধান্য ছিল এবং সেই সূত্রেই নাগরিক চালচলনে তিনি সহজাভ্যস্ত ছিলেন, কিন্তু অন্তরে অন্তরে ত্যাগের সুরে তাঁর হৃদয়তন্ত্রী বাঁধা পড়েছিল। ভোগৈশ্বর্যের আবহাওয়ার মধ্যে থেকেও তিনি তাঁর গুরুর প্রভাবে অন্তরে বৈরাগী ছিলেন। নয়তো তাঁর পক্ষে এত বিভিন্নমুখী মেজাজের মালিক প্রভুর আনুগত্য করা বোধহয় সম্ভব হতো না।

অবশ্য এই-জাতীয় resilience বা স্থিতিস্থাপকত্বের একটা ভিন্ন ব্যাখ্যাও করা যায়। খশরুর ব্যক্তিত্বের মূল্যায়নের সময় আমরা সে-প্রসঙ্গে পুনরায় ফিরে আসব। আপাতত তাঁর কবিপ্রতিভা, দেশপ্রেম ও বহুভাষাজ্ঞানের একটা সংক্ষেপ-জরীপ করা যাক।

খশরু জাতিতে তুর্কী হলেও তিনি ভারতবর্ষের মৃত্তিকায় পৃথিবীর আলো প্রথম দেখেছিলেন এই সত্য ও তথ্য তিনি কোন সময়েই বিস্মৃত হননি। আর এই অনুভবের ফলেই তিনি এদেশকে তাঁর স্বদেশ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, আজকের দিনের একাধিক সাম্প্রদায়িক গোঁড়া বা তথাকথিত 'ধর্মীয় মৌলিকত্বা-বাদী' ('রিলিজিয়াস ফাণ্ডামেণ্টালিস্ট')-দের মত তাঁর আদি পিতৃভূমি মধ্য এশিয়া কিংবা ধর্মভূমি মক্কার জন্য কেবলই হা-হুতাশ করে মরেননি। এদেশের জল-হাওয়াতে তাঁর দেহ পুষ্ট হয়েছিল বলে এ দেশকেই তিনি তাঁর প্রকৃত লালন ও পালনভূমি বলে মনে করেছেন এবং জন্মভূমিকে সন্তানের যে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা সতত-দেয়, জন্মভূমির প্রতি সেই শ্রদ্ধা ও প্রেম প্রদর্শনে তিনি কখনই কার্পণ্য করেননি। তাঁর একাধিক খারিবোলি ও হিন্দি ভাষায় লিখিত কবিতায় ও গানে তাঁর এই অমলিন স্বদেশপ্রেম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। এদেশের আবহাওয়ার প্রীতিকরতা, মানুষের সদ্‌গুণাবলি, ফুলের সৌন্দর্য ও ফলের স্বাদুতা, পশু-পক্ষীর বৈচিত্র্য, বৃক্ষরাজির শোভা, অরণ্য-পর্বত-সরোবর-নদ-নদী প্রভৃতির অনবদ্য প্রাকৃতিকরূপ ব্যাখ্যান করে আত্মহারা মুগ্ধতায় তিনি কত যে গান লিখে গেছেন তার সীমা-সংখ্যা নেই। বলেছেন, ভারতভূমি পৃথিবীতে পারিজাত-কাননের তুল্য। এদেশে যে ব্যক্তি ভূমিষ্ঠ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন তাঁর মত ভাগ্যবান কেউ নেই। খশরু এই দেশে প্রথম চক্ষু মেলেছিলেন বলে নিজের

জীবনকে ধন্য মনে করেছেন।

খশরু বহুভাষাবিদ্ ছিলেন, একথা পূর্বেই বলেছি। আরবী, ফার্সী ও তুর্কী ভাষায় ব্যুৎপত্তি ছাড়াও তিনি সংস্কৃত, খারিবোলি, খারিবোলির দুই উন্নততর রূপ হিন্দী ও উর্দু, ব্রজভাষা ও আওধি প্রভৃতি ভাষায় বিলক্ষণ অধিকার লাভ করেছিলেন এবং ওইসকল ভাষার প্রত্যেকটিতে কবিতা ও গান রচনা করেছেন। উত্তর-ভারতীয় এই ভাষাগুলি তিনি আয়ত্ত করেছিলেন দিল্লী, পাঞ্জাব ও অযোধ্যায় বাসকালে। রাজধানী দিল্লীতেই বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছেন, তবে কার্যব্যপদেশে পাঞ্জাবের মুলতান ও উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায়ও জীবনের বেশকিছু সময় অতিবাহিত করেছেন। সেই সূত্রে স্থানীয় মানুষজনদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছেন ও তাঁদের ভালবেসেছেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁর প্রভূত চর্চা ছিল। তাঁর ধর্মের ভাষা আরবীকে বাদ দিয়ে তিনি মনে করতেন সংস্কৃত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষা। এই ভাষার অমিত জ্ঞানভাণ্ডার সম্পর্কে মুক্তকণ্ঠ হয়েছেন।

স্বদেশপ্রেমের তিনটি স্বীকৃত লক্ষণ—এক, স্বদেশের নিসর্গের প্রতি টান; দুই, স্বদেশীয়দের প্রতি ভালবাসা; তিন, স্বদেশীয় ভাষাগুলির প্রতি অনুরাগ। এই তিন মানদণ্ডেই আমার খশরু একজন শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিকের শিরোপা লাভ করতে পারেন। অথচ আমরা সচরাচর বলে থাকি, দেশপ্রেম বস্তুটি নাকি মধ্যযুগে অজানিত ছিল, এটি নাকি ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার দান। ইংরাজের এদেশে অভ্যাগমের পূবে এদেশে নাকি জন্মভূমির প্রতি মানুষের স্বাভাবিক টানের কোন পরিচয় পাওয়া যেত না, গেলেও সাহিত্যশিল্পে তার কোন অভিব্যক্তি ছিল না। তখন নাকি এদেশীয় মানুষ একান্তরূপে ধর্মকে অবলম্বন করেই বাঁচবার চেষ্টা করতো—ধর্ম কিংবা ধর্মের নানাবিধ আনুষ্ঠানিক রকমফের মানুষের মূলাশ্রয় ছিল।

তা-ই যদি হবে তবে আমীর খশরুর কবিতায় ও গানে দেশপ্রেমের এমন প্রবল জোয়ার বইলো কী করে? তিনি কোথা থেকে এই মনোভাব অর্জন করলেন? নিশ্চয়ই তিনি তাঁর অন্তর থেকেই এমনতর প্রেরণা পেয়েছিলেন, বাইরের জগতের কোন নজীর থেকে তাঁকে দেশপ্রেমের আকুতি আহরণ করতে হয়নি। খশরু যে কতবড় দেশপ্রেমী কবি ছিলেন তাঁর রচনার দু'চারটি অংশ উদাহরণ হিসাবে উদ্ধৃত করে সে-কথা বোঝাবার চেষ্টা করছি।

খশরু তাঁর 'নূহ শিপিহর' গ্রন্থের (১৩১৭ খ্রীস্টাব্দে রচিত, তখন কুতুবউদ্দিন

মুবারক শাহের রাজত্বকাল, তাঁকেই বইখানা উৎসর্গীকৃত) তৃতীয় ভাগে তিনি লিখেছেন :

"ভারতবর্ষ স্বর্গোদ্যানের মত। খোরাসানের চেয়েও এদেশের জলবায়ু উৎকৃষ্ট—অনেক, অনেক উৎকৃষ্ট। এখানে গ্রীষ্মের প্রকোপ হয়ত বেশি কিন্তু শীতের প্রকোপ কম।...প্রকৃতির শ্যামলাভা বৎসরের সর্বক্ষণ বিদ্যমান এবং প্রত্যেক ঋতুতেই ফুলের সমারোহ। এদেশের পেয়ারা ও আঙুর অতুলনীয়। অন্যান্য ফল মশলাও (যথা আম, কলা, গুলমরিচ, কর্পূর, এলাচ প্রভৃতি) প্রচুর পরিমাণে জন্মে। অন্য দেশে দুর্লভ এমন বহু শুষ্ক ফলের জন্য ভারত অতিশয় বিখ্যাত। এদেশের আর একটি অনুপম বস্তু হলো—পান।"

এ তো গেল ভারতের জলহাওয়া ও উৎপন্ন দ্রব্যাদির সম্পর্কে তাঁর সপ্রশংস মনোভাব। এদেশের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাঁর কী মনোভাব এবারে দেখা যাক। পাঠান দরবারের লিপিকার ও ঐতিহাসিকেরা ধর্মের ভিন্নতার কারণে ভারতবাসীদের সম্পর্কে অনেক সময় প্রতিকূল মন্তব্য করতেন। কিন্তু খশরু ছিলেন তাঁদের সম্পূর্ণ বিপরীত। ভারতীয়দের নিন্দা করা তো দূরের কথা, তিনি সুযোগ পেলেই এদেশের মানুষ ও এদেশের জ্ঞানবিদ্যা সম্পর্কে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতেন। তিনি লিখে গেছেন—"ব্যবহারশাস্ত্র বাদ দিলে এদেশের আর সব বিদ্যায় রচিত বই জ্ঞানগরিমায় অ্যারিস্টটলের তুল্য। ন্যায়শাস্ত্র, জ্যোতিষ, গণিত ও পদার্থবিদ্যায় ভারতের পণ্ডিতেরা অনেক অগ্রসর। এদেশে অনেক প্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণ বিদ্যমান, কিন্তু তাঁরা প্রচারে বিমুখ বলে তাঁদের জ্ঞানগরিমার কথা বিদেশে অজ্ঞাত। আমি এঁদের কাছ থেকে কিছু কিছু শেখবার চেষ্টা করেছি, তাইতে জানি এঁরা কত বড়দরের পণ্ডিত। ধর্মে অবশ্য হিন্দুরা আমাদের থেকে ভিন্নপথের অনুবর্তী, তাহলেও তাঁদের ধর্মের অনেক আদর্শ আমাদের ধর্মের অনুরূপ। তাঁরা (আমাদেরই মত) এক পরম ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন। তাঁরা মনে করেন ঈশ্বর শূন্য থেকে যে-কোন বস্তুর সৃষ্টি করতে পারেন এবং তাবৎ প্রাণী ও অপ্রাণীর চূড়ান্ত নিয়ন্তা ঈশ্বর। সমস্ত সৎ ও অসৎ ঈশ্বর থেকেই উদ্ভূত বলে তাঁদের ধারণা। ঈশ্বর বা আল্লাহ্ সবকিছুর জ্ঞাতা।"

এর পরে ওই একই পুস্তকে ভারতবাসীদের সম্পর্কে তিনি আরও যেসব কথা বলেছেন তাতে এদেশীয়দের সম্পর্কে তাঁর ধারণা যে কত উচ্চ ছিল তার প্রমাণ মেলে। খশরু লিখছেন যে, অনেক কয়টি কারণে ভারতবর্ষ অন্য সব দেশ

থেকে শ্রেষ্ঠ। প্রথমত, বিদ্যাবত্তা ও শিক্ষার অনুশীলন এদেশের সর্বপ্রান্তে দেখা যায়। অন্য দেশের লোকেরা জানেই না এদেশে জ্ঞানের কী প্রগাঢ় সমুদ্র বিদ্যমান। দ্বিতীয়ত, ভারতের অধিবাসীরা অন্য দেশের ভাষা সহজে বলতে-কইতে পারে, অন্য দেশের লোকেরা তা পারে না। তৃতীয়ত, বিদেশীরা প্রায়শ ভারতে জ্ঞানবিদ্যা অর্জনের জন্য আসেন, কিন্তু হিন্দুরা এই উদ্দেশ্যে অন্য কোন দেশে যাবার প্রয়োজন মনে করেন না। চতুর্থত, গণিতের সংখ্যাতত্ত্ব ভারতেরই বিশেষ অবদান, আরবরা ভারত থেকে এই রাশিতত্ত্ব অন্যত্র প্রচার করেন। গ্রীকেরাও এ বিষয়ে ভারতবাসীর কাছে ঋণী। এদেশের দর্শনশাস্ত্র অনবদ্য।··· শেষত, ভারতবর্ষের সংগীত এক অপূর্ব সৃষ্টি। এই সংগীত শুধু যে মানুষের প্রাণই বিগলিত করতে পারে তাই-ই নয়, পশুপাখীকেও প্রভাবিত করতে পারে।

এ তো গেল দেশপ্রেমের মনোভাবের জ্ঞাপক রচনাবলী বা রচনাবলীর অংশ। প্রেমের কবিতায়ও আমীর খশরুর তুলনা নেই। তাঁর এই-জাতীয় কবিতা অধিকাংশ ফার্সী ভাষায় রচিত—গজল, গীত, মসনভী, কাসিদা, রুবাই জাতীয় গান বা শ্লোকের আকারে অথবা বিশুদ্ধ কবিতারই আঙ্গিকে। তাঁর দু-একটি ফার্সী প্রেমের কবিতার বয়ান শুনাই। অবশ্য অনুবাদে। কিন্তু এছাড়া উপায়ই বা কী। এসব ক্ষেত্রে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো ছাড়া নান্যঃ পন্থাঃ।

একটি গজলের দুটি 'শ্যের' বা স্তবক :

আমার প্রিয়তমা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দুঃখের কারাগারে আমি ধুলায় লুটাচ্ছি,
আর সে আমা থেকে দূরে কোন্ বিজনে
না জানি কত বেদনায় কালাতিপাত করছে।
আমার আঁখি থেকে অশ্রুর মুক্তা ধুলায় গড়ালো
কিন্তু আমার দয়িতার আঁখিই যে
শুকনো ধুলোয় পরিণত হয়েছে।
তার উদ্গত অশ্রুর মুক্তার কী হবে ?

আর একটি স্তবক :

আমার অবুঝ হৃদয় কেন
ওই নিঠুর-স্বভাবা নারীর পাছু বৃথা ধায় ?
হায়, আমার এই রক্তাক্ত হৃৎপিণ্ড
কেন ফিরে ফিরে তার অন্বেষণ করে ?

অথবা,

আজ রাতভোর গোলাপ-বালা
আমারই পাশে শয়ানা ছিল,
নিশি-অবসানে সে মাতালের মত
উঠে চলে গেছে।
এসো বন্ধুসব, টকটকে গোলাপের মত
লাল রঙের সরাব পান করে
আমরা এই মিলনের স্মৃতি উদ্‌যাপন করি।

এরকম আরও অনেক টুকরো টুকরো প্রেমের কবিতার দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে, কিন্তু তার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। পরবর্তীকালে গালিবের কবিতায় এসব রচনার খুবই প্রভাব পড়েছিল। বিগত ও আধুনিক কালের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ উর্দু কবি, যথা ইকবাল, হালি, জোস মলিহাবাদী, ফিরাক—এঁদের ওপরও আমীর খসরুর প্রেমগীতির প্রভাব পড়েছিল বলে জানা যায়।

জীবনকথা ও মূল্যায়ন

আমীর খশরুর জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তাঁর মন অতিশয় উদার ও অসাম্প্রদায়িক ভাবনা-ধারণায় পূর্ণ ছিল। ইসলাম ধর্মের অতিশয় অনুগত সেবক হয়েও হিন্দু-মুসলমান তাবৎ মানুষকে ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে প্রীতির চক্ষে দেখার মত মহানুভবতা ও হৃদয়ের ঔদার্য তাঁতে সহজাত ছিল। তার ওপর সুফী ভাবের কষণায় তার এই অসাম্প্রদায়িক ভাব আরও বেড়েছিল। এই দিক দিয়ে বাংলার বাউল ও মুর্শিদ্যা ফকিরদের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট মনের মিল ছিল। খশরু মূলত কবি ও গীতিকার, সুতরাং তাঁর স্বভাবে মানবদরদ ওতপ্রোতভাবে মজ্জাগত থাকবে তাতে আর বিচিত্র কী। তবে মানবিক ভাবুক হলেও তিনি যে যথেষ্ট পরিমাণে বৈষয়িক বুদ্ধিসম্পন্নও ছিলেন তার একাধিক নিদর্শন তাঁর জীবনী থেকেই মিলতে পাবে। কথাটা কেন বলছি তা একটু বিশ্লেষণ করে বোঝানো দরকার। কতকাংশে অপ্রিয় হলেও মানবস্বভাবের জটিলতা বোঝানোর জন্যে এই প্রসঙ্গ আলোচনার প্রয়োজন আছে।

পূর্বেই বলেছি তিনি কমপক্ষে এগারো জন পাঠান বাদশাহ বা বাদশাহকল্প প্রতাপান্বিত ব্যক্তির দরবারের সভাসদ ছিলেন। অতি-ধুরন্ধর রাজপুরুষের পক্ষেও

এ এক অসাধ্য-সাধন কীর্তি। যে-সব লোকের কথা বলছি তাঁদের কেউ কারও অনুগামী ছিলেন না বরং পরস্পর-বিরুদ্ধাচারী ছিলেন। শুধু তাই নয়, কোন কোন পাঠান সম্রাট তাঁর পূর্ববর্তী সম্রাটকে হত্যা করে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। যেমন, আলাউদ্দিন খিলজী তাঁর পিতৃব্য জালালুদ্দিন খিলজীকে অভ্যর্থনা জানানোর নাম করে এলাহাবাদের গঙ্গাতীরে এক কৃত্রিম উৎসব-তোরণ বানিয়ে তাঁকে তার তলায় চাপা দিয়ে মেরেছিলেন। অথচ জালালুদ্দিন ও আলাউদ্দিন এই দুই সম্রাটেরই সাগরেদী করে গেছেন খশরু সমান নিষ্ঠায় এবং দুই সম্রাটেরই সভা তিনি আলো করে ছিলেন। জালালুদ্দিন খশরুর বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন। তিনি খশরুর জন্য বছরে বারো হাজার তংকা মাহিনার ব্যবস্থা করেছিলেন। পরেও খশরু একাধিক এমন সব বাদশাহের দরবারের শোভা বর্ধন করেছেন যে-সব বাদশাহের একের সঙ্গে আরের সম্পর্ক ছিল আলোচাল-তেঁতুলের মত।

কিন্তু তাতে আমীর খশরুর পক্ষে তাঁদের সবারই সঙ্গে মানিয়ে নিতে কিছু আটকায়নি। তিনি সব সম্রাটকেই সম পরিমাণ উৎসাহে স্তুতি করে গেছেন ও তার থেকে বৈষয়িক ফায়দা তুলেছেন। চরিত্রের এই অবিশ্বাস্যরকম বেত্রবৎ নমনীয়তা গুণের অর্থই হচ্ছে, তিনি তাঁর প্রকৃত মনোভাব গোপন করে প্রতিটি বাদশাহেরই মনোরঞ্জন করবার বিদ্যা জানতেন। স্তবস্তুতি ছিল এই বিদ্যার অপরিহার্য প্রাথমিক উপকরণ। এই বিদ্যার সুনিপুণ প্রয়োগ দ্বারা তিনি সব সম্রাটকেই সম পরিমাণে ঘায়েল করেছিলেন।

খশরুর প্রথম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবনের ভ্রাতুষ্পুত্র উদারপ্রাণ মালিক হুজ্জু খাঁ। তাঁর সভায় বছর দুই থেকে খশরু চলে আসেন বলবনের দ্বিতীয় পুত্র সামানার গভর্নর বাঘরা খাঁর কাছে। এর পরে তিনি এলেন বলবনের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলতান মহম্মদের সভায়। দিল্লীস্থিত এই রাজদরবারে তিনি বছর পাঁচেক ছিলেন। সুলতান মহম্মদ মঙ্গোল আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে নিহত হবার পর খশরু বলবনের পৌত্র মৈযুদ্দিন কায়কোবাদের দরবার আশ্রয় করেন। কায়কোবাদের উচ্ছৃঙ্খলতায় তিতিবিরক্ত হয়ে তিনি বছর দুই অযোধ্যার সুবেদার হাতিম খাঁর শরণাপন্ন হন। পরে আবার সুড়সুড় করে কায়কোবাদের দরবারে ফিরে আসেন।

তাঁর এই ক্ষেত্র বদল ও পৃষ্ঠপোষক বদল কতই না অবলীলায় সাধিত হতো। বোধহয় মধ্যযুগীয় রাজন্যবর্গ ও নবাব-বাদশাহ শ্রেণীর আমীর-ওমরাহদের এই ছিল

অনিবার্য নিয়তি—রাজসভায় বা দরবারে টিকে থাকতে হলে তাঁদের যে-কোন পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য করা অর্থাৎ খাপ খাইয়ে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। নইলে একথা কে কবে ভাবতে পেরেছিল যে, যে জালালুদ্দিন খিলজী ছিলেন খশরুর সবচেয়ে আন্তরিক পৃষ্ঠপোষক, তাঁর হত্যার রক্তের দাগ মুছে যেতে না যেতেই তাঁরই হত্যাকারী আলাউদ্দিন খিলজীকে তিনি আঁকড়ে ধরে বসবেন রাজকীয় বদান্যতার আশায়? আর নিয়তির এ কি পরিহাস যে, ওই নির্দয় নৃপতি আলাউদ্দিনের শাসনকালেই আমীর খশরুর প্রতিভার সবচেয়ে বাড়-বাড়ন্ত হয়েছিল!

এই সব ঘটনা থেকে একটা জিনিসের প্রমাণ পাওয়া যায়—মধ্যযুগের কবি, শিল্পী, গায়ক, যন্ত্রীবর্গেব মানুষেরা স্বাধীন জীবিকা নির্বাচনের ক্ষেত্রে কত অসহায় ছিলেন। মনের ভাব যা ই হোক, পৃষ্ঠপোষক প্রভুর নির্বিচার গুণকীর্তন ছাড়া তাঁদের অস্তিত্ব রক্ষার ভিন্ন পথ ছিল না। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের এই কলঙ্ককর প্রথা আধুনিককালেও যে পুরোপুরি ঘুচেছে এমন কথা বলা যায় না। অন্য নামে ও অন্য রূপে এই প্রথা ধনতান্ত্রিক সমাজে, এমনকি তথাকথিত সমাজ-তান্ত্রিক সমাজের অঙ্কুরোদ্গম কালেও বলবৎ দেখতে পাই।

আমীর খশরুর সদৃশ দৃষ্টান্ত যদি আধুনিক যুগের রাজনীতির ইতিহাস থেকে খুঁজে বার করতে হয়, তবে কার প্রতি অঙ্গুলি-নির্দেশ করা যায়? মনে হয় একটাই উদাহরণ আছে—তিনি রাশিয়ার মিকোয়ান। সোভিয়েট রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক কাঠামোয় কত প্রেসিডেণ্ট ও প্রধানমন্ত্রী এলেন গেলেন, কিন্তু ধ্রুবতারার ন্যায় একটি ডেপুটি প্রেসিডেণ্টের নাম বহুকাল স্থির ছিল—মিকোয়ান। মিকোয়ানের সকল অবস্থার সঙ্গে সমান মানিয়ে চলার ক্ষমতা সাম্প্রতিক ইতিহাসের একটি প্রচণ্ড কৌতুক হয়ে আছে।

যাই হোক, আমীর খশরুর ব্যক্তিসত্তার এটা হলো একটা পার্শ্ববর্তী দিক। তাঁর আসল পরিচয় তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর সৃষ্টিশীল প্রতিভা—সংগীতে ও কাব্যে। উদার অসাম্প্রদায়িক মানবিক ভাবের প্রসারেও তাঁর দান বড় কম ছিল না। আজ থেকে ছ'শো ষাট বছর আগে তেরোশো পঁচিশ খ্রীস্টাব্দে দিল্লী শহরে বাহাত্তর বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

বিশ্ববিশ্রুত গণসংগীতশিল্পী পল রবসন

বিশ্ববিশ্রুত গায়ক পল রবসন এগারো বছর আগে দেহরক্ষা করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল আটাত্তর বৎসর।

শুধু গায়ক বললে পল রবসনের আংশিক পরিচয় নেওয়া হয় মাত্র। তাঁর পরিচয় আরও অনেকগুলি ভূমিকাকে পরিব্যাপ্ত করে বিস্তৃত। তিনি একাধারে গায়ক, অভিনেতা, মুষ্টিযোদ্ধা, ক্রীড়াবিদ্ ও নর্তক। কিন্তু এই সব কৃতিত্বেও তাঁর পরিচয় নিঃশেষিত নয়। শুধু তিনি যে একজন বহুমুখী গুণের অধিকারী প্রতিভা-ধর পুরুষ ছিলন তার হিসাবটাই কেবল এই নানাপথগামিতার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পাওয়া যায়। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে একই মানুষের এককালীন কৃতিত্ব সচারাচর দৃষ্ট না হলেও দুর্লভ নয়। বিশেষত, প্রতিভা নিয়ে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেন তাঁদের পক্ষে শক্তির এই বৈচিত্র্য মোটেই অস্বাভাবিক নয়। পৃথিবীর ইতিহাসে দেশে ও বিদেশে এমন একাধিক প্রতিভাশালী ব্যক্তির সাক্ষাৎ আমরা পাই যাঁদের জীবনে পল রবসনের চাইতেও অনেক বেশী গুণের এককালীন বিকাশ ঘটেছে। আর শুধু গুণের সংখ্যাধিক্যই বা বলি কেন, গুণের গভীরতায়ও তাঁরা রবসনকে ছাড়িয়ে যান।

কিন্তু এমন কিছু কিছু গুণ আছে যা প্রতিভার পক্ষেও আয়ত্ত করা অতি দুঃসাধ্য ব্যাপার। সেই বিরল গুণের অধিকারী ছিলেন শিল্পী পল রবসন, আর এই গুণেই তিনি বিশ্ববাসীর চিত্ত জয় করেছিলেন—পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসকারী নিপীড়িত ও শোষিত মানুষের একান্ত কাছের মানুষ হয়ে উঠে-ছিলেন। সংগীতই হোক আর অভিনয়ই হোক আর ক্রীড়ানৈপুণ্যই হোক, এসব ক্ষেত্রে সিদ্ধিলাভ অত্যন্ত কঠিন হলেও একনিষ্ঠ অনুশীলন ও সাধনার দ্বারা তাকে আয়ত্তের মধ্যে আনা সম্ভব। কিন্তু হৃদয়ের প্রসারতা, মানবপ্রীতির অপরিমেয় সঞ্চয়, অত্যাচারিতের জন্য অন্তরে গভীর বেদনাবোধ এবং অত্যাচারিতের অত্যাচারের কারণ দূর করবার জন্য সর্বস্ব পণ করে সংগ্রাম করার মনোবল—এসব এত সহজ গুণ নয়। প্রতিভা থাকলেই এসব গুন অধিগত হয় না, বরং প্রতিভা অনেক সময় এসকল গুণের পরিস্ফূর্তির বাধক হয়ে দাঁড়ায়, এইটেই বিশ্বসংসারের সচরাচরের অভিজ্ঞতা। এসকল গুণের জন্য চাই বিশাল

একটি হৃদয় আর সেই হৃদয়ে থাকা চাই অফুরন্ত ভালবাসা এবং সেই ভালবাসাকে সর্বমানুষের মধ্যে সার্থক করে তোলবার জন্য অপরিসীম দুঃখ সহনের ক্ষমতা ও দুর্জয় সাহস।

বলা নিষ্প্রয়োজন, পল রবসনের ভিতর এই সব অনন্যসাধারণ হার্দ্যগুণের সমাবেশ ঘটেছিল পুরোমাত্রায় আর সেইটাই প্রধান কারণ যার জন্য তাঁকে হারিয়ে আজ দেশে দেশে সর্বহারা মানুষ আত্মীয়বিয়োগব্যথায় শোকবিহ্বল হয়ে উঠেছে। পল রবসন নিছক অত্যাচারিতের বন্ধু ছিলেন না, তিনি স্বয়ং ছিলেন অত্যাচারিত মানুষের প্রতীক। তাঁর কালো চামড়ার জন্য জীবনে তিনি যে অপরিসীম লাঞ্ছনা ও বঞ্চনা সহ্য করেছিলেন, সেই লাঞ্ছনা-বঞ্চনার অপমান পৃথিবীর তাবৎ দুঃখী মানুষের ভিতর অনুভব করে তার প্রতিকারে যত্নবান হয়েছিলেন। নিগ্রো হয়ে জন্মানোর বেদনাকে তিনি সর্বহারার বেদনায় রূপান্তরিত করেছিলেন। দেশে দেশে ছড়ানো অগণিত সাধারণ মানুষের বঞ্চনার ক্ষোভ ও মনস্তাপ তাঁর প্রতিবাদের মধ্যে দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছিল বললেও চলে। সবার হয়ে তিনি একাই দুঃখের ক্রস বহন করবার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন।

শুধুমাত্র শিল্পী গায়ক নট রবসনকে নয়, সেই তুলনাহীন মানবপ্রেমী রবসনকে আমরা আমাদের প্রাণের সবটুকু আবেগ ঢেলে সশ্রদ্ধ নতি জানাই। তার বিদায় সংগ্রামী মানুষের ইতিহাসে একটা বড় রকমের শূন্যতার সৃষ্টি করলো। তাঁর মহান্ ঐতিহ্য অনুসরণ করেই শুধু আমরা সে-শূন্যতার পূরণ করতে পারি।

২

পল লেরয় রবসন ১৮৯৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সির অন্তঃপাতী প্রিন্সটন শহরে এক নিগ্রো পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন কোয়েকার সম্প্রদায়ভুক্ত ধর্মযাজক। নিতান্ত শৈশবে এক অগ্নিকাণ্ডের ফলে রবসন তাঁর মাকে হারান। পত্নীবিয়োগে মুহ্যমান রবসনের পিতা ওই ঘটনার পর প্রিন্সটনের বাস তুলে দিয়ে পুত্রকে সঙ্গে করে স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়ান অনেকটা উদাসী বিবাগীর মত, তবে ভ্রাম্যমাণ অবস্থায়ও তিনি ছেলের লেখাপড়ার প্রতি উদাসীন ছিলেন না। বালক রবসন সুশিক্ষাই লাভ করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত কলেজের দেউড়ি পেরিয়ে আইন অধ্যয়নের জন্য কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন।

ছোটবেলা থেকেই খেলাধুলায় ও গানবাজনায় তাঁর জুড়ি পাওয়া ভার ছিল। রাটশার্স-এ যখন তিনি কলেজে পড়ছিলেন সেখানকার ফুটবল টীমে শ্বেতাঙ্গ বর্ণ-বিদ্বেষী ছাত্রদের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও তাঁকে গ্রহণ করা হয়। তাঁর অবি-সম্বাদী ক্রীড়ানৈপুণ্যই এই মনোনয়নের মূলে ছিল। আর সংগীতে পারদর্শিতা তাঁর জন্মগত ছিল বললেও চলে। তার প্রশস্ত বক্ষের কোটর নিঃসৃত ভরাট ও বলশালী কণ্ঠস্বর তাঁকে কৈশোর আর প্রাক্-যৌবনেই একজন উদাত্ত কণ্ঠের ('বাস ভয়েস') গায়ক রূপে চিহ্নিত করে এবং নিগ্রো জাতির জাতীয় সংগীত 'নিগ্রো স্পিরিচুয়াল' গানে তাকে সবিশেষ দক্ষতা এনে দেয়। নিগ্রো স্পিরিচুয়াল গানকে ঠিক ধর্মসংগীত বলা চলে না। এই গান আসলে নিগ্রো জাতির সুখ-দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-কামনার সংগীত। এককথায় নিগ্রো জাতির মর্ম-জীবনের সংগীত। সেই সংগীতে রবসন ছোটবেলা থেকেই ছিলেন দুর্ধর্ষ। ছাত্রা-বস্থায় নানা ঘরোয়া জলসায় গান গেয়ে রবসন অশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তাঁর স্বশ্রেণীর মানুষদের মধ্যে এই সময় থেকেই তাঁর নাম মুখে মুখে ফিরতে থাকে এবং তিনি সকলের মনোযোগের বিষয় হয়ে দাঁড়ান। শার্লি গ্রাহাম রব-সনের এই সময়কার সাংগীতিক জীবনের একটি বর্ণনা দিয়েছেন। তার থেকে দেখা যায় তাঁর প্রাণশক্তিও ছিল অত্যন্ত উদ্দাম ও অবারিত। সংগীতশক্তির সঙ্গে এই প্রাণশক্তি মিলে তাঁকে এক জীবন্ত যৌবন-মূর্তিতে পরিণত করে তোলে।

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন পড়া সমাপ্ত করে রবসন এক অ্যাটর্নী অফিসের কাজে যোগ দেন। কিন্তু ছাত্রাবস্থার মত এখানেও বর্ণবিদ্বেষ তাঁকে রাহুর ন্যায় তাড়া করে ফেরে এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে কাজটি ছেড়ে দিতে হয়। জীবিকার তাড়নায় কখনও এই সময়ে তাঁকে মুষ্টিযোদ্ধা, কখনো বাস্কেট-বল খেলার শিক্ষক, কখনো ঘরোয়া আসর ও ক্লাবের গায়ক—একান্তরক্রমে এইসব বিভিন্ন বৃত্তিতে নিয়োজিত থেকে উদরান্নের সংস্থান করতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার কালেই তাঁর পিতার মৃত্যু হয়েছিল। সুতরাং একক ভাবেই এখন থেকে লড়াই করবার পালা শুরু হয়—আত্মনির্ভরতার শিক্ষা পাকা হতে থাকে। কলেজে পড়বার সময় থেকেই অবশ্য তাঁর অর্থার্জন চেষ্টার হাতে-খড়ি হয়েছিল—নিজে রোজগার করে পড়ার খরচ আংশিক মেটাতে হয়েছে। এবারে কর্মজগতের উন্মুক্ত প্রতিযোগিতায় এসে নামলেন।

জীবিকার তাড়নাতেই, ১৯২১ সালে, তিনি থিয়েটারে যোগ দেন। পরবর্তীকালে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী নাট্যকার ইউজীন ও' নীল রবসনের অভিনয় প্রতিভা দর্শনে এতই মুগ্ধ-হন যে, তিনি তাঁর 'অল গডস চিল্লান গট উইংস' (১৯২৪) নাটকে তাঁকে মুখ্য ভূমিকায় অভিনয়ের সুযোগ দেন। নাটকটি খুবই সাফল্যমণ্ডিত হয়। সাফল্যের মূলে ছিল রবসনের অভিনয়ের অসাধারণত্ব। এই ঘটনায় উৎসাহিত হয়ে ও' নীল তাঁর প্রসিদ্ধ নাটক 'এম্পারার জোনস' পুনর্জীবিত করেন শুধুমাত্র রবসনকে নাম-ভূমিকায় অধিষ্ঠিত দেখবার জন্য।

দেখতে দেখতে একজন কুশলী নট হিসাবে রবসনের নাম গোটা মার্কিন মুলুকে ছড়িয়ে পড়ে। পরে ইউরোপেও এই নাম বিস্তৃত হয়। লণ্ডনে শেক্সপীয়ারের 'ওথেলো' নাটকের নাম-ভূমিকায় অভিনয়ে তিনি যে কতবড় চরিত্রাভিনেতা তার পরিচয় রাখেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গ যথাসময়ে বলা যাবে।

রবসন পেশাদার গায়ক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন ১৯২৫ সালে। তাঁর গান শোনবার জন্য নিউ ইয়র্কে হৈ-হৈ রৈ-রৈ পড়ে যায়। নিগ্রো স্পিরিচুয়াল সংগীতের রূপকার এই যুবক গায়কের যশ এতটাই বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল যে, যে কনসার্ট হলে তাঁর গান হতো সেখানে তিল ধারণের জায়গা থাকতো না—অনেককেই নিরাশ হয়ে ফিরে যেতে হতো। এই সময়ের শ্রোতৃমণ্ডলীর মনোভাব ও আচরণ বর্ণনা করে শার্লি গ্রাহাম লিখেছেন—"তারা হাততালি দিয়ে উঠলো। তারা চীৎকার করে উঠলো। তারা তাদের রুমাল নাড়তে লাগলো। তারা পা বাজাতে লাগলো। 'আবার আবার' বলে চেঁচাতে লাগলো। তারা কিছুতেই রবসনকে থামতে দিলে না।"

এদিকে রঙ্গালয়ের জীবনও সমানে চলেছে। এই সময়ে তিনি কিছু কালের জন্য লণ্ডনে আসেন এবং লণ্ডনের অ্যামবাসাডারস থিয়েটারে 'এম্পারার জোনস' নাটকে নাম-ভূমিকায় অভিনয় করেন। ১৯২৬ সালে আমেরিকার বড় বড় শহরগুলিতে ঘুরে তিনি সংগীত ও নাট্য এই দুই বিভাগেই যুগপৎ তাঁর শক্তিমত্তার পরিচয় দেন। এর বছর দুই পর 'পরগি অ্যাণ্ড বেস' নাটকের অভিনয় অন্তে পুনরায় লণ্ডনে আসেন। এবারকার লণ্ডন সফরে জেরোম কার্ন-এর 'শো বোট' নাটকটিতে গান গেয়ে লণ্ডনবাসীদের চিত্ত জয় করেন। নাটকটি জনাকীর্ণ প্রেক্ষাগৃহে কয়েক মাস একাদিক্রমে চলে। এই শো বোট নাটকেরই গান—"ওল' ম্যান রিভার', যে গানটি গেয়ে পল রবসন সমগ্র পৃথিবীর সংগীতামোদী শ্রোতার

হৃদয় হরণ করেছিলেন। তাঁর উদাত্ত প্রাণমাতানো কণ্ঠস্বর এই গানটিতে যেন তার শ্রেষ্ঠ সজীবতার মূর্তি পরিগ্রহ করেছে।

এর পরে ইউরোপের কয়েকটি দেশ পরিভ্রমণ কালে বার্লিনে এসে 'এম্পারার জোনস' নাটকে পুনরায় আত্মপ্রকাশ করেন। এখানে নাটকটির প্রযোজনা করেন প্রসিদ্ধ নাট্যপ্রযোজক ম্যাক্স রেইনহার্ড। তার পরে পুনরপি লণ্ডনে আসেন। এই যাত্রায় ওথেলো নাটকে তাঁর নাম-ভূমিকায় অভিনয় তাঁর নটজীবনের অবিস্মরণীয় কীর্তির মধ্যে গণ্য হওয়ার যোগ্য এক ঘটনা। ঘটনাটির পৃষ্ঠপট তাৎপর্যপূর্ণ।

ওথেলো আর রবসনের ব্যক্তিত্বের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। শেক্সপীয়ারের ওথেলো নাটকের ওথেলো একজন মধ্যযুগীয় মূর সেনাপতি—কৃষ্ণাঙ্গ। অসাধারণ শৌর্য-বীর্য আর যুদ্ধনৈপুণ্যের দ্বারা ভেনিসীয় রাজ্যের সেনাপতির বহুকাঙ্ক্ষিত পদে উন্নীত হয়েছেন এবং ভেনিসের ডিউকের দরবারের সিনেটার অ্যাবান্সিওর কন্যা ভেসডিমোনার হৃদয় জয় করে তাঁর পাণিপীড়নের অধিকার লাভ করেছেন। এ সমস্তই সম্ভব হয়েছে বহু বাধাবিঘ্ন জয় করার অন্তে—ভেনিসের বর্ণাভিমানী অভিজাতরা পদে পদে ওথেলোর উন্নতিতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছেন কিন্তু সফল হতে পারেননি। ওথেলোর বীরত্ব, মাহাত্ম্য আর ব্যক্তিগত সততা আর নিঃস্বার্থতার সদৃষ্টান্তের পাষাণে প্রতিহত হয়ে তাঁদের সমস্ত জারিজুরি ভোঁতা হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে এ যুগের রবসনও একজন কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রো সন্তান। তাঁর জীবন-যুদ্ধে অগ্রসর হবার পথে তাঁকে প্রতি ইঞ্চি জমির জন্য লড়াই করতে হয়েছে মার্কিনী শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের বর্ণশ্রেষ্ঠত্বের অভিমানের বিরুদ্ধে—আজও সে-সংগ্রামের বিরাম হয়নি। আজ তিনি একজন সফল গায়ক অভিনেতা ক্রীড়াবিদ্, শিল্পের শ্রেষ্ঠ জয়মুকুট তাঁর শিরোপরি আস্তৃত, অপ্রতিরোধ্য যৌবনশক্তির তিনি এক মূর্তিমন্ত বিগ্রহ, তা সত্ত্বেও তাঁর বিরুদ্ধে চক্রী ক্রিয়াকলাপের অবসান হয়নি। তাঁকে পর্যুদস্ত আর অপদস্থ করবার জন্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহলের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র লেগেই আছে। কাজেই ওথেলোর জীবনের ছাঁচ আর রবসনের জীবনের ছাঁচে আশ্চর্য মিল কালের দুস্তর ব্যবধান আর পরিবেশের বহুতর বিভিন্নতা সত্ত্বেও। দুইয়ের ব্যক্তিত্বের এই ভাবসাদৃশ্য ওথেলোর অভিনয় প্রাণবন্ত করে তুলতে রবসনকে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করেছে। বস্তুতপক্ষে, এই অভিনয়ে তিনি জাদু সৃষ্টি করেছেন। বিলেতের কাগজ 'মর্নিং পোস্ট' রবসনের অভিনয় দেখে

অকারণে লেখেননি যে, "এ এক মহান অভিনয়, কলকোলাহলময় উদ্দীপনার সঙ্গে দর্শক সমাজ কর্তৃক গৃহীত।"

এর বহু বৎসর পরে শেক্সপীয়ারের জন্মস্থান স্ট্র্যাটফোর্ড-অন-অ্যাভনে পল রবসন ওথেলোর ভূমিকায় আবারও আত্মপ্রকাশ করেছিলেন বেশ কয়েকবার। প্রত্যক্ষদর্শী একজন লেখকের স্মৃতিচারণ এখানে উদ্ধৃত করছি: "গোটা স্টেজ জুড়ে থাকতেন পল রবসন। রাজসিক চেহারা। চোখের সামনে ভাসত নিজের পদমর্যাদা সম্পর্কে সচেতন এক মূর সেনাপতি। চলাফেরা এবং বাচনভঙ্গীতে আনতেন স্বকীয়তা। সহজ সুন্দর অনাবিল হাসিতে ধরা পড়ত অদ্ভুত সারল্য। বজ্রকঠিন মুহূর্তে রুক্ষ চাহনিতে দুর দুর করে কাঁপত বুক। বিধাতার শ্রেষ্ঠ দান পল রবসনের কণ্ঠ। গান এবং আবৃত্তিতে তা অনন্য। ডেসডিমোনাকে হত্যার সঙ্কল্প নিয়ে তিনি যখন ঢুকতেন তখন তাঁর মুখের দিকে চাইতেই আতঙ্কে শিউরে উঠতেন দর্শকরা। ওথেলোর বুকটা ঈষৎ আন্দোলিত হত। ভিতরে চলছে যেন এক অমানুষিক দ্বন্দ্ব। কণ্ঠের গাম্ভীর্য তাতে দিত রক্ত-করুণ আলপনা। তাঁকে ধিক্কার দেবেন, না, জড়িয়ে ধরে কাঁদবেন—বুঝতে পারতেন না শ্রোতারা। তাঁরা দুই বিপরীতমুখী আবেগে বোবা হয়ে যেতেন।" ('যেমন দেখেছি পল রবসনকে', প্রফুল্ল চন্দ, যুগান্তর, ১৪ মাঘ ১৩৪০)

লেখক শুধু ওথেলো অভিনয়ের বিবরণ দিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি, ওথেলোর অভিনয়ে সিদ্ধকীর্তি আর দুইজন প্রসিদ্ধ ইংরেজ অভিনেতা লরেন্স অলিভিয়ার ও জন গিলগুডের অভিনয়ের তুলনায় কোথায় রবসনের অভিনয়ের শ্রেষ্ঠত্ব তাও বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। বলা বোধ করি অনাবশ্যক যে, এই শ্রেষ্ঠত্বের চাবি-কাঠি নিহিত আছে ওথেলো আর রবসনের চরিত্রের সাদৃশ্যের মধ্যে, যার কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। ওথেলো যদি রবসনের অভিনয়ে প্রাণ পরিগ্রহ না করবে তো কার অভিনয়ে করবে? দুইয়ের ব্যক্তিত্বের সাযুজ্যই দুইয়ের মধ্যে একাত্মতার কারক।

তিরিশের দশকটিকে রবসনের জীবনে চলচ্চিত্র শিল্পে অভিনয়ের কাল বলে গণ্য করা যেতে পারে। এই সময়ে পর পর এইসব ছবিতে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন—দ্য এম্পারার জোনস (১৯৩৪), স্যাণ্ডার্স অব দ্য রিভার (১৯৩৫), শো বোট (১৯৩৭), সঙ অব দ্য ফ্রিডম (১৯৩৭), কিং সলোমনস মাইনস (১৯৩৭), জেরিকো (১৯৩৭), বিগ ফেলা (১৯৩৮), দ্য প্রাউড ভ্যালী (১৯৪০), টেলস

অব ম্যানহাট্টান (১৯৪৩), ইত্যাদি ।

এরই ফাঁকে ফাঁকে চলতে থাকে তাঁর ক্রমাগত শিল্প-সফর। এক ফাঁকে (১৯৩৪) তিনি সস্ত্রীক ঘুরে আসেন সোভিয়েট রাশিয়া এবং রাশিয়ার নব-নির্মাণের অভিনবত্বে সবিশেষ মুগ্ধ হন। তাঁর মন কমিউনিস্ট মতবাদের দিকে আকৃষ্ট হয়। ইউরোপের অনেকগুলি দেশ দেখে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু প্রত্যাবর্তন করলেন পরিবর্তিত মানুষ হয়ে—তাঁর ভাবজগতে তখন নতুন চিন্তার আলোড়ন চলছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দিনগুলিতে তাঁকে বাধ্য হয়ে দেশে থাকতে হলো। ১৯৪৩ সালে নিউইয়র্ক শহরের রঙ্গমঞ্চে তিনি পুনরায় ওথেলো নাটকের নাম-ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। নাটকটি এতই জনপ্রিয় হলো যে, বার বার তা পুনরভিনয়ের ব্যবস্থা করতে হয়। সর্বসাকুল্যে এই দফায় ২৯৬ বার নাটকটি মঞ্চস্থ করতে হয়। শোনা যায় শেক্সপীরীয় কোন নাটকের এককালীন অভিনয়ের এইটেই সর্বোচ্চ রেকর্ড।

৩

পাশ্চাত্ত্য সংগীতের প্রকৃতি আমাদের সংগীতের ধাঁচ-ধরন থেকে এতই বিভিন্ন যে, রবসনের সাংগীতিক প্রতিভার প্রকৃত মূল্যায়ন করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। পাশ্চাত্ত্য ক্লাসিকাল সংগীতই হোক আর জনপ্রিয় আধুনিক সংগীতই হোক তাঁদের সংগীতে কণ্ঠস্বরের বিশিষ্ট একটি ভূমিকা আছে এবং কণ্ঠস্বরের প্রকৃতি অনুযায়ী সেখানে গায়ক-গায়িকাদের শ্রেণী নির্ণয় করা হয়। আমাদের ভারতীয় সংগীতের এরকম রীতি নয়। ভারতীয় সংগীতে সুরসৃষ্টিটাই মুখ্য—মেলডি ভারতীয় সংগীতের প্রাণ। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্ত্য কণ্ঠসংগীতে আবেগের রূপায়ণ এবং আবেগের মাধ্যমে নাটকীয়তার ব্যঞ্জনা সৃষ্টিকে সমধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। কাজেই পাশ্চাত্ত্য কণ্ঠসংগীতে কণ্ঠ সুরেলা হওয়াই যথেষ্ট নয়, কণ্ঠ যথেষ্ট বলিষ্ঠ হওয়া দরকার। কেননা আবেগ আর নাটকীয়তা শান্ত, মৃদু কণ্ঠে অভিব্যক্ত হওয়া সম্ভব নয়, তা সে কণ্ঠ যতই সুরেলা আর সুরকে বিচিত্র ভঙ্গীতে লীলায়িত করার ক্ষমতা যুক্ত হোক না কেন। বিশেষ, পুরুষ কণ্ঠশিল্পীদের বেলায় কণ্ঠস্বরের এই বলশালিতা একান্ত প্রয়োজন। তা নয় তো গান মিনমিনে শোনাতে পারে এবং মিনমিনে শোনালে গানের অভীপ্সিত লক্ষ্যই ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে।

এই মানদণ্ডে বিচার করে দেখলে পল রবসনের কণ্ঠস্বরকে অসাধারণ বল-

শালী ও ওজঃগুণ বিশিষ্ট কণ্ঠস্বর বলা যায়। কণ্ঠের প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি খাদ স্বরের ('বাস') গায়ক। অর্থাৎ মোটা ও গম্ভীর তাঁর কণ্ঠ, ভারতীয় সংগীতের পরিভাষা ব্যবহার করে বলছি, উদারা গ্রামে তার স্থিতি। পাশ্চাত্ত্য সংগীতে পুরুষ কণ্ঠশিল্পী যাঁরা উদারা গ্রামে গান করেন তাঁদের বলে 'বাস', মুদারা অর্থাৎ মধ্যম গ্রামে যাঁরা গান তাঁদের বলা হয় 'ব্যারিটোন', আর চড়া গলায় যাঁরা গান তাঁদের বলে 'টেনর'। এই তিনের পার্থক্য কী রকম বলব? পাঠকদের মধ্যে অনেকেই ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ, ওস্তাদ গোলাম আলি খাঁ আর ওস্তাদ আবদুল করিম খাঁর গান শুনে থাকবেন। পাশ্চাত্ত্য কণ্ঠসংগীতের মানদণ্ড অনুযায়ী ফৈয়াজ খাঁ হলেন 'বাস', গোলাম আলি খাঁ 'ব্যারিটোন', আর আবদুল করিম খাঁ 'টেনর'।

বিশালদেহী প্রশস্তবক্ষ কণ্ঠশিল্পী রবসনের কণ্ঠস্বর তাঁর দেহের বলশালিতার অনুরূপ ছিল—মোটা, গভীর-গম্ভীর, গাঢ়তা বা তিগ্মতা ('ইনটেনসিটি') যুক্ত। মোটা হলেও তাঁর গলা বাজখাঁই নয়, ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের বেলায় যে-দোষের কথা কেউ কেউ বলে থাকেন। এই কণ্ঠস্বর নিয়ে রবসন যখন 'ওল' ম্যান রিভার' কিংবা ঘুমপাড়ানি সুরের গান 'মাই কার্লি-হেডেড বেবি', কিংবা এক নিগ্রো দাসের মাতৃভূমির স্মৃতিসম্বলিত 'মাই ওল্ড কেনটাকি হোম', কিংবা বিখ্যাত মার্কিন লোকগীতি 'জন ব্রাউনস বডি' (জন ব্রাউন ছিলেন শ্বেতাঙ্গ নিগ্রো-প্রেমিক, নিগ্রো ক্রীতদাসদের পক্ষে বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার 'অপরাধে' তাঁর ফাঁসী হয়) প্রভৃতি গান গাইতেন, তাঁর কণ্ঠস্বর গোটা হল্ জুড়ে গম গম করে উঠতো আর চকিতে সমস্ত শ্রোতা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়তেন। রবসনের কণ্ঠস্বরের প্রকৃতি, তাঁর স্বরক্ষেপের পদ্ধতি, তাঁর গলা চড়ানোর কায়দা এসব বর্ণনায় বোঝানো যাবে না, তার বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করতে হলে তাকে শুনতে হবে। গানের সৌন্দর্য বচনে ধারণীয় নয়।

রবসনের 'নিগ্রো স্পিরিচ্যুয়াল' গানের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ 'ডীপ রিভার', 'সাইলেণ্ট নাইট হোলি নাইট', 'নিয়ারার মাই গড', প্রভৃতি গান। নিগ্রোজাতির মর্মব্যথা, যীশুখৃষ্টের ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ঘটনার মধ্যে নিগ্রোজাতির শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে লাঞ্ছিত হওয়ার প্রতীকতার সন্ধান, কতক পরিমাণে মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের কল্পিত ক্ষতিপূরণের আশ্বাসের মধ্যে সান্ত্বনা খোঁজা—এসব বিভিন্ন ভাবের সংমিশ্রণে নিগ্রো স্পিরিচ্যুয়াল আমেরিকান নিগ্রোদের জাতীয় সংগীতে

পরিণত হয়েছে।

তবে রবসন মূলত নিগ্রো স্পিরিচুয়াল গানের গায়ক হলেও অন্যবিধ সংগীতেও তাঁর কৃতিত্ব কম নয়। একটি ঘুমপাড়ানি গানের (লালেবাই) উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। তাঁর আর একটি প্রসিদ্ধ ঘুমপাড়ানি গান হলো—এথেলবার্ট নেভিন-রচিত মাইটি লেক এরোজ'। বিষাদের গানের তিনটি শ্রেষ্ঠ নমুনা উইলিয়াম ক্রিস্টোফার হ্যাণ্ড-রচিত 'সেণ্ট লুইস্ ব্লুজ' এবং ডিউক এলিংটন-রচিত 'মুড ইনডিগো' ও 'ইন মাই সলিচ্যুড ইউ ফাউণ্ড মি'।

রবসন লোকসংগীতেরও সবিশেষ চর্চা করেছেন। বস্তুত, এক্ষেত্রে তিনি বিশেষজ্ঞজনোচিত অনুশীলন করেছিলেন। তার প্রমাণ রয়েছে তাঁর গানের মধ্যে —প্রসিদ্ধ চেক লোকগীতিকার অ্যাণ্টোনিন ভোরাক-রচিত 'সঙস্ মাই মাদার টট মি'-র সুরভঙ্গীতে রচিত অনুরূপ সুরের গান, রুশ প্রাচীন লোকগীতি 'নাইট' ও 'ভল্গা বোট সঙ' গান, প্রসিদ্ধ মার্কিন লোকগীতি 'জন ব্রাউনস বডি লে' প্রভৃতি।

পাশ্চাত্ত্য কণ্ঠসংগীতে কণ্ঠস্বরের তিনটি বৈশিষ্ট্য সর্বাধিক স্বীকৃত—তিগ্মতা বা প্রগাঢ়তা (ইনটেনসিটি), রূপ (টিম্বার) এবং ওজন বা পরিমাণ (পিচ)। এই ত্রিবিধ মানদণ্ডের বিচারেই রবসনের কণ্ঠস্বরকে একটি আদর্শ কণ্ঠস্বর বলা যায়। তাঁর কণ্ঠস্বর প্রগাঢ়, গম্ভীর আর ওজনদার হলেও অত্যন্ত কমনীয় ও সুমিষ্ট। ভারী গলার সঙ্গে কমনীয়তা তথা সুমিষ্টতার সহাবস্থান খুবই বিরলদৃষ্ট একটি গুণ।

তবু বলব নিছক সংগীতশিল্পের উৎকর্ষের দিক দিয়ে রবসন তাঁর দেশের কোন্ পর্যায়ের গায়ক আমাদের পক্ষে তা নিরূপণ করা সম্ভব নয়। আমরা তাঁর গানের ভাষাগত আবেদন, আবেদনের ঐকান্তিকতা, জনপ্রিয়তার ব্যাপ্তি, কণ্ঠস্বরের ঐশ্বর্য ইত্যাদির ধারণা করতে পারি, কিন্তু তাঁর গানের সাংগীতিক মূল্য কষতে হলে পাশ্চাত্ত্য সংগীতের ভূমিতে দাঁড়িয়ে সে কাজ করতে হবে এবং বলাই বাহুল্য যে, ওই ব্যাপারে অধিকারী-অনধিকারী ভেদ স্বীকার করে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত। নিগ্রো স্পিরিচুয়াল গানের এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী পল রবসন। সে গানের এক দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য রয়েছে—নিগ্রোজাতির মর্মবেদনার ইতিহাস তার সঙ্গে জড়ানো। ওই ইতিহাসের পটভূমি, অনুষঙ্গ, উত্থান-পতনের লয়, প্রবহমানতা ইত্যাদির বিষয়ে স্পষ্ট জ্ঞান না থাকলে দশ হাজার মাইল দূরের দেশে বসে এবং

সম্পূর্ণ বিপরীত সাংগীতিক আবহাওয়ায় নিঃশ্বাস নিয়ে তার সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা নিজে করা এবং পরকে দেওয়ানো রীতিমত কঠিন ব্যাপার। সুতরাং নম্রতাই এক্ষেত্রে বিস্তৃত আলোচনা না করার একমাত্র কৈফিয়ত।

৪

পল রবসন সোভিয়েট রাশিয়া ভ্রমণে গিয়েছিলেন এবং সে দেশের রাষ্ট্র-পুনর্গঠনের বিরাট আয়োজন দেখে মুগ্ধ হন, সে কথা পূর্বেই বলেছি। এটি দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার পাঁচ বছর আগেকার ঘটনা। তদানীন্তন রাশিয়ার যে জিনিসটি তাঁকে সবচেয়ে মুগ্ধ করেছিল তা হলো মানুষে মানুষে সমত্বের বোধ এবং সাধারণ মানুষকে মানবীয় মর্যাদা দান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থার সঙ্গে তুলনা করে তিনি এই পার্থক্যটিকে সবিশেষ গুরুত্ব দেন এবং সেই অনুভব থেকেই শিল্পী রবসনের চেতনার রূপান্তর পর্বের শুরু হয়। যিনি ছিলেন নিছক আর্টিস্ট, আত্মপ্রকাশের শিল্পের একাধিক বিভাগে অবলীলায় বিচরণ করতেন, তাঁর ব্যক্তিত্বে নতুন আয়তন যুক্ত হলো—তিনি হয়ে দাঁড়ালেন একজন সমাজসচেতন মানবপ্রেমী শিল্পী। তাঁর জীবনের নির্যাতনের বেদনাকে বহু মানুষের নির্যাতনের বেদনার সঙ্গে মিলিয়ে এবং তাদের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে দিয়ে তিনি সর্বহারার দুঃখমোচনের এক শিল্পী হয়ে দাঁড়ালেন। সাম্যবাদী আদর্শ তাঁর গোত্রান্তর ঘটালো বললেও অত্যুক্তি হয় না।

নিজ দেশে এবং নিজ জীবনে পল রবসন কী দেখেছেন? দেখেছেন পদে পদে লাঞ্ছনা অবিচার অন্যায়—রাষ্ট্রিক ও সামাজিক শাসন ও শোষণের যুপমূলে ব্যক্তিমানুষের উৎসাদন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় শুধু ধনী নির্ধনের দুস্তর বৈষম্যই তিনি প্রত্যক্ষ করেননি, সেই সঙ্গে প্রত্যক্ষ করেছেন শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গদের মর্মান্তিক ব্যবধান, বণিকতন্ত্রের অপরিমিত লোভ ও লালসা, সাম্রাজ্যবাদীদের উদ্ধত দম্ভ। মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে গিয়ে পদে পদে তাঁকে বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয়েছে: স্কুলে-কলেজে পড়ার সময় শ্বেতাঙ্গ ছাত্ররা তাঁর সঙ্গে মেশেনি, তাঁর উন্নতিতে বাধা দিয়েছে; কর্মজীবনে প্রবেশের মুখেই তাঁকে বর্ণান্ধতার বলি হয়ে প্রথমপ্রাপ্ত কর্ম ত্যাগ করতে হয়েছে; যতবড় প্রতিভা-শালী মানুষই তিনি হোন না কেন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরা তাঁকে মর্মে মর্মে বুঝিয়ে ছেড়েছে গুণহীনতার সঙ্গে যদি থাকে ধনের গরিমা ও তথাকথিত বর্ণশ্রেষ্ঠত্বের

তকমা, তাহলে সত্যিকার গুণবত্তাকে লাঞ্ছিত করবার পক্ষে ওই গুণহীনতারই তড়পানির অন্ত থাকে না। গুণবানকে নির্গুণের হুল ফোটানো ও মর্মবিদ্ধ করা সংসারের নিত্যকার অভিজ্ঞতা ও সংসারের এক বড় অভিশাপ। পুঁজিবাদী মার্কিন সমাজে রবসনকে পদে পদে এই অভিশাপের শিকার হতে হয়েছিল। তাঁকে উপর থেকে চাপানো হীনমন্যতার মনস্তাপ হাড়ে হাড়ে হৃদয়ঙ্গম করতে হয়েছিল।

কিন্তু সোভিয়েটে দেখলেন অন্য চিত্র। এখানে ধনী-নির্ধনের তফাত নেই। তার চাইতেও বড় কথা, সাম্যতন্ত্রী সমাজ-ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ব্যক্তিগত মুনাফা প্রভৃতির বিষদাঁত ভেঙে দেওয়া হয়েছে—উৎপাদনের প্রধান প্রধান বাহনগুলি রাষ্ট্রের অর্থাৎ জনসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্র-ব্যবস্থা আর সাম্যতন্ত্রী সমাজ-ব্যবস্থার পার্থক্যটা সহজেই ধরতে পারলেন। রবসনের সহানুভূতি স্পষ্টতই সমাজতন্ত্রী সমাজ-ব্যবস্থার অনুকূলে গেল।

অবশ্য স্টালিনের আমল ক্রুশ্চভ ও পরবর্তীদের আমল এক ব্যাপার নয়। যে-রাশিয়ায় রবসন গিয়েছিলেন তা স্টালিনের নেতৃত্বচালিত রাশিয়া। পরে রাশিয়ার নেতৃত্বের নীতি ও কার্যাবলীর মধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এই পরিবর্তিত ব্যবস্থাকে অন্তরের সঙ্গে স্বীকার করতে তাঁর বেধেছিল কি? অনেকে বলেন এই দ্বিধাই প্রধান কারণ, যার জন্য জীবনের শেষের দিকে আর তিনি কখনও সোভিয়েট রাশিয়া সম্পর্কে মুখ খোলেননি। জীবনের শেষ দশ-বারো বছর তিনি প্রকৃতপক্ষে জনজীবন থেকে অবসরগ্রহণ করে স্বেচ্ছা-নীরবতা বরণ করে নিয়েছিলেন।

যাই হোক, এ তো অনেক পরেকার কথা। যখনকার কথা হচ্ছিল তখনকার কথাই বলি।

রবসন সোভিয়েট পরিভ্রমণান্তর দেশে ফিরে এসে তাঁর কৃষ্ণাঙ্গ ভাইদের একত্রে সমবেত করে মানবিক অধিকার রক্ষার আন্দোলন গড়ে তুললেন। তিনি আপনাকে কমিউনিস্ট আদর্শের সমর্থক বলে প্রকাশ্যে প্রচার করলেন। আমেরিকার নিগ্রো সিভিল রাইটস আন্দোলনের এক প্রধান স্তম্ভ হয়ে উঠলেন তিনি—নিগ্রোদের মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে তাঁকে সর্বদাই আন্দোলনের পুরোভাগে পাওয়া গেল। শুধু আন্দোলন পরিচালনা করেই তিনি ক্ষান্ত থাকলেন না, তাঁর স্বজাতির মানুষদের উদ্দীপিত করবার মত একটা স্বপ্নও তুলে

ধরলেন তাঁদের চোখের সামনে। সেই স্বপ্ন হলো: নিগ্রোজাতির আদি বাসভূমি আফ্রিকায় এক যুক্তরাষ্ট্র (ইউনাইটেড স্টেটস অব আফ্রিকা) প্রতিষ্ঠা, যে-যুক্তরাষ্ট্রে পৃথিবীর তাবৎ দেশের নিগ্রো নরনারী সমবেত হয়ে সম্পূর্ণ নিজেদের মনোমত এক রাষ্ট্র-ব্যবস্থার পত্তন করবেন, যেখানে থাকবে না শোষণ, বৈষম্য, অত্যাচার ও বর্ণান্ধতার পীড়ন।

অনেকটা ইহুদীদের স্বভূমি প্রতিষ্ঠা করার মত এক ব্যাপার, তবে বাহ্যত মিল থাকলেও 'জিওনিস্ট' আন্দোলনের সঙ্গে এই নিগ্রো জাতির স্বদেশ স্থাপন আন্দোলনের তফাত এখানে যে, শেষোক্ত আন্দোলনের লক্ষ্য সাম্যবাদী আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত ; সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তপুষ্ট জিওনিস্ট আন্দোলনের মত ধনতন্ত্রী ও আগ্রাসনী নীতির উপর স্থাপিত নয়। বর্ণান্ধতার জ্বালা নিজ জীবনে ও স্বশ্রেণীর অন্যান্য মানুষদের জীবনে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন বলে রবসন তার থেকে চিরকালের জন্য মুক্তির একটা উপায় হিসাবে এই "স্বভূমির" ডাক দিয়েছিলেন— এর ভিতর জাতিগত সঙ্কীর্ণতার কোন কথা ছিল না, আগ্রাসনী মনোবৃত্তির তো একেবারেই নয়।

রবসনের এই নতুন ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ বর্ণদ্বেষীদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করলো, নিগ্রোজাতির ঐক্য ও সঙ্ঘবদ্ধতার মধ্যে তারা শ্বেতাঙ্গ প্রভুত্বের অবসানের সূচনা দেখতে পেলো। রবসনের প্রভূত সম্মান ও জনপ্রিয়তায় ইতোমধ্যেই তাদের মনে যথেষ্ট গাত্রদাহের সঞ্চার হয়েছিল, এবারে তাঁর বিরুদ্ধে আক্রোশ চরিতার্থ করার একটা প্রত্যক্ষ কারণ খুঁজে পেলো। তারা তাঁকে 'কমিউনিস্ট' আখ্যা দিয়ে ডাইনী-শিকারে মাতলো। মার্কিনী গণতন্ত্রের এমনি মহিমা যে, সে দেশে বিভিন্ন পরস্পর-বিরোধী রাজনৈতিক মতবাদের সহাবস্থানে বাধা না থাকলেও কেউ কমিউনিস্ট বলে সন্দেহ হলে তাঁর আর রক্ষা নেই, তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে শ্বেতাঙ্গ জনতার বেসরকারী আদালতে অপরাধী হিসাবে সোপর্দ করা চলে। আর ওই কমিউনিস্ট মতবাদী মানুষটি যদি কৃষ্ণাঙ্গ হন তাহলে তো আর কথাই নেই, একেবারে সোনায় সোহাগা। কমিউনিস্ট-বিদ্বেষ আর বর্ণান্ধতায় মিলে শত্রুতায়-শত্রুতায় ছয়লাপ হয়ে ওঠে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কমিউনিস্ট হওয়াটা একটা মহা অপরাধের সামিল বলে গণ্য করা হয়। সেখানকার রেওয়াজ অনুযায়ী কাউকে 'কমিউনিস্ট' বলা মানেই তাকে গাল দেওয়া। আর সে দেশের অধিকাংশ লোককেও বলিহারি যাই, তারা

এই যুক্তিহীন, ক্ষতিকর, কিম্ভূত মনোভাবকে নির্বিচারে মেনে নিয়ে তাদের গণতন্ত্রের অন্তঃসারশূন্যতাকেই শুধু প্রমাণ করে। কমিউনিজম আর দশটা রাজনৈতিক মতবাদের মতই একটা মতবাদ ; ধনতন্ত্র আর সাম্রাজ্যবাদের পাঁচনসেবী মার্কিন দেশের অধিবাসীদের ওই মতবাদ ভাল না লাগতে পারে, তাই বলে তার সম্বন্ধে অসহিষ্ণু আর হিস্টিরিয়াগ্রস্ত হওয়ায় কী অর্থ থাকতে পারে ?

রবসনের কপালে লাঞ্ছনার আর সীমা-পরিসীমা রইলো না। নিগ্রো হয়ে জন্মানোর অপরাধে ছাত্রবয়স থেকে তাঁকে লাঞ্ছনা-নিপীড়ন সইতে হয়েছে, এবারে তার সঙ্গে যুক্ত হলো কমিউনিস্ট মতবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার অপরাধ। তিনি লেনিনকে নিয়ে পর্যন্ত গান বেঁধেছেন, গান গেয়েছেন—'অ্যাট দ্য কল অব কমরেড লেনিন'—সুতরাং তাঁর আর পার পাওয়ার কী রইলো! কে তাঁকে এবারে ডাইনী-শিকারীদের হাত থেকে রক্ষা করবেন ? রবসনের গানের কনসার্ট বন্ধ করার চেষ্টা করা হলো। তাঁর রেকর্ডগুলি বাজার থেকে তুলে নেওয়া হলো। তাঁকে নিগ্রহ করা হলো, এমনকি তাঁর শ্রোতারাও নিগ্রহ থেকে রেহাই পেলেন না। লিঞ্চিংয়ের সূক্ষ্ম রকমফের তাঁদের উপর চালানো হলো। তাঁর বিরুদ্ধে 'ম্যাকার্থিজমের' ভূতগ্রস্ত 'আন-আমেরিকান অ্যাকটিভিটিজ কমিটি' এই বলে অভিযোগ আনলো যে, তিনি কমিউনিস্ট বনে গেছেন, সুতরাং মার্কিনী গণতন্ত্রের নিরাপত্তার পক্ষে তাঁর মার্কিন দেশে অবস্থিতি বিপজ্জনক। এই অভিযোগের উত্তরে রবসনকে আদালতে দাঁড়িয়ে শপথ নিতে হলো যে, তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য কখনই ছিলেন না।

কিন্তু তাতেই কি ডাইনী-শিকারীদের কোপ প্রশমিত হলো ? ১৯৪৯ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, ফ্রান্স, সুইডেন, রাশিয়া, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশ ঘুরে প্রভূত সম্মান-প্রতিপত্তি নিয়ে স্বদেশে ফিরলেন। আবার ইংলণ্ডে যাওয়ার আয়োজন করছিলেন, কিন্তু তাঁর পাসপোর্ট বাতিল করে দেওয়া হলো। এই নিষেধাজ্ঞার ফলে আট বছর তাঁর বিদেশে যাওয়া বন্ধ রইলো। শেষে সুপ্রীম কোর্টের হস্তক্ষেপের ফলে ওই অন্যায় নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়, পুনরায় রবসনের বিদেশ গমনের পথ সুগম হয়।

রবসন তাঁর শ্বেতাঙ্গ স্বদেশবাসীদের হস্তে যতই নিগৃহীত উৎপীড়িত হোন না কেন, মানবিকতার ভূমি থেকে সরে গিয়ে কখনই সেই নিগ্রহ-উৎপীড়নের 'বদলা' নিতে যাননি—অটল ধৈর্যে ও অপার সহনশীলতায় সমস্ত রকমের উপদ্রব সহ্য

করেছেন। এটা অন্যায়ের সঙ্গে আপস করা নয়, এটা স্বীয় আদর্শে অবিচলিত বিশ্বাস ও ওই আদর্শের চূড়ান্ত জয়ে গভীর আস্থাশীলতারই প্রমাণ। এই আপাত-শান্তিপূর্ণ, নির্বিরোধ অবস্থানের মধ্যে যে শক্তিমত্তা নিহিত রয়েছে তা প্রয়োজনের কালে প্রচণ্ড আকার ধারণ করতে পারে, এমনকি পর্বত পর্যন্ত টলাতে পারে। এটা যে কথার কথা নয়, সে জিনিস পরবর্তীকালে প্রমাণ হয়েছে রবসনেরই ভাবশিষ্য মার্টিন লুথার-কিং (জুনিয়ার) ও তাঁর সহযাত্রীদের প্রবর্তিত সিভিল রাইটস আন্দোলনের প্রবলতা ও বিপুল জনপ্রিয়তার মধ্যে। মার্টিন লুথার কিংকে সাম্রাজ্যমদগর্বী বর্ণবিদ্বেষীদের রোষাগ্নিতে জীবন আহুতি দিতে হয়েছে—রোষ এক্ষেত্রে রূপ পেয়েছে বুলেটের গুলিতে— ; রবসনকে অবশ্য বুলেটের গুলিতে জীবন বিসর্জন দিতে হয়নি, তবে তাঁর উপর দিয়েও ঝড় বড় কম যায়নি। সে ঝড়ের দাপট তিনি সহ্য করেছেন বিশাল বনস্পতির প্রতিরোধ ক্ষমতা দিয়ে, বনস্পতির মতই তিনি শেষ অবধি অজেয় থেকেছেন। সেইজন্যই তাঁর পক্ষে বলা সম্ভব হয়েছে—

But I keep laughing
Instead of crying
I will keep on fighting
Until I am dying.

তা যদি না হতো তো পঞ্চাশের দশকের শেষে ও ষাটের দশকের শুরুতে আবার তিনি ইউরোপে গিয়ে শান্তি, মৈত্রী, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও যুদ্ধ-বিরোধিতার আদর্শ প্রচার করতে পারতেন না, পারমাণবিক চক্রান্তের বিরুদ্ধে মানবীয় বিবেককে সঙ্ঘবদ্ধ করবার আন্দোলনের চেষ্টায় আর সব সহযাত্রীদের শরিক হতে পারতেন না। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে জানা যায়, পারমাণবিক যুদ্ধের বিরোধিতা ও বিশ্বশান্তির কামনা পরিব্যক্ত করবার জন্য অলডার মাস্টেন থেকে যাত্রা শুরু করে লণ্ডনের ট্রাফালগার স্কোয়ারে যে-'লং মার্চ'-এর পরিসমাপ্তি ঘটেছিল, তার উদ্যোক্তাদের একজন ছিলেন রবসন। যাত্রাশেষে নেলসন স্তম্ভের নীচে যে সভা হয় তাতে আর সব নেতারা বক্তৃতার মাধ্যমে তাঁদের বক্তব্য জানালেন কিন্তু রবসন ধরলেন গান। গানের মধ্য দিয়েই তিনি শ্রোতার চিত্ত ছুঁয়ে গেলেন ও তাঁদের হৃদয়ে বিশ্বশান্তির আকাঙ্ক্ষা মুদ্রিত করে দিলেন। গানশেষে তাঁর সঙ্গে করমর্দনের জন্য শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। তিনি নম্রনত মস্তকে

সকলের অভিবাদন গ্রহণ করলেন।

এই হলেন পল রবসন। সেই পল রবসন আর নেই। তাঁর উদাত্ত কণ্ঠস্বর চিরকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেছে—দরাজ ও ভরাট গলায় গাওয়া তাঁর 'ওল' ম্যান রিভার' গান শ্রোতারা আর কখনো শুনতে পাবেন না। নির্যাতিতের জন্য সংগ্রামে অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বদানের পর্বেও ছেদ ঘটলো। কিন্তু রবসনের প্রভাব এত সহজে মুছে যাবার নয়। তিনি মানবপ্রেমের ও নিপীড়িতের দুঃখ মোচনের জন্য সংগ্রামের যে মহান ঐতিহ্য রেখে গেলেন তা সর্বহারা শ্রেণীর মানুষের পথ-চলায় আলোক-বর্তিকার কাজ করবে—তা থেকে তারা বাধাজয়ের ও এগিয়ে চলার প্রেরণা পাবে। চূড়ান্ত সংগ্রামে বিজয়ী হওয়ার সংকেতও তার মধ্যে নিহিত।

অজয় ভট্টাচার্যের গান

রবীন্দ্রোত্তর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকার অজয় ভট্টাচার্যের জন্ম কুমিল্লায় ১৯০৬ সালে। তাঁর পিতা রাজকুমার ভট্টাচার্য (চক্রবর্তী) কুমিল্লা কোর্টের উকিল ছিলেন। এঁদের আদিনিবাস ত্রিপুরা জিলার (বাংলাদেশ সরকার বর্তমানে এই জিলার নামকরণ করেছেন কুমিল্লা জিলা, জিলার সদর শহরের নামানুসারে, ভারত ইউনিয়নের অন্তর্গত পার্শ্ববর্তী ত্রিপুরা রাজ্যের সঙ্গে পার্থক্য বোঝাবার জন্যও হয়ত এই নাম বদলের প্রয়োজন ছিল) শ্যামগ্রাম নামক এক গণ্ডগ্রামে। তবে এঁরা বরাবর কুমিল্লাতেই বসবাস করেছেন এবং সেখানকার জনজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে ছিলেন।

অজয় ভট্টাচার্য যখন বাংলার সংগীতজগতে আত্মপ্রকাশ করেন এবং বাংলা গানের রচয়িতা রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত তখন তাঁর পাশাপাশি আরও কয়েকজন গীতিকার বাংলা গানের জগতে প্রতিষ্ঠার অধিকারী হয়েছিলেন। এঁরা হলেন —সুবোধ পুরকায়স্থ, শৈলেন রায়, প্রণব রায় প্রমুখ। এইসব সমসাময়িক ও কমবেশী স্বনামধন্য গীতিকারদের বাদ দিয়ে কেবলমাত্র অজয় ভট্টাচার্যকে এই প্রবন্ধে মনোযোগের বিষয়রূপে বেছে নেওয়ার একটাই মাত্র কারণ—উল্লিখিত গীতিকারদের তুলনায় অজয় ভট্টাচার্যের সঙ্গে এই লেখকের যোগাযোগ ছিল বেশী এবং উপরন্তু তাঁরা একই শহরের অধিবাসী ছিলেন। অবশ্য সুবোধ পুরকায়স্থও কুমিল্লার বাসিন্দা ছিলেন, তবে পারিবেশিক নানা কারণে তাঁর সঙ্গে সংযোগ পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই লেখক কুমিল্লার যে-'পূর্বাশা' চক্রের সদস্য ছিলেন অজয়দা ছিলেন তার শীর্ষপতি বা সভাপতি। সুতরাং সেটাও একটা অতিরিক্ত কারণ যার জন্য তাঁর সঙ্গে লেখকের মেলামেশার সুযোগ ঘটেছিল অনেক বেশী।

অজয়দা'রা তিন ভাই। জ্যেষ্ঠ বিজয়কুমার ভট্টাচার্য একজন কৃতী ছাত্র ও পরবর্তী জীবনে সার্থক শিক্ষাজীবী রূপে বিভিন্ন সরকারী স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসাবে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করার পর অবসরগ্রহণ করেন। কনিষ্ঠ সঞ্জয় ভট্টাচার্য বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত একটি নাম—'পূর্বাশা' সাহিত্যপত্রের সম্পাদক ও আধুনিক কালের একজন খ্যাতনামা কবিরূপে তাঁর স্মৃতি আজও অম্লান রয়েছে। অজয়দা মধ্যম। তিনিও জ্যেষ্ঠাগ্রজের মত মেধাবী ছাত্র ছিলেন।

১৯২৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে একাধিক পদক লাভ করেন। পরে শিক্ষকতার বৃত্তি গ্রহণ করেন। কলকাতা তীর্থপতি ইনস্টিটিউশনে শিক্ষকতায় নিযুক্ত থাকা কালেই তাঁর গীতিকাররূপে প্রতিষ্ঠার স্ফুরণ। স্বল্পায়ু জীবনে সিনেমা, গ্রামোফোন ও রেডিওর জন্য কম করেও দু'হাজারের মত গান লিখেছিলেন। জীবনের একেবারে শেষের পর্বে চলচ্চিত্র পরিচালনায় আত্মনিয়োগ করেন। প্রথমে প্রমথেশ বড়ুয়ার সহকারীরূপে, পরে স্বাধীনভাবে চিত্র পরিচালনায় ব্রতী হন। তাঁর পরিচালিত ছবির নাম—'অশোক' ও 'ছদ্মবেশী'।

তিন ভাই-ই আজ গতাসু। মাত্র সাঁইত্রিশ বছর বয়সে (২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৪৩) অজয় ভট্টাচার্যের দেহান্ত ঘটে। গীতিকার, কবি ও চিত্রনির্মাতা হিসাবে যখন তাঁর প্রতিভা অযুত সম্ভাবনা নিয়ে পূর্ণ পরিণতির পথে অগ্রসর হচ্ছিল ঠিক সেই সময়ে একটি মূল্যবান জীবন বৃন্তচ্যুত হয়ে ঝরে গেল। এই অকাল প্রয়াণের বেদনা রাখবার ঠাঁই নেই। ওই বিয়োগান্ত ঘটনার পরে প্রায় তেতাল্লিশ বছর কেটে গেছে। আমরা যাঁরা তাঁর কাছের মানুষ ছিলাম ও আজও বেঁচে আছি, তাঁদের স্মৃতিতে ওই হারানোর দুঃখ এখনও সজীব আছে।

আমি লেখক-শিল্পী-কবি-গীতিকারদের জীবন খুঁটিয়ে পর্যালোচনা করে দেখেছি, যাঁরাই শিল্পের কোন-না-কোন বিভাগে শক্তিমত্তার স্বাক্ষর রেখে উত্তরজীবনে খ্যাতি প্রতিপত্তি অর্জন করেন, বাল্য ও কৈশোর কালে ওই বিভাগ ছাড়াও অন্য বিভাগের শিল্পচর্চায় তাঁদের ঝোঁক ও অনুরাগ থাকে। যেমন, যিনি কবি হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন তিনি হয়ত ছোটবেলার ছবি আঁকতেন; যিনি নাট্যকার বা অভিনেতা রূপে লোকপ্রিয় হয়েছেন তাঁর হয়ত ছোটবেলায় গান-বাজনার বিশেষ শখ ছিল; যিনি সংগীতজ্ঞরূপে কীর্তিমান হয়েছেন তিনি হয়ত এককালে কবিতা লিখতেন; যিনি কথাকার হিসাবে জনমনধন্য তিনি হয়ত স্কুল-কলেজে পড়ার কালে অভিনেতা হিসাবে বিশেষ নামডাক অর্জন করেছিলেন—এম্নিধারা সব অদ্ভুত খেয়ালের বৈচিত্র্যের দ্বারা জীবন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হতে দেখা যায়। শিল্পগুলির একটির সঙ্গে অন্যটির কোথায় যেন একটা অদৃশ্য যোগ আছে, যা আপাতদৃষ্টিতে সব সময় ধরা পড়ে না। এবং এই বিচারে খতিয়ে দেখলে শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে সব শিল্পকলাই মূলত একটি উৎস থেকে উৎসারিত—পরে তারা ভিন্ন ভিন্ন স্রোতে ভিন্ন ভিন্ন দিকে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

অজয়দা'র বেলায়ও এ নিয়মের ব্যতিক্রম ছিল না। তিনি স্কুলে-কলেজে অভিনয়শিল্পী রূপে যৎপরোনাস্তি খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন, উপরন্তু নাট্য-রচনাতেও যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। (যেমন তাঁর ছোট ভাই সঞ্জয় ভট্টাচার্য প্রধানত কবিখ্যাতিতে চিহ্নিত হলেও এককালে চিত্রচর্চাতেও যথেষ্ট নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছিলেন। এ এক মহারহস্য, যার জাদুক্রিয়ার ফলে শিল্পগুলি ঘন ঘন ক্ষেত্রবদল করে এবং এক ক্ষেত্র থেকে অন্য ক্ষেত্রে অবলীলায় যাতায়াত করে।) আমার মনে আছে আমরা যখন কুমিল্লা শহরের সেরা মাধ্যমিক বিদ্যালয় ঈশ্বর পাঠশালার ছাত্র, ক্লাস সিক্সে পড়ি, তখন শারদ অবকাশের প্রাককালে, স্কুল ছুটি হওয়ার দিনে, স্টেজ খাটিয়ে স্কুলে যে নাটকটির অভিনয় হয় 'অগ্নিবীর' —তার রচয়িতা ছিলেন অজয় ভট্টাচার্য। তিনিও ঈশ্বর পাঠশালার ছাত্র ছিলেন, তবে যে সময়ের কথা বলছি তখন স্কুলের দেউড়ি পেরিয়ে কলেজে প্রবেশ করেছেন। কিন্তু, যেমন ছোট মফস্বল শহরে সচরাচর ঘটে থাকে, স্কুল পেরোলেও স্কুলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয় না। অজয়দা কলেজের ছাত্র হয়েও তাঁর প্রাক্তন বিদ্যালয়ের তাবৎ সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে ঘনিষ্ঠরূপে যুক্ত ছিলেন। স্কুলের ছেলেদের জন্য নাটক লিখে দিয়েই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না, ওই নাটকের মূল ভূমিকায়ও তিনি অভিনয় করেছিলেন। পরে তাঁকে কলেজে ও টাউন হলের স্টেজে আরও বহু নাটকে অভিনয় করতে দেখেছি, কিন্তু বালক মনের উপর অগ্নিবীর নাটকের 'হীরো'র যে ছাপ ফেলেছিল তা আর সব প্রভাবকে ছাপিয়ে আজও বুঝি অক্ষয় হয়ে আছে।

যেমন পড়ায়, লেখায়, নাট্যচর্চায় তাঁর জুড়ি ছিল না তেমনি খেলাধুলায়ও তাঁর উৎসাহ ছিল প্রচণ্ড। খেলার মাঠে তাঁর নিত্য সক্রিয় উপস্থিতি অবধারিত ছিল। স্বাস্থ্য ভাল ছিল না, তাই নিজে খেলতে নামতেন না, কিন্তু ফুটবল খেলার রেফারী হিসাবে হুইসল-মুখে তাঁর মাঠময় দাপিয়ে বেড়ানো ধরাবাঁধা একটা দৃশ্য ছিল। আজ আমরা বৃদ্ধ, কৈশোরের অনেক স্মৃতিই ম্লান হয়ে গেছে, কিন্তু অজয়দা'র এই ক্রীড়কবেশী মূর্তিটা দেখছি আজও স্মৃতির পটে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। স্মৃতিতে কী যে থাকে আর কী যে মুছে যায় তার কিনারা কে করবে ?

২

গীতিকার রূপে যে-গানটি লিখে অজয়দা প্রথম জনসমক্ষে আসেন সেটি একটি গজল—'হাস্নুহানা আজ নিরালা ফুটিলি কেন আপন মনে'। এতে সুরসংযোগ করেন হিমাংশু দত্ত, পরবর্তীকালের সুপ্রসিদ্ধ সুরকার ও বাংলার সারস্বত সমাজ কর্তৃক 'সুরসাগর' উপাধিতে ভূষিত গুণী। তিনিও আমাদের একই শহরের বাসিন্দা, সে সময় সুবোধ পুরকায়স্থ ও অজয় ভট্টাচার্য ওই দুজনারই লেখা গানে সুর-সংযোগ করে চলেছেন। তুলনায় সুবোধ পুরকায়স্থের গানেই বেশী। তবে পরে অজয়দা'র গানেই বেশী সুর দিয়েছেন। অজয়দা'র গজল অঙ্গের গানে তিনি আর পরে তেমন সুর করেননি, কিন্তু কাব্যগীতি রাগপ্রধান বর্গের অনেক গান পরে তাঁর সুরে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

এই প্রসঙ্গে হিমাংশু দত্ত সুরসাগর মহাশয়ের কথা একটু বলি। হিমাংশু দত্ত অজয়দা'র কাছাকাছি বয়সের মানুষ ছিলেন, তবে তাঁর সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা তেমন পাকা হবার অবসর হয়নি। তার কারণ তিনি বেশীরভাগ সময় কলকাতায় থাকতেন, ছুটিছাটায় মাত্র কুমিল্লা আসতেন। তাঁর বাগিচাগাঁওয়ের বাড়িতে শিল্প-সংস্কৃতির একটা পরিশীলিত আবহাওয়া ছিল। তিনি রবীন্দ্রনাথ ও ক্ষিতি-মোহন সেনশাস্ত্রীর স্নেহধন্য ছিলেন। রবীন্দ্রসংগীত তাঁর খুব ভাল জানা ছিল, এদিকে শাস্ত্রীমহাশয় যখন কুমিল্লা আসতেন তাঁর ধর্মসভার ভজনগানগুলি গাইবার ভার পড়ত হিমাংশু দত্তের উপর। কিন্তু রবীন্দ্রসংগীত বা ভজন তাঁর একমাত্র অধিকারের বিষয় ছিল না, তিনি ক্লাসিকাল গানও খুব ভাল জানতেন। রাগ-রাগিণীর বিবিধ প্রকরণ সম্বন্ধে তাঁর বিলক্ষণ জ্ঞান ছিল। আর একটি বড় গুণ তাঁর ছিল—গান শুনে সঙ্গে সঙ্গে স্বরলিপি তৈরী করার বিরল ক্ষমতা। এই সমস্ত বিবিধ গুণের সমবায়ে হিমাংশু দত্ত পরে বাংলা গানের জগতে এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুরকারের স্বীকৃতি পান। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অজয় ভটাচার্যের মত তাঁরও জীবন অকালে অবসিত হয়। অজয়-হিমাংশু জুটি গীতিকার-সুরকারের একটি চমৎকার জুটিতে পরিণত হয়েছিল। ওই সম্পর্ক যদি আরও বহুকালস্থায়ী হতে পারতো তো বাংলা গানের বাগানে আরও কত সুন্দর-সুন্দর ফুলই না ফুটে উঠতে পারতো। নবনবোন্মেষশালিনী সৃষ্টিশীলতার বিপর্যয়সাধনে অকালমৃত্যুর বিধ্বংসী ভূমিকা যে কত সাংঘাতিক সে তো আমাদের জীবদ্দশাতেই বারে বারে আমাদের প্রত্যক্ষ করতে হলো।

অজয় ভট্টাচার্যের বাণী আর হিমাংশু দত্তের সুর—একটা সময়ে আমাদের গানের ডালিতে সবচেয়ে বেশীসংখ্যক গানের জায়গাটি দখল করে নিয়েছিল। আধুনিক বাংলা গান বলতেই আমরা তখন মুখ্যত বুঝতাম অজয়গীতিতে হিমাংশু-স্বরারোপিত গীতরচনার নতুন সৃষ্টি। আজি আমারি কথা / ওগো বিমনা সাঁঝে ; তব স্মরণ খানি / যদি আমারি প্রাণে ; বাজে রিনিকিঝিনি / তাহারি নূপুরধ্বনি ; এলো যে চৈতী হাওয়া গন্ধউতল বনে বনে ; ঝরা চামেলি বনে ; ছিল চাঁদ মেঘের পারে ; ফাগুন আজি কেন ; যে পথে যাবে চলি মুকুল যেও দলি ; ইত্যাদি।

এগুলির অধিকাংশই কাব্যসঙ্গীত, প্রেমগীতিও বলা যায়। কথা কমনীয় সুরও কমনীয়। কিন্তু একটা সময় এলো যখন অজয়ের কমনীয় কথায় দত্ত হিমাংশু রাগসংগীত সুরের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালালেন। এগুলি রাগপ্রধান গান নামে পরিচিত। ইংরেজীতে বলা হয় 'ক্লাসিকো-মডার্ন সঙস্'। অর্থাৎ, গানের সুরভিত্তি হলো একটি রাগ আর তার ভাব হলো আধুনিক, প্রায়শ রোমান্টিক রস, এই আধুনিক ভাবকল্পনার মধ্য দিয়ে পরিবেশিত। শ্রেণীর বিচারে এ গানগুলির বৈশিষ্ট্য এখানে যে, এসব গানের ভিত্তিতে আছে একটি রাগ বা রাগিণী, যাকে কেন্দ্র করে গানটির সুরের কাঠামো গড়ে উঠেছে। তবে একটা কথা। হিন্দী-ভাঙা বাংলা খেয়ালের সঙ্গে এ গানগুলিকে এক করে দেখলে ভুল করা হবে। বাংলা খেয়াল হিন্দুস্থানী খেয়ালের হুবহু তর্জমা বিশেষ, শুধু তার কথাটাই যা বাংলা ; আর রাগপ্রধান বাংলা গানের মূল রস কাব্যিক / রোমান্টিক, তবে ওই রসের রূপায়ণে রাগের সাহায্য নিয়ে তাকে একটা দৃঢ়সংবদ্ধ আকার দেওয়ার চেষ্টা এই গানগুলিতে অতিপ্রত্যক্ষ। রাগপ্রধানের ভাব কোমল কিন্তু সুর সংযত ও অমিশ্র। এরকম যোগাযোগ বাংলা গানে সচরাচর দেখা যায় না।

আমি আমার 'সংগীত-পরিক্রমা' ও 'বাংলার গীতচর্চা' বই দুটিতে রাগপ্রধানের শ্রেণীস্বরূপ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। রাগপ্রধানের বৈশিষ্ট্যের সম্যক্ ধারণা পাওয়ার জন্য কৌতূহলী পাঠক সে-বই দুটি নাড়াচাড়া করে দেখতে পারেন। এখানে এর বেশী আর আলোচনার অবকাশ নেই।

হিমাংশু দত্ত এবারে অজয় ভট্টাচার্যের বাণীতে রাগপ্রধানের অবয়ব সংযোজন করলেন। ফলে গড়ে উঠলো সেইসব বিখ্যাত গান, যেগুলির সঙ্গে অল্পবিস্তর সকলেই পরিচিত। এই বর্গের গানের মধ্যে সমধিক প্রচারিত (গ্রামোফোন

রেকর্ডের দৌলতে)—মম মন্দিরে এলে কে তুমি (আড়ানা) ; আলোছায়া দোলা উতলা ফাগুনে (বাহার) ; যদি দখিনা পবন আসিয়া ফিরে গো দ্বারে (গান্ধার) ; আজি রাতে কে আমারে (ভীমপলশ্রী) ; মঞ্জু রাতে আজি তন্দ্রা কেন হে প্রিয় (মালগুঞ্জ) ; ইত্যাদি। এই গানগুলি কণ্ঠের জাদুকর শচীন দেববর্মণ রেকর্ডে গেয়ে সেগুলির আবেদন একদা দেশময় ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। এক সময়ে এই তিনটি নাম বলতে গেলে একসঙ্গে উচ্চারিত হতো—কথায় অজয় ভট্টাচার্য, সুরযোজনায় হিমাংশু দত্ত, কণ্ঠরূপায়ণে শচীনদেব বর্মণ। গানের রাজ্যে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর ত্রিবেণীসংগম।

এভিন্ন অন্য গায়কের কণ্ঠে অজয়-হিমাংশু জুটির রাগপ্রধান গানের দৃষ্টান্ত: ফাগুনের সমীরণ সনে (দুর্গা) ; আজি মধু রাতে কার বাঁশী বাজে হায় (তিলক কামোদ) ; জাগি রজনী (তিলঙ) ; ফিরে এলো শ্রাবণ-ধারে (জয়জয়ন্তী) ; ছিল চাঁদ মেঘের পারে (পুষ্পচন্দ্রিকা) ; ইত্যাদি। শেষোক্ত রাগটি হিমাংশুর স্বয়ং উদ্ভাবিত—একদা গীতা দাস - আরতি দাস ভগিনীদ্বয়ের কণ্ঠে প্রায়ই গীত হতে শুনেছি।

হিমাংশু দত্ত প্রয়াত হলেন, তখন অজয়দা'র গানের সুরসংযোজনার ক্ষেত্রে যে-শূন্যস্থানের উদ্ভব হলো তার পূরণে এগিয়ে এলেন শচীনদেব বর্মণ, একাই সুরকার ও কণ্ঠশিল্পীর যুগ্মভূমিকা পালনের দায়িত্ব নিয়ে। এই পর্যায়ে শচীনদেব অজয়দা'র কত গানের যে সুর দিয়েছেন তার লেখাজোখা নেই। তাঁর গ্রামোফোন রেকর্ডে গাওয়া এরকম গান অজস্র। কয়েকটির উল্লেখ করছি—বঁধু এলো মধু রাতে, স্বপন না ভাঙে যদি শিয়রে জাগিয়া রবো, তুমি তো বঁধু জানো, তুমি যে গিয়াছ বকুল বিছানো পথে, প্রিয় আজো নয় আজো নয়, প্রেমযমুনারি পারে মম হিয়া কেঁদে মরে, কাঁদিব না ফাগুন গেলে, কণ্ঠে তোমার দুলব বলে গানের মালা গাঁথি, গোধূলির ছায়াপথে, প্রেমের সমাধি তীরে, ইত্যাদি।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে শচীনদেব অজয় ভট্টাচার্যের এইসব গানের কথায় সেই সমস্ত সুর ব্যবহার করেছেন যা তাঁর নিজ কণ্ঠের সমধিক উপযোগী ছিল—মোলায়েম কান্নাপ্রবণ ভাবাবেগপ্রধান সুর। যথা, ভীমপলশ্রী, পিলু, খাম্বাজ, কাফি, সিন্ধু, সিন্ধুড়া, পটদীপ, ধানী, ভৈরবী, ইত্যাদি। শচীনদেবের কণ্ঠ ভারী রাগ রূপায়ণের পরিবর্তে এই সব হাল্কা চালের রাগেই সমধিক স্ফূর্তি পেত, তাই তিনি অজয় ভট্টাচার্যের গানের বাণীতে এইসব রাগ-

রাগিণীর প্রতিই সমধিক পক্ষপাত ন্যস্ত করেছেন। এই ক্ষেত্রে হিমাংশু দত্তের সঙ্গে শচীনদেবের এই পার্থক্য যে, সুরকার রূপে হিমাংশু অনেক ঋজুমেরুদণ্ডী, সংযত-সংহত, দৃঢ়পিনদ্ধ, পক্ষান্তরে শচীনদেব তুলনায় রীতিমত কমনীয়-নমনীয়, মোলায়েম ভাবাবেগে বেপথু। তাঁর সুরের wailing-এর ভাবটি তাঁর গানের শক্তিও বটে দুর্বলতাও বটে। অজয় ভট্টাচার্যের গানের lyrical উপাদানের সঙ্গে ওই কমনীয়-নমনীয় সুরের দোলা খাপ খায় বটে, তবে সুরের সংযমবন্ধনদৃঢ় ঋজু-কঠিন রূপটি যে কিছু-পরিমাণে ব্যাহত হয় সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। আলোচনায় এ জিনিস ঠিক বোঝানো যাবে না, বুঝতে হলে সামনা-সামনি গান শুনতে হবে। ধ্রুপদ আর টপ্পা-ঠুংরীর আবেদনে যে তফাত, হিমাংশু আর শচীনদেবের সুরের বাঁধুনিতে ঠিক সেই তফাত। অথচ অজয়ের গানের বাণী দুজনের বেলাতেই কম-বেশী এক, কিন্তু সুরের আবেদনের কত-না তারতম্য। তবু সব বলা হলেও একটি কথা থেকেই যায় যে, শচীন দেববর্মণ গায়ক হিসাবে এক অনন্য শিল্পী। তাঁর কণ্ঠে মধু মাখানো আছে আর সেই মধু ঝরানো কণ্ঠের প্রসাদেই অজয়-গীতি আজও অপরিম্লান আছে।

শচীনদেব শুধু অজয়ের কাব্যগীতি গেয়েই ক্ষান্ত থাকেননি, তাঁর ভাটিয়ালি ঢঙ-এর গানগুলিকেও গ্রামোফোনে কণ্ঠায়িত করেছেন। এরূপ গান অজয়-গীতির ভাণ্ডারে একাধিক রয়েছে। তার কিছু নমুনা : ওরে সুজন নাইয়া / কোন বা কন্যার দেশে যাওরে চাঁদের ডিঙা বাইয়া ; ফুলের বনে থাকো ভ্রমর ফুলের মধু খাও / আমার কথা কণ্ঠে লইয়া বঁধুর দেশে যাও ; কে যাবি চল্ বৃন্দাবনে / যারে নাগাল পাই / প্রাণনাথ বঁধুরে পাইলে অঙ্গেতে মিশাই ; মনের কথা কইবার আগে আঁখি ঝইর‍্যা যায়, শ্রবণে বধির হব, না শুনিব বাঁশী / নয়ন উপাড়ি দিব, না হেরিব হাসি, / বাঁশীর সুরে ডুবে আমি ত্যজিব পরাণ ; ইত্যাদি।

শচীনদেবের কণ্ঠে অজয়ের ভজন গানের দৃষ্টান্ত : প্রাণের প্রভু রহে প্রাণে রয় না বাহিরে, / ফুলের খেলায় চাঁদের মেলায় কোথায় পাবি রে ; সাজে নওল কিশোর চাঁদের তিলকে / (তার) বনফুলমালা দোলে ; ইত্যাদি। আগমনী গান : স্বপন দেখেছে গিরিরাণী ; বিজয়ার গান : বিদায় দাও গো মোরে।

সুরসুধাকর দিলীপকুমার রায়ও অজয় ভট্টাচার্যের কয়েকটি ভক্তিমূলক গানে সুরারোপ করেছিলেন। তাঁর দুটি গানের নমুনা : সেই ভাল মা এম্নি করে / লুকিয়ে থাকিস অন্ধকারে ; আমার মনের মাঝে মন রয়েছে সেথায় ফোটে অচিন ফুল, /

সবাই বলে ওরে পাগল এ যে শুধু মনের ভুল। শেষোক্ত গানটির ভিতর দেহতত্ত্ব-ঘেঁষা বাউল গানের স্পষ্ট আমেজ আছে। এ গানটি দিলীপকুমার শ্রীঅরবিন্দকে তাঁর মতামতের জন্য পাঠিয়েছিলেন। শুনেছি অরবিন্দ তাঁর উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন। তবে এইজাতীয় রচনা অজয়ের মূল ধারার মধ্যে পড়ে না, কতকটা ফরমায়েসের তাগিদেই তিনি এই গানগুলি লিখেছিলেন বলে সন্দেহ হয়। অজয়ের সহজাত প্রতিভা বিকশিত হয়েছিল কাব্যগীতিতে, বিশেষ করে প্রেমসংগীতে। এই ক্ষেত্রে প্রথম দিক্‌কার রচনায় রবীন্দ্রপ্রভাব কিছুটা থাকলেও পরে তিনি সে-প্রভাব কাটিয়ে উঠেছিলেন, ক্রমাগত চর্চায় নিজস্ব একটা ভাব-শৈলীর উদ্বর্তন ঘটিয়েছিলেন। ছন্দে-মিলেও তিনি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। সেইজন্যই তাঁর গানগুলি আজও কালের ব্যবধান পেরিয়ে সমাদৃত : নতুন প্রজন্মের গায়কদের কণ্ঠেও কমবেশী অনুশীলিত।

সিনেমার প্রয়োজন মেটাতেও অজয়দা অজস্র গান লিখেছিলেন। এই ক্ষেত্রে তাঁর গানে প্রধানত সুর সংযোগ করেছিলেন হিমাংশু দত্ত, পঙ্কজকুমার মল্লিক, অনুপম ঘটক, কমল দাশগুপ্ত, শচীন দেববর্মণ, এবং আরও কেউ কেউ। রূপালী পর্দায় গীত তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গান—যবে কণ্টক পথে হবে রক্তিম পদতল/ অন্তরে ফুটিবে যে সুন্দর শতদল (ডাক্তার ছায়াচিত্র) ; দুঃখে যাদের জীবন গড়া তাদের আবার দুঃখ কি রে (অধিকার) ; বাংলার বধূ বুকে তার মধু নয়নে নীরব ভাষা (শাপমুক্তি) ; প্রেম নহে মোর মৃদু ফুলহার দিল সে দহনজ্বালা (জীবন-মরণ) ; বন্দর ছাড়ো যাত্রীরা সবে জোয়ার এসেছে আজ (ছদ্মবেশী) ; শেষ হলো মোর অভিযান (অধিকার) ; বাঁধিনু মিছে ঘর ভুলের বালুচরে (জীবনমরণ), মনে নয় বনে (গরমিল) ; ইত্যাদি। এছাড়া, এই পেয়েছি অনলজ্বালা তারেই শুধু চাই ; একটি পয়সা দাও গো বাবু একটি পয়সা দাও ; কোন্ লগনে জনম নিলাম এই দুনিয়ার ঘরে ; নূতনের স্বপন দেখি বারে বারে ; পাখী আজ কোন্ কথা কয় শুনিস কিরে ; প্রেমের পূজায় এই তো লভিলি ফল ; শুনি ডাকে মোরে ডাকে প্রভৃতি সিনেমার গানগুলিও একসময় খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। সিনেমার এসব গানে কণ্ঠ দান করেছেন সায়গল, কানন দেবী, শচীন দেববর্মণ, রবীন মজুমদার প্রমুখ প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পীগণ।

আমি শচীনদেবের গাওয়া রাগপ্রধান গানের উল্লেখ করেছি, এবারে উল্লেখ করব প্রসিদ্ধ ওস্তাদ ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের গাওয়া রাগপ্রধান গানগুলির কথা।

তার সব কটিতেই অজয় ভট্টাচার্যের রচিত বাণী সুরের অবলম্বন রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। ভীষ্মদেবের এই রাগপ্রধান গানগুলি সুরৈশ্বর্যের বিচারে এক অভিনব ধরনের সৃষ্টি—তাদের কোন দোসর নেই। সেসব গান যেমন সুরবিস্তারে অসামান্য, তেমনি সরগম প্রয়োগে সাতিশয় কলানিপুণ। এসব গানে ভীষ্মদেবের কণ্ঠ যুক্ত হওয়ায়, অজয়গীতি যেন একটা নতুন আয়তন পেয়েছে, তাদের ভাব-ব্যঞ্জনা বৃদ্ধি পেয়েছে। অজয়ের কথা, ভীষ্মদেবের সুর ও কণ্ঠদান—একেই বুঝি বলে সোনায়-সোহাগা। সব কয়টিই গ্রামোফোন রেকর্ডে গীত, তাতে গ্রামোফোন কোম্পানীরও মর্যাদা বেড়েছে।

অজয় ভীষ্মদেব সহযোগে সৃষ্ট এরূপ কিছু রাগপ্রধানের উল্লেখ নীচে করছি: ফুলের দিন হলো যে অবসান (জয়জয়ন্তী); তব লাগি ব্যথা ওঠে গো কুসুমি (দেশী টোড়ী); নবারুণ রাগে তুমি সাথী গো (ভৈরবী); আলোক গগনে (রামকেলি), যদি মনে পড়ে সেদিনের কথা আমারে ভুলিও প্রিয় (কাফি-ভৈরবী); শেষের গানটি শুনিয়ে যাবো (সিন্ধু খাম্বাজ); ইত্যাদি।

৩

অজয়দা'র জীবদ্দশায় তাঁর এইসব গীতিগানের সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছিল—'সুরপরী', 'আজি আমারি কথা', 'শুকসারী' ও 'মিলনবিরহগীতি'। প্রকাশক ডি. এম. লাইব্রেরী। এখন এসব বই পাওয়া যায় কিনা ঠিক বলতে পারব না। ওই ডি. এম. লাইব্রেরী থেকেই একদা প্রকাশিত হয়েছিল হিমাংশুকুমার দত্ত, সুরসাগর-কৃত গান ও স্বরলিপির বই 'চাঁদ ও চামেলি' এবং শচীন দেববর্মণ কৃত 'সুরের লিখন'। দুটি বইতেই অজয় ভট্টাচার্যের অনেক কয়টি গানের স্বরলিপি বিধৃত আছে।

ওই সব বই প্রকাশের বহু বছর বাদে, মাত্র কয়েক বছর আগে, মদীয় সম্পাদনায় অজয়দা'র আরও একখানি গানের সংকলন প্রকাশিত হয়—'অজয়-গীতি-সংগ্রহ'। বইটির প্রকাশিকা শ্রীযুক্তা রেণুকা ভট্টাচার্য, গীতিকারের সহধর্মিণী। অজয় বৌদি তাঁর স্বামীর দু'হাজারের মত গানের সংগ্রহ থেকে বেছে প্রায় তিনশো গান দিয়ে এই সংকলনটির ডালি সাজিয়েছেন। বইটির শুরুতে এই লেখকের একটি নাতিদীর্ঘ ভূমিকা আছে, যার ভিতর অজয়গীতির কাব্যগত ও সুরগত এই দ্বিবিধ বৈশিষ্ট্যেরই আলোচনা আছে। প্রাপ্তিস্থান এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স, কলিকাতা।

স্বাধীনতা-উত্তর যুগের বাংলা গান

স্বাধীনতার পূর্ব আর স্বাধীনতার পরবর্তী কালের মধ্যে রাজনীতিগতভাবে সীমারেখা টানা যত সহজ শিল্প-সংস্কৃতিগতভাবে সীমারেখা টানা বোধহয় তত সহজ নয়। কেননা শিল্প-সংস্কৃতির চর্চা ধারাবাহিকক্রমে চলতে থাকে, রাষ্ট্রিক পটপরিবর্তনের ফলে সহসা তার প্রবাহ রুদ্ধ হয়ে যায় না বা হঠাৎই তা অন্য খাত বেয়ে চলে না। এরকম বিভাজন সংগীতের ক্ষেত্রে অন্তত সিদ্ধ নয়। অবশ্য রাজনৈতিক পালা বদলের একটা পরোক্ষ ফল নিশ্চয়ই তার উপরে কতক পরিমাণে বর্তায় তবে সংগীতের ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ণ হওয়ার মত ঘটনা বুঝি সেটা নয়।

তবু আলোচনার সুবিধার্থে কোন না কোন পর্ব থেকে আলোচনা শুরু করতে হয়ই। সেই দিক থেকে এইজাতীয় পর্ব-বিভাগের অবশ্যই একটা সার্থকতা আছে। সময়ের সীমা বেঁধে দিলে কিংবা বিচরণের ক্ষেত্রটিকে নির্দিষ্ট করে দিলে অন্য কী সুবিধা অর্শায় জানি না, তবে এটা অন্তত মানতেই হবে যে, আলোচনা তার ফলে সুচিহ্নিত হওয়ার সুযোগ পায়, তার এলিয়ে পড়ার ভয় থাকে না, তা আগে-পিছে ইতস্তত ছুটাছুটি করে বেড়ায় না, এক কথায় নির্ধারিত এলাকার ভিতর চলাচলের অধিকার লাভ করে এক ধরনের স্বস্তি ও আরাম বোধ করে। সেই মানদণ্ডের বিচারে সুবিধাটা বড় কম নয়।

শ্রেণীভেদ

বাংলা গানের কতকগুলি সুস্পষ্ট শ্রেণীভেদ আছে। যথা, প্রাচীন বাংলা গান, রবীন্দ্র, দ্বিজেন্দ্র, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ, নজরুলকে কেন্দ্র করে এ যুগের পাঁচজন শ্রেষ্ঠ বাঙালী গীতিকারের গান, রাগপ্রধান বাংলা গান, আধুনিক নামধেয় বাংলা গান, বাংলা সিনেমার গান, বাংলা লোকসংগীত, কীর্তন, গণসংগীত প্রভৃতি। স্বাধীনতা-উত্তর কালে এই সব কয়টি বর্গের গানেরই রীতিমত অনুশীলন চলছে—শ্রেণীর গুরুত্ব-লঘুত্ব অনুযায়ী কোনটির বেশী কোনটির কম। বর্ণিত শ্রেণীগুলির মধ্যে নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলসংগীত, আধুনিক বাংলা গান, বাংলা ছায়াছবির গান, লোকগীতি এই কয়টি শ্রেণীর গানের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী ; অন্য শ্রেণীগুলির স্থান এগুলির পরে পরে ক্রমবিন্যস্ত, অনুশীলনীয়

মাত্রাভেদ অনুযায়ী। চর্চার পরিমাণের তারতম্যে তাদের মর্যাদারও তারতম্য।

তবু কালানুক্রম বলে একটি কথা আছে। গানগুলির শ্রেণীরূপের বিচারে তাদের পূর্বাপর সময়ের হিসাবটা ধরতে হয়ই। অর্থাৎ ইতিহাসের প্রাসঙ্গিকতা এসে পড়ে। যেমন, প্রাচীন বাংলা গান নামে বাংলা গানের যে ধারাটি প্রচলিত তার প্রচলন যতই সীমিত হোক-না কেন, তার আলোচনাকে পাশ কাটিয়ে গোড়াতেই আমরা, ধরা যাক, সিনেমার গানের আলোচনায় সময়ক্ষেপ করতে পারি না, যদিও আমরা জানি সিনেমার গানের আজ প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা, এমন-কি ক্ষেত্রবিশেষে রবীন্দ্রসংগীতের উপরেও তার আকর্ষণের বহুলতা ও ব্যাপ্তি।

সুতরাং 'ক্রনোলোজি' ধরে আলোচনা করাই যুক্তিযুক্ত। এখানে সেই চেষ্টাই করব।

প্রাচীন বাংলা গান

বাংলা গানের এই ধারাটি ক্রমেই শীর্ণ থেকে শীর্ণতর হয়ে আসছে। নিধুবাবুর টপ্পার ধরনে যে সব বাংলা গান একদা রচিত হতো অথবা ভারতীয় ক্লাসিকাল সংগীতের ঐতিহ্যাশ্রিত ধ্রুপদ বা খেয়ালের আদর্শ অনুসরণ করে একরাগভিত্তিক যে সব বাংলা গান এক সময়ে রচিত ও গীত হতো, আমাদেরই বাল্য ও কৈশোরে এরকম কত গান শুনেছি তার হিসেব নেই—সেই শ্রেণীর গানের প্রতিনিধিত্ব করার মত শিল্পী আজ আর খুব বেশী আমাদের মধ্যে বেঁচে নেই। টপ্পা গাইয়েদের মধ্যে সর্বশেষ বেঁচেছিলেন বিজয়লাল মুখোপাধ্যায়, কালীপদ পাঠক ও কৃষ্ণদাস ঘোষ। তাঁরা আজ বিগত হয়েছেন। এই ধারাব গানের শিল্পীদের মধ্যে এখন সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য—চণ্ডীদাস মাল ও রামকুমার চট্টোপাধ্যায়। চণ্ডীদাস মাল বিশেষ করে টপ্পা গানের শিল্পী, আর রামকুমার টপ্পা এবং একরাগভিত্তিক ধ্রুপদ খেয়াল এই দুই জাতের গানেই সবিশেষ পারদর্শী। তবে রামকুমার গানের কথাপ্রেমে যতটা মুগ্ধ সুরের প্রেমে ততটা মুগ্ধ নন বলে সন্দেহ করি! প্রাচীন বাংলা গান বর্গের গান গাইতে গিয়ে তিনি অনেক সময় বাণী বা কথার সাহায্যে নাটকীয় 'এফেক্ট' সৃষ্টি করার কাজে বেশী মনোযোগ দেন, এটি করার বদলে তিনি যদি সুরসৃষ্টিতে আরও বেশী তদ্গত হতেন তো তাঁর গানের আর মার ছিল না। তাঁর সুরবিস্তার করার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ বলেই বোধকরি তিনি কথার প্রতি এতটা গুরুত্ব আরোপের পক্ষপাতী।

'প্রাচীন বাংলা গান' বর্গের গানে আরেকজন শিল্পী বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে চলেছিলেন—তিনি হিমন্ত রায়চৌধুরী। এজাতীয় গানের কণ্ঠ-রূপায়ণে তাঁর প্রণালীবদ্ধ চর্চা ছিল। দুঃখের বিষয়, কিছুকাল হলো তিনি দেহরক্ষা করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে নবীন প্রজন্মের শিল্পীদের মধ্যে এই শ্রেণীর গানের ধারারক্ষী আর কেউ রইলেন না।

সদ্য-লোকান্তরিতা শ্রীমতী আঙ্গুরবালা দেবীও এই ধরনের গানের একজন সিদ্ধশিল্পী ছিলেন। তাঁর গ্রামোফোন রেকর্ডে গাওয়া 'আমায় হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখা' এবং 'যদি চিরসুন্দর নাহি হবে গো' এইজাতীয় গানের দুটি উৎকৃষ্ট নমুনা। কথা ও সুর উভয় রসে ভরপুর এই দুটি গান পুরাতন ধারার কাব্যগীতির সুন্দর নিদর্শন রূপে গণ্য করা যেতে পারে।

কীর্তন

কীর্তন বাঙালীর জাতীয় সাংগীতিক প্রতিভার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। বৈষ্ণব ভাবের সঙ্গে এর অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক অর্থাৎ ভক্তি এর মূল রস। তবে ভক্তিভাব ছাড়াও এর সাংগীতিক অভিব্যক্তি সম্ভব। যেমন, চর্যাপদের কোন কোনটিতে কীর্তনাঙ্গ সুরের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক কালের পটভূমিতে এলে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর কিছু কিছু প্রেমের গানেও কীর্তনাঙ্গ সুরের প্রয়োগ করেছেন। যথা, তবু মনে রেখো, কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি, আমি রূপে তোমায় ভোলাব না, ইত্যাদি। আজকাল বোম্বায়ের সিনেমার গানেও কীর্তন সুরের ব্যবহার দেখা যায়। কীর্তন এখন বাংলার সীমানা পেরিয়ে ভারতের অন্যান্য প্রান্তেও ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। এটা শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই।

কীর্তনের দুই রূপ—পদাবলী কীর্তন ও ভাঙা কীর্তন। প্রথমটি উচ্চতানলয়-মান যুক্ত সংগীত ও যথেষ্ট অনুশীলন সাপেক্ষ। এর রাগরাগিণীগুলি ক্লাসিকাল সংগীত ভাণ্ডার থেকে আহৃত। 'আখর' পদাবলী কীর্তনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ একপ্রকার কথার তান। অন্যপক্ষে ভাঙা কীর্তন লৌকিক ধারার গানের কোঠায় পড়ে। সাধারণত ভিখিরি-বাউল শ্রেণীর ভ্রাম্যমাণ বৈষ্ণবদের মুখে এই শ্রেণীর গান শুনতে পাওয়া যায়। গানের সঙ্গে সচরাচর ব্যবহার হয় গোপী-যন্ত্র ও খঞ্জনী। খোল-করতাল কদাচিৎ। সুতরাং শ্রেণীর বিচারে এই গানগুলিকে লোকসংগীতের অন্তর্ভুক্ত করাই শ্রেয়।

নবদ্বীপ, ময়নাডাল, কাটোয়া, শ্রীখণ্ড প্রভৃতি অঞ্চলে পদাবলী কীর্তনের যথেষ্ট চর্চা হতো। অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে, সাহিত্যিক খগেন্দ্রনাথ মিত্র, উত্তরা দেবী, শ্রীমতী রাধারাণী, বিজয় মল্লিক ও সম্প্রদায়, রথীন্দ্রনাথ ঘোষ ও সম্প্রদায়, দুঃখহরণ চক্রবর্তী ও সম্প্রদায়—এঁরা সব বিধিবদ্ধভাবে কীর্তন সংগীতের চর্চা করতেন। সুরসুধাকর দিলীপকুমার রায় যখন পণ্ডিচেরী ও পরে পুণা থেকে কলকাতা আসতেন, কীর্তন গানের বন্যায় কলকাতা শহরকে ভাসিয়ে দিতেন। তাঁর মুখে গাওয়া পদাবলী কীর্তনের সগোত্র বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম সখি গানটি অনেকেরই আজও স্মরণে থেকে থাকবে। কিন্তু ইদানীং কীর্তনের অনুশীলনীতে দৃষ্টিগ্রাহ্য ভাঁটার টান লেগেছে বলে মনে হয়। খুব বেশী গায়ক-গায়িকা আজকাল আর কীর্তনেব দিকে আকৃষ্ট হন না। খুব সম্ভব পরিবেশের ভিন্নতাই এর কারণ। তবে প্রদীপটি জ্বালিযে রেখেছেন শ্রীযুক্তা ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর পরিবেশিত কীর্তনগান সত্যিই শ্রবণযোগ্য। গায়িকার ভক্তিমতী স্বরূপ তাঁর গানের সঙ্গে চমৎকার মানিয়ে গেছে। এ ভিন্ন আর যাঁরা কীতন গানের চর্চায় নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন—ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র (ফেলুবাবু), মাধবী ব্রহ্ম, গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়, মাধুরী মুখোপাধ্যায়, প্রভৃতি।

রবীন্দ্রসঙ্গীত

রবীন্দ্রনাথ এক মহান্ সুরস্রষ্টা। পাশ্চাত্ত্যের বড় বড় কম্পোজারের সঙ্গে তাঁর নাম সমসারিতে স্থান পাওয়ার যোগ্য। তবে তাঁর সংগীতের পরিকল্পনায় কম্পোজারই মুখ্য, শিল্পী বা গায়কের স্থান গৌণ। রবীন্দ্রসংগীতের ছকে গায়ক সুরকারেব কার্বন-কপি হলেও চলে, গায়কের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব বা স্বাতন্ত্র্য ততটা জরুরী নয়। এটা ভারতীয় সংগীতের আদর্শের বিরোধী। ভারতীয় সংগীতের কলাপ্রকরণে গায়কের স্বাধীনতা একটা মস্ত বড গণনীয় বিষয়, ইউরোপীয় সংগীতে তার বিপরীত। রবীন্দ্রনাথ জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে তাঁর সংগীত সৃষ্টিতে ইউরোপীয় সংগীতের সংস্কারটাকেই মূলত অনুসরণ করেছেন, ভারতীয় সংগীতের ঐতিহ্য এক্ষেত্রে তাঁর নিয়ামক হয়নি। ঠিক এই কারণেই বলা যায়, রবীন্দ্রসংগীতের সংসারে তাবৎ মনোযোগ কমবেশী সুরকারেরই প্রাপ্য, সুরগুলি যাঁরা কণ্ঠে রূপায়িত করেন সেই সব রূপকারদের ভাগে মর্যাদার ছিটে-ফোঁটাও বুঝি পৌঁছয় না। সত্যি কথা বলতে কি, রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীরা, কিছু উজ্জ্বল ব্যতিক্রম বাদ

দিলে, রাবার-স্ট্যাম্প গাইয়ে ছাড়া আর কিছু নন। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তাঁরা স্বরলিপিনির্ভর তোতাপাখির মুখস্থবিদ্যানার গাইয়ে অপিচ রাগরাগিণীর জ্ঞানের পৃষ্ঠপটবর্জিত। তার উপর, রবীন্দ্রসংগীতে সুরবিস্তার এবং / কিংবা তান-ক্রিয়াব স্বাধীনতা না থাকায় বুঝতে পাবা যায় না কোন্ শিল্পী যথার্থ দক্ষ পর্যায়ের গায়ক, কোন্ শিল্পী নন। তাঁদের ভালমন্দ বিচারের একমাত্র মাপকাঠি তাঁদের কণ্ঠের স্বাভাবিক মিষ্টত্ব অথবা মিষ্টত্বের অভাব। নিছক মিষ্টত্বের তারতম্যেব দ্বারা গায়কের গুণাগুণ বিচারের রেওয়াজ ভারতীয় সংগীতে অন্তত স্বীকৃত নয়। কণ্ঠমাধুর্যের চেয়েও সেখানে বড জিনিস স্বাধীন সুবসৃষ্টির নৈপুণ্য, সুবকে খেলাবাব যদৃচ্ছ অধিকার।

রবীন্দ্রসংগীতেব প্রসঙ্গে উপরে যে কথাগুলি বলা হলো সেই মানদণ্ডের প্রয়োগে ভালমন্দ-মাঝাবি সব রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীদের বিচার করতে হবে। আর এই ছকে বিচার করলে দেখা যাবে কোন রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীই, তা তিনি যতই জনপ্রিয় হোন-না কেন, আহা-মরি পর্যায়ের গায়ক নন। লোকান্তরিত শিল্পী পঙ্কজকুমার মল্লিক এবং দেবব্রত বিশ্বাস দুজনাই অসামান্য কণ্ঠসম্পদের অধিকারী ছিলেন, উদারায় তাঁদের কণ্ঠস্বর নিগ্রো গায়ক পল রবসনের গলাব ভারী আওয়াজের সঙ্গে তুলনীয় ছিল কিন্তু ভারতীয় রাগসংগীতে যথোপযুক্ত কষণাব অভাবের দরুন তাঁদের এই অনবদ্য কণ্ঠসম্পদকে তাঁরা তেমন সার্থকভাবে কাজে লাগাতে পারেননি। পঙ্কজবাবুর তবু বরং কমবেশী রাগজ্ঞান ছিল কিন্তু দেবব্রত বিশ্বাসের এই দিকে খাঁকতি এতই প্রকট ছিল যে, এমন ভরাট ভারী কণ্ঠে আবৃত্তির ভঙ্গিমায় গান গাওয়াটাকে কখনও কখনও মনে হতো সরল কণ্ঠের ব্যায়াম।

ভবাট ভারী পুরুষ কণ্ঠে যথেচ্ছ সুর খেলানো যায় না, এরূপ কেউ যদি বলেন, তাহলে তাঁদের বলব, তাঁরা যেন একবাব ওস্তাদ ফৈযাজ খাঁ, ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁ, ওস্তাদ আমীর খাঁ, গজল গায়ক মেহেদী হাসান খাঁ ও ছোট গোলাম আলির গান শোনেন। তাহলে আমি কী বলতে চাইছি তা বুঝতে পারবেন। ভারী গলা হলেই কণ্ঠের কারুকার্যবিহীন লেপাপোঁছা ধরনে সাদাসিধে ভঙ্গিমায গান গাইতে হবে এটা কোন কাজেব কথাই নয়। আব ঠিক একই কারণে, মহিলা শিল্পীদের বেলায়, অন্যথা সবিশেষ জনপ্রিয় গায়িকা শ্রীযুক্তা সুচিত্রা মিত্রের গান আমার কাছে খুব আকর্ষণীয় মনে হয় না। তাঁর স্পষ্ট আওয়াজ, স্বরনিক্ষেপের

প্রণালী, বলিষ্ঠ উচ্চারণ খুবই প্রশংসনীয় কিন্তু হায়, তাঁর গলায় কোন 'কাজ' নেই। রবীন্দ্রসংগীতে হয়ত অলংকরণের তেমন সুযোগ নেই, না-ই বা থাকলো, তা বলে সূক্ষ্ম কারুকৃতি বর্জিত এমন লেপা কণ্ঠস্বর কি কোনও গান গাইবার পক্ষেই উপযুক্ত কণ্ঠস্বর ?

বরং সেই তুলনায় শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠধ্বনিকে অনেক বেশী মধুর মোলায়েম অবাধ চলাচলের গতিযুক্ত সাবলীল ('ফ্লেক্সিবল') কণ্ঠ মনে হয় না কি ? অবশ্য শ্রীমতী কণিকা দেবীর কণ্ঠও আদর্শ কণ্ঠস্বর নয়, তাঁর রাগভিত্তি দুর্বল। তবে শুনতে মিষ্টি এই যা ব্যতিক্রমী লক্ষণ। মোট কথা, রবীন্দ্র-সংগীত শিল্পীদের বেলায় আমার কোন প্রশংসাই সর্তবিরহিত নয়। মিষ্টত্ব যদি এঁদের কারও কারও গান ভাললাগার পক্ষে ব্যতিক্রমী লক্ষণ বলে গণ্য হয়, সেক্ষেত্রে এই সব রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী ওই প্রশংসার লক্ষ্যের কোঠায় পড়েন—রাজেশ্বরী দত্ত, মায়া সেন, নীলিমা সেন, পূর্বা দাম, ঋতু গুহ, চিত্রলেখা চৌধুরী, পূরবী মুখোপাধ্যায়, সুমিত্রা সেন, বাণী ঠাকুর, স্বপ্না ঘোষাল, গীতা ঘটক, গীতা সেন, শুভশ্রী মুখোপাধ্যায়, বনানী ঘোষ, অদিতি সেনগুপ্ত, ইন্দ্রাণী সেন প্রমুখ। রবীন্দ্র ঘরানাশ্রিতা বর্ষীয়সী শিল্পী অমিয়া ঠাকুর ও মেনকা ঠাকুর এখনও মাঝেমধ্যে গেয়ে থাকেন। (অমিয়া দেবী সদ্য লোকান্তরিতা হয়েছেন।)

পঙ্কজ ও দেবব্রতের পরে পুরুষ শিল্পীদের মধ্যে যাঁর নাম সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তিনি সুবিনয় রায়। সুবিনয়বাবুর কণ্ঠ মধুর এমন কথা বলা যায় না, বরং সত্যি কথা বলতে, একটু কার্কশ্যেরই ধার ঘেঁষে যায় ; তবে যেহেতু তিনি রাগসংগীতে উপযুক্ত তালিমপ্রাপ্ত, সেই কারণে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের ধ্রুপদাঙ্গ ব্রহ্মসংগীত-গুলির প্রতি সুবিচার তাঁর পক্ষেই সম্ভব। অনেক তথাকথিত নামী রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী রবীন্দ্রসংগীতের এই দুরূহ এলাকাটি সযত্নে এড়িয়ে চলেন। তার কারণ বোঝা শক্ত নয়। অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রহ্মসংগীতগুলি ভালই গান, তবে তাঁর কণ্ঠস্বর মজ্জাগতভাবে এতটাই শ্লেষ্মাবিজড়িত যে তাঁর গানে সুরের উচ্চারণ কখনও স্পষ্ট হয় না এবং সব সময় কণ্ঠে সুর ঠিক ফোটেও না। বয়ঃপ্রবীণ শান্তিদেব ঘোষ অভিজ্ঞ একজন শিক্ষক ও পরিচালক, তবে বেসুরো গলায় গান তাঁর এই বয়সে না গাওয়াই বুঝি ভাল। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় একজন সত্যি-কারের জনপ্রিয় শিল্পী। কণ্ঠপ্রসাদে ও গায়নৈপুণ্যে এই জনপ্রিয়তার তিনি হকদার। দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় আরেকজন জনপ্রিয় শিল্পী। অগ্রজ ও অগ্রগামী

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মতই তিনি রবীন্দ্রসংগীত এবং আধুনিক বাংলা গান এই দুই ক্ষেত্রেই স্বচ্ছন্দ-বিচরণের অধিকারী। সাগর সেনের অকাল প্রয়াণ খুব দুঃখজনক। তাঁর গাওয়া গান জেনে শুনে বিষ করেছি পান বোধহয় সর্বাধিক বিক্রীত রেকর্ড সংগীতগুলির মধ্যে একটি। চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের গায়নরীতি সুন্দর, গলাও সুমিষ্ট, তবে 'সুন্দর তব অঙ্গখানি', 'এখনও রহিল আঁধার', 'প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন' জাতীয় নয়-দশখানি গানের মধ্যেই সচরাচর তাঁর পরিবেশনযোগ্য গানের ডালি ('রেপারটয়ের') ঘোরাফেরা করে। ধ্রুপদাঙ্গ গানের সীমানা তিনি সচরাচর মাড়ান না, এটা লক্ষণীয়। এ ভিন্ন অন্যান্য বিশিষ্ট শিল্পীর মধ্যে আছেন—সমরেশ চৌধুরী, সন্তোষ সেনগুপ্ত, সুশীল চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ শৈলেন দাস, অরবিন্দ বিশ্বাস, সুশীল মল্লিক, অর্ঘ্য সেন, শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়, সমরেশ রায়, স্বপন গুপ্ত, গৌতম মিত্র, গোরা সর্বাধিকারী, রাজেশ্বর ভট্টাচার্য প্রমুখ।

দ্বিজেন্দ্রগীতি

কবি, নাট্যকার, সুরকার ও গীতিকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ধ্রুপদ ও খেয়াল-ভঙ্গিম গানগুলির প্রচার ইদানীং অনেকটা কমে এসেছে, তবে তাঁর কয়েকটি কাব্যগীতি (যথা, 'নীলাকাশের অসীম ছেয়ে', 'ওই মহাসিন্ধুর ওপার হতে' প্রভৃতি) এখনও শ্রোতার মন কাড়ার যথেষ্ট ক্ষমতা রাখে। দ্বিজেন্দ্র-পুত্র দিলীপকুমার একদা এই গানগুলি কী দরদ দিয়েই না গাইতেন। তেমনি তাঁর মুখে ধ্রুপদাঙ্গ জয়জয়ন্তী রাগে বাঁধা 'প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে' কিংবা খেয়ালভঙ্গিম ভূপালী রাগের গান 'ঘন তমসাবৃত অম্বর ধরণী' এখনও কানে লেগে রয়েছে বলে মনে হয়। তবে দ্বিজেন্দ্রলালের কোরাস গানগুলি আজও তুলনারহিত। উনিশশো বাষট্টি সালের চীন-ভারত সংঘর্ষের সময় এবং উনিশশো পঁয়ষট্টি সালের পাক-ভারত যুদ্ধের কালে দেশবাসীর স্বদেশ-চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য সংগীতজ্ঞরা পুরাতনের ঝাঁপি খুলে বারবারই এইজাতীয় ভাবোদ্দীপক সম্মেলক গানগুলিকে টেনে বার করে তার সদ্ব্যবহার করেছিলেন, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে সেকথা বলতে পারি। 'ধনধান্য পুষ্পভরা', 'বঙ্গ আমার জননী আমার', 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে', 'কিসের শোক করিস ভাই', 'ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে' প্রভৃতি কোরাস কখনও ভোলবার নয়।

রজনীকান্তের গান

কান্তকবি রজনীকান্ত সেন বাংলা গানের জগতে আধুনিক যুগের পটভূমিতে ভক্তিসংগীতের শ্রেষ্ঠ উদ্‌গাতা। তাঁর গানের ভাবের আন্তরিকতা অতিশয় মর্মস্পর্শী। তবে তাঁর 'বাণী' ও 'কল্যাণী' গ্রন্থদ্বয়-ধৃত গানগুলির প্রচলন ইদানীং বেশ কিছুটা মন্দীভূত হয়ে এসেছে। এই এলাকায় শিল্পীর পদপাতও তেমন চোখে পড়ে না। শুধু প্রদীপের সলিতাকে টিম-টিম করে জ্বালিয়ে রাখার মত করে শিখাটিকে জ্বালিয়ে রেখেছেন রজনীকান্তেরই দৌহিত্র দিলীপ রায়। রজনীকান্তের বংশীয়, 'অভ্যুদয়' গীতি-আলেখ্যখ্যাত সুরকার সুকৃতি সেন (এই সেদিন তার মরণোত্তর ৭২তম জন্মোৎসব পালিত হয়ে গেল উপযুক্ত মর্যাদায়) যতদিন বেঁচেছিলেন, রজনীকান্তের গানের ধারাটিকে অব্যাহত রাখবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর নিজের দেওয়া গানের সুরেও রজনী-গীতির সুরভঙ্গির প্রভাব আছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের মত রজনীকান্তের হাসির গানও সবিশেষ উপভোগ্য। হাসির গান আজকাল আর তেমন শুনতে পাওয়া যায় না। কিছুকাল আগে পর্যন্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় (বর্তমানে প্রয়াত) হাসির গানের এক সিদ্ধশিল্পী ছিলেন। ইদানীং রামকুমার চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ প্রমুখ কখনও কখনও এই ধারার গান গেয়ে থাকেন।

অতুলপ্রসাদের গান

বাংলা গানে ঠুংরী সুরের আমেজের প্রবর্তনকারী লক্ষ্ণৌপ্রবাসী ব্যারিস্টার অতুলপ্রসাদ সেন-রচিত গান এখনও বেশ জনপ্রিয়। তাঁর গানের সংখ্যা বেশী নয়, সর্বসাকুল্যে মাত্র দুশো ছয়টি গান তিনি প্রণয়ন করেছিলেন, কিন্তু এই স্বল্প-পরিমিত গানের সঞ্চয় নিয়ে এখনও তিনি জনচিত্তে সবিশেষ মর্যাদায় বিরাজ করছেন। গানের বাণী অংশে তিনি রবীন্দ্র-অনুসারী কিন্তু সুরে একেবারেই নন। সুর তাঁর উত্তর ভারতে প্রচলিত মুসলমানী ঐতিহ্যের স্মারক ঠুংরী, কাওয়ালী, গীত ও গজলের ঢঙে গঠিত। এছাড়া জাতীয়ভাবোদ্দীপক কোরাস গানেরও তিনি একজন সার্থক রচয়িতা। তাঁর এই বর্গের গান এখনও বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে গীত ও শ্রুত হয়।

অতুলপ্রসাদের গান যেসব শিল্পীর কণ্ঠে সমাদৃতরূপে মূর্ত হতো ও হয়ে থাকে

তাঁদের মধ্যে পুরাতনকালীন শিল্পীরা হলেন দিলীপকুমার রায়, রেণুকা দাশগুপ্তা হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সাহানা দেবী, পাহাড়ী সান্যাল ও দ্বিজু সান্যাল এবং আধুনিককালীন হলেন মঞ্জু গুপ্তা ও কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়।

নজরুলগীতি

নজরুল সংগীতের জনপ্রিয়তা ক্রমশ বাড়ছে। সংখ্যাপ্রাচুর্যে ও শ্রেণীবৈচিত্র্যে কাজী নজরুলের গান অদ্বিতীয় বলা যায়। অনুমান প্রায় তিন হাজার-সাড়েতিন হাজার গান তিনি একজীবনে লিখেছিলেন। কোনও একক শিল্পীর পক্ষে গীতি রচনার ক্ষেত্রে বোধহয় পৃথিবীর সর্বোচ্চ রেকর্ড এটি। অতুলপ্রসাদেরই মত নজরুলের গানও উত্তর ভারতীয় লঘু ক্লাসিকাল গানের রসে ভরপুর। নাত-গজল-গীত-কাওয়ালী-হোরী-কাজরী-লাওনি প্রভৃতি হাল্কা অথচ মনোহর শ্রেণীর গানের ছড়ানো ভাণ্ডার থেকে তিনি দু-হাত ভরে সুর আহরণ করেছেন বাংলা গানের সমৃদ্ধিবিধানে। বিদেশী উৎস থেকেও তাঁর আহরণের পরিমাণ কম নয়।

আমি রবীন্দ্রসংগীতের সুরের বাঁধাবাঁধির কথা বলেছি। এবং সেই সঙ্গে শিল্পীর স্বাধীনতার আপেক্ষিক অভাবের প্রসঙ্গও উত্থাপন করেছি। এই দিক দিয়ে নজরুল সংগীতের 'ফ্রীডম' অনেক বেশী। কারণ, এই গানে সুরবিকাশের স্বাধীনতা স্বীকৃত, যা রবীন্দ্রসংগীতে কম-বেশী অনুপস্থিত। তবে রবীন্দ্রসংগীতের সুরের বিশুদ্ধি ও পবিত্রতার তুলনায় নজরুলের সংগীতের সুরের মার্জিত ভাব কম। কিন্তু এই অভাবের পূরণ হয়েছে তার সুরের মাদকতায়। নজরুলের গানের মাতোয়ালা ভাব রীতিমত সংক্রামক, চকিতে শ্রোতার মনকে সুরের যাদুতে সম্মোহিত করে দেয়। এ বিষয়ে এখানে এর বেশী আর কিছু বলা সম্ভব নয়, যাঁরা এ সম্বন্ধে সবিশেষ জানতে আগ্রহী, তাঁরা মৎলিখিত 'কাজী নজরুলের গান' বইটি নাড়াচাড়া করে দেখতে পারেন।

নজরুল সংগীতের কাণ্ডারীদের মধ্যে ছিলেন ও আছেন মনোরঞ্জন সেন, নিতাই ঘটক, জগৎ ঘটক, চিত্ত রায়, উমাপদ ভট্টাচার্য, কমল দাশগুপ্ত প্রমুখ। কণ্ঠ রূপায়ণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য শিল্পীরা হলেন—প্রয়াতা কমলা ঝরিয়া, আঙ্গুরবালা দেবী, শচীন দেববর্মণ, শ্রীমতী ইন্দুবালা, সুপ্রভা সরকার, ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিমলভূষণ, ধীরেন বসু,

অনুপ ঘোষাল, বিমান মুখোপাধ্যায়, অধীর বাগচী, ডাঃ অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়, পূরবী দত্ত, কল্যাণী কাজী প্রমুখ। এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের শিল্পীদের মধ্যে সবচেয়ে গণনীয় নাম শ্রীমতী ফিরোজা বেগম।

নজরুলের অজস্র গানের প্রচারে একদা দিলীপকুমার রায় মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। পরে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী তাঁর হিন্দী-ভাঙা বাংলা খেয়াল ও রাগপ্রধান গানগুলি গ্রামোফোন রেকর্ডের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচার করেন। কিন্তু তুটিই স্বাধীনতা-পূর্ব যুগের ঘটনা। সুতরাং সঠিক কালিক গণনায় এই সমীক্ষার সীমার মধ্যে পড়ে না।

নজরুল-পরবর্তী বাংলা গান

কাজী নজরুল ইসলামের গানের প্রচলন ও কমবেশী ব্যাপক অনুশীলনের পরে যখন স্বাভাবিক সময়ের নিয়মেই তার চর্চায় কিছুটা ভাঁটার টান দেখা দেয় তখন বাংলা গানের জগতে নতুনকালের রুচি ও চাহিদা পূরণের তাগিদে কিছু-সংখ্যক নতুন সুরকার ও গীতিকারের আবির্ভাব হয়। এঁদের মধ্যে আছেন—দিলীপ-কুমার রায়, পঙ্কজকুমার মল্লিক, অনুপম ঘটক, সুরসাগব হিমাংশুকুমার দত্ত এবং গীতিকার অজয় ভট্টাচার্য, শৈলেন রায়, প্রণব রায়, সুবোধ পুবকায়স্থ, গৌরী-প্রসন্ন মজুমদার, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল গুপ্ত প্রমুখ। এই পবে কণ্ঠ রূপায়ণে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন পঙ্কজ মল্লিক, শচীনদেব বর্মণ এবং রাগ-প্রধান বাংলা গানে ওস্তাদ ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়। তিনজনই আজ স্বর্গত।

লক্ষণীয় যে, একমাত্র দিলীপকুমার রায়কে বাদ দিলে এই পর্বেই প্রথম আমরা দেখলুম সংগীতের গীতরচনা এবং সুররচনা তুই আলাদা ব্যক্তিতে বিভক্ত হয়ে গেছে। বাণীসৃষ্টি ও সুরসৃষ্টির দ্বিভাজন ঘটে গেছে। আগের যুগে অর্থাৎ রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র-রজনী-অতুল-নজরুলের কালে গীতিকার ও সুরকার এক দেহে বিরাজমান ছিলেন—যিনি গানের কথাকার তিনিই তার সুরসংযোজক। এইটেই প্রত্যাশিত এবং এইটেই স্বাভাবিক। কেননা কথা ও সুরের এককালীন সুসমঞ্জস সমন্বয়ের মধ্য দিয়েই একটা গানের অবয়ব গড়ে ওঠে, তাকে যান্ত্রিক-ভাবে খোপে খোপে বিচ্ছিন্ন করে রচনা করতে গেলে তাতে কৃত্রিমতার সঞ্চার হয়—গানের সেই একদেহে লীন হওয়া হরিহরের যুগ্মমূর্তি আর থাকে না। আধুনিক বাংলা গানে এই অবাঞ্ছিত ব্যাপারটিই ঘটেছে বলে সন্দেহ হয়—সুর

ও বাণীর গঙ্গা-যমুনা একস্রোতা রূপটি আর বেঁচে নেই।

যাই হোক, এই পর্বের গায়ক-শিল্পী-সুরকারদের ভূমিকার একটু জরীপ করা যাক।

আমার নিজের ধারণা, সুরসুধাকর দিলীপকুমার রায় যত বড় কম্পোজার ছিলেন ততবড় গায়ক ছিলেন না। তিনি বিচিত্র ধরনের গানে সুরসংযোগ করেছিলেন তার মধ্যে টপ্পা, ঠুংখেয়াল, কীর্তন, শ্যামাসংগীত, ভজন প্রভৃতি তো আছেই, বিদেশী সুরভঙ্গিম গানও কম ছিল না। তবে তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল সানুনাসিক আর সচলতা বর্জিত। আওয়াজ যথেষ্ট সুরেলা ছিল এমন কথাও বলা যায় না।

পঙ্কজ মল্লিক একজন অসামান্য গায়ক ও শক্তিধর সুরকার। তাঁর ভরাট কণ্ঠের গমগমে আওয়াজের গান একদা বাংলা গানে একটা নতুন ধারার সৃষ্টি করেছিল। রবীন্দ্রসংগীতের জনপ্রিয়তা বিধানেও তিনি এককালে বিশেষ সহায়তা করেছিলেন। তবে সেটা প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের কথা। সিনেমার সুর রচনায়ও তাঁর যথেষ্ট অবদান আছে; আর বেতার-গীতালেখ্য 'মহিষাসুরমর্দিনী'র রাগভিত্তিক সুরগুলি যে তাঁকে অবিস্মরণীয় প্রতিষ্ঠা দিয়েছে তার প্রমাণ তো ওই গানগুলি আজিও অম্লান জনপ্রিয়তার সাক্ষ্যের মধ্যেই সরবে বিদ্যমান। তবে তাঁর কণ্ঠ ত্রুটিবিহীন ছিল না। তাঁর গলার আওয়াজ গম্ভীর অথচ মধুর ছিল কিন্তু তাতে সূক্ষ্ম কারুকার্য করার মত সচলতা কম ছিল। বোধহয় ভারী গলার জন্যই কণ্ঠের এই সাবলীলতা অর্জনে তিনি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। পাতলা গলায় সুর খেলাবার উপযোগী যে 'ফ্লেক্সিবিলিটি' থাকে ভারী ও গম্ভীর গলায় তা সচরাচর থাকে না, এ তো সুবিদিত তথ্য। তবে ব্যতিক্রম-দৃষ্টান্তও অনেক আছে।

হিমাংশু দত্তের সুরযোজনার বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তিনি রবীন্দ্র সুরাদর্শের ঐতিহ্যে কর্ষণাপ্রাপ্ত একজন সুরকার হয়েও তাতেই নিঃশেষিত-প্রতিভা ছিলেন না। আধুনিক বাংলা গানের চালে রাগসংগীতের রঙ-রস সুরযোজনায় তাঁর কৃতিত্ব ছিল অসীম। অজয় ভট্টাচার্য, সুবোধ পুরকায়স্থ, শৈলেন রায় প্রমুখ গীতিকারদের গানে সুরারোপ করে তিনি যে গানগুলি বেঁধেছিলেন তাতে শচীন দেববর্মণ, শৈল দেবী, জগন্ময় মিত্র প্রমুখ জনপ্রিয় শিল্পীদের কণ্ঠ রূপায়ণ তাঁকে সুরকার হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি এনে দিয়েছিল। বিশেষত তাঁর

সুর-দেওয়া রাগপ্রধান গানগুলির কোন তুলনা হয় না। তাঁর সুর ছিল মার্জিত, সংযত, সংহত। খুব সম্ভব তাঁর শিক্ষাদীক্ষার পিছনে রবীন্দ্রভাবের পটভূমি বিদ্যমান ছিল বলেই বোধকরি তাঁর এই পরিশীলন কমবেশী সহজায়ত্ত ছিল।

রাগপ্রধান

রাগপ্রধান বাংলা গান নামে বাংলা গানের একটি নতুন পর্যায়ের সৃষ্টি হয়েছে। এই শ্রেণীর গানকে ইংরেজীতে বলা হয় 'ক্লাসিকো-মডার্ন সঙস'। অর্থাৎ আধুনিক বাংলা গানের কাঠামোয় রাগ-রাগিণীনিভর সুরের মূর্তি বসিয়ে এই গানগুলির রূপ খাড়া করা হয়। এর বাণী-অংশ রোমান্টিক, সুরাংশ ক্লাসিকাল। তবে এই রাগপ্রধান গানগুলি ঠিক হিন্দী-ভাঙা বাংলা খেয়াল কিংবা হিন্দুস্থানী খেয়াল গানের বাংলা তর্জমা মাত্র নয়। রাগপ্রধান বাংলা গান বাংলা গানেরই একটি রাগভঙ্গিম বিশেষ ধরনের সুররচনা। দৃষ্টান্ত দিয়ে পার্থক্যটি বোঝাতে গেলে বলতে হয়, প্রোফেসর জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর গ্রামোফোন রেকর্ডে গাওয়া 'দামিনী দমকে' গানটি হলো জয়জয়ন্তী রাগের হিন্দী-ভাঙা বাংলা খেয়াল। আর ওস্তাদ ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের গাওয়া 'ফুলের দিন হলো যে অবসান' প্রারম্ভিক বাণীযুক্ত জয়জয়ন্তী রাগের গানটি হলো রাগপ্রধান বাংলা গানের উদাহরণ। দুয়ের স্বাদে-গন্ধে দুস্তর ব্যবধান। প্রথমটিতে যান্ত্রিকভাবে হিন্দী খেয়ালকে বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে, দ্বিতীয়টিতে বাংলা গানের ভাব অবিকৃত রেখে জয়জয়ন্তী রাগের সৃষ্টিশীল দ্যোতনাকে তাতে আরোপ করা হয়েছে। এ এক নবসৃজনের তুল্য সুররচনা। সরগম এ গানের এক অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য।

স্বাধীনতা-পূর্ব যুগে রাগপ্রধান গানের শ্রেষ্ঠ শিল্পী ছিলেন ভীষ্মদেব ও শচীনদেব; ইদানীং এই শ্রেণীর গানে আর যাঁরা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন—দীপালি নাগ, ৺চিন্ময় লাহিড়ী, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, অখিলবন্ধু ঘোষ, সুকুমার মিত্র, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, নিখিল সেন, অঞ্জলি সুর, অমলেন্দুবিকাশ করচৌধুরী প্রমুখ।

'আধুনিক বাংলা গান'

'আধুনিক বাংলা গান' নামধেয় গান বাংলা গানের একটি বিশিষ্ট শাখা। এর পরিধি অত্যন্ত বিস্তৃত এবং এর ঐতিহ্যও নিতান্ত অর্বাচীন নয়, যদিও এই শ্রেণীর

গানের 'আধুনিক' নামকরণে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অবকাশ রয়েছে। বহু বহু সুরকার, গীতিকার ও গায়কের দানে এই বিশেষ শ্রেণীর গানের শাখাটি পরিপুষ্ট। গীতিকারদের মধ্যে একাধিক জনের নাম পূর্বে উল্লেখ করেছি। সুরকারদের মধ্যেও কারও কারও নাম উল্লিখিত হয়েছে। আর গায়কের সংখ্যা অগুণতি বললেও চলে। কৃষ্ণচন্দ্র দে, ধীরেন দাস, যূথিকা রায়, শচীনদেব বর্মণ প্রমুখ থেকে শুরু করে কত যে কণ্ঠশিল্পী এই গানের ধারাটিকে পুষ্ট করেছেন তার লেখাজোখা নেই।

আধুনিক বাংলা গানের সুরযোজনায় যথেষ্ট বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু ইদানিং স্থূল বাণিজ্যপ্রয়াসী গ্রামোফোন কোম্পানীর ষড়যন্ত্রে আধুনিক বাংলা গান সুরের সরণি থেকে বিচ্যুত হয়ে প্রায়শ বিদেশী রক-অ্যাণ্ড-রোল কিংবা সস্তা পপ মিউজিক-এর পর্যায়ে নেমে এসেছে বলে সন্দেহ হয়। সুরে বৈচিত্র্য-সৃষ্টির নামে প্রায়ই যন্ত্রের তারস্বর কোলাহলে সুরকে ডুবিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। আধুনিক গানের কথাংশে ইচ্ছাকৃতভাবে আনা হচ্ছে নিম্নরুচির ভাবের ব্যঞ্জনা। কদর্য যৌনাত্মক ইঙ্গিতে ও সংকেতে গানগুলিকে বানিয়ে তোলা হচ্ছে সমাজে অপসংস্কৃতি ছড়াবার এক প্রধান বাহক। এক্ষেত্রে হিন্দী সিনেমা ছবির গানের আদর্শ স্পষ্টতই বাংলা গানের রুচির অবনয়নে একটা মস্তবড় ক্ষতিকর ভূমিকা পালন করছে। তার উপর, অতিসম্প্রতিকালে যাকে বলা হচ্ছে 'ডিস্কো গান', 'ডিস্কো কালচার'-বাহিত সেই অপকৃষ্ট সংগীত বাংলা গানের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের ধ্বংসসাধনে আজ পরিকল্পিতভাবে নিযুক্ত। ওপরমহল থেকেও এই শ্রেণীর গান পোষকতা পায়, এ খুবই পরিতাপের বিষয়।

যাই হোক, এই সর্বাত্মক রুচির অবনয়নের যুগেও যে-সব শিল্পী আধুনিক বাংলা গানের ধারাটিকে সুরের আবেদনের বৈচিত্র্যে সঞ্জীবিত রাখার চেষ্টা করছেন তাঁদের মধ্যে আছেন—ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, সত্য চৌধুরী, ৺পান্নালাল ভট্টাচার্য, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, সুপ্রীতি ঘোষ, আরতি মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, ইলা বসু, কৃষ্ণা দাশগুপ্ত, উৎপলা সেন, পিণ্টু ভট্টাচার্য প্রমুখ। এই বিভাগে এত এত শিল্পী আছেন যে সকলের নামকরণ সম্ভব নয়। নামপঞ্জীতে কিছু কিছু বিশিষ্ট শিল্পীর নাম বাদ পড়াও আশ্চর্য নয়। তার জন্য লেখকের স্মৃতিভ্রংশতাই দায়ী, অনুরক্তেরা যেন এর ত্রুটি গ্রহণ না করেন।

ছায়াছবির গান

বাংলা ছায়াছবির গানের নিজস্ব একটা আবেদন আছে, যা অন্যত্র দুর্লভ। দৃশ্যাবলীর নাটকীয়তা, সংলাপের পিঠে গানের চমক, ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিকের পৃষ্ঠপট, 'প্লে-ব্যাক' শিল্পীদের নেপথ্যচারিতার কলাকৌশল—সব মিলিয়ে বাংলা ছায়াছবির গানের আকর্ষণ দুর্নিবার। অনেক অনেক নামী শিল্পী এই ক্ষেত্রে নিয়োজিত থেকে ক্ষেত্রটির মনোহারিতা বাড়িয়েছেন। বাংলা সিনেমার গানের তিনটি মূল অবলম্বন—রবীন্দ্রসংগীত, 'আধুনিক বাংলা গান' পর্যায়ের যে-ধারাটি সৃষ্টিশীল ও সুরবৈচিত্র্যপূর্ণ সেই ধারার গান এবং লোকসংগীত। তিন শাখাতেই গানের ডালি সুরসম্ভারময়।

স্বাধীনতা-পূর্ব যুগের বাংলা সিনেমায় সংগীত পরিচালকরূপে যাঁরা সবচেয়ে প্রসিদ্ধি লভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন রাইচাঁদ বড়াল ও পঙ্কজকুমার মল্লিক। দু'জনাই নিউ থিয়েটার্সের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। চল্লিশ, পঞ্চাশ ও ষাট-সত্তরের দশকে নূতনতর বহু বহু সংগীত পরিচালক এই ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়ে নতুন নতুন দিকে সুরের রঙ-রসের বৈচিত্র্য সাধন করেছেন। রাই বড়াল, পঙ্কজ মল্লিক ছ'ড়া এই বিভাগে আর যাঁরা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন—কাজী নজরুল, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, কমল দাশগুপ্ত, অনুপম ঘটক, অনিল বাগচী, শচীন দেববর্মণ, দুর্গা সেন, রবীন চট্টোপাধ্যায়, সুধীন দাশগুপ্ত, কালীপদ সেন প্রমুখ। অবশ্য স্বাধীনোত্তর যুগে সবাইকে টেক্কা দিয়েছেন ওস্তাদ রবিশঙ্কর ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্রনির্মাতা চৌকস প্রতিভাধর সত্যজিৎ রায়। 'পথের পাঁচালী' চলচ্চিত্রে রবিশঙ্করের আবহসংগীত এতই উন্নতমানের ও মনোমুগ্ধকর যে, আমরা এই বাবদে তাঁর অন্যবিধ বিচ্যুতির ত্রুটি (যথা 'বীটল' গাইয়েদের সঙ্গে তাঁর অতিরিক্ত মাখামাখি, 'রাগ অনুরাগ' বইয়ে তার ব্যক্তিগত ফষ্টিনষ্টির কাহিনী, ইত্যাদি) ভুলতে রাজী আছি। অন্যপক্ষে সত্যজিৎ রায় তাঁর 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ও 'হীরকরাজার দেশে' ছবি দুটির সংগীত পরিচালনায় সিনেমা সংগীত সৃষ্টির জগতে এতাবৎ অপরীক্ষিত এক অভিনব সুরবৈচিত্র্যের সংযোজন করে সৃষ্টিশীলতার এক নয়া দিগন্ত স্পর্শ করলেন। বাংলা ছায়াছবির গানে তাঁর এই সুর নিয়ে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা বাংলা গানে নবতর মাত্রাসংযোগের কৃতিত্ব দাবি করতে পারে।

'নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা' বলতে বোঝাচ্ছে বাংলা গানে কর্ণাটী সংগীতের

সুরভঙ্গীর অবতারণা। রবীন্দ্রনাথ ও কাজী নজরুলের কিছু কিছু গানে আমরা ইতঃপূর্বে কর্ণাটী বা দক্ষিণী সংগীতের সজ্ঞান প্রয়োগের উদাহরণের সঙ্গে পরিচিত ছিলাম, কিন্তু বাংলা সিনেমার গানে সত্যজিৎই প্রথম সচেতন এক প্রয়াস হিসাবে দক্ষিণী সুরের প্রয়োগ করলেন। ছন্দপ্রধান দক্ষিণী সুরে মেলডির ঐশ্বর্য হয়ত তেমন পাওয়া যায় না কিন্তু তাল-লয়ের কারিকুরির অপূর্ব স্বাদের পরিচয় পাওয়া যায়। দক্ষিণী গানের সুর গতিশীলতায় সততচঞ্চল। এই গতিশীলতার ভাবটিই এনেছেন সত্যজিৎ রায় তাঁর গানের সুরভঙ্গিমায় মূলত।

লোকসংগীত

বাংলা লোকসংগীতের ক্ষেত্রটি এত বিশাল বহুমুখী ও বিচিত্র যে, এখানে সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ নেই। তাই সূত্রাকারে দুটি-চারটি কথা বলেই এই বিষয়ক প্রসঙ্গের আলোচনায় ক্ষান্তি দেব। লোকসংগীতের পরিবেশনার রীতি কেমন হওয়া উচিত এ বিষয়ে দুটি মত বিদ্যমান। এক মতের ধারক-বাহকেরা পল্লীসংগীতের পূর্বপ্রচলিত সুরকে হুবহু অবিকৃত রাখবার পক্ষপাতী। এরা বিশুদ্ধিবাদী ('পিওরিস্ট')—গায়নরীতিতে কিংবা বাদনক্রিয়ায় কোনরূপ পরিবর্তন বা সংযোজন এরা বরদাস্ত করতে রাজী নন। কবি জসীমউদ্দিন, অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন ('হারামণি' গ্রন্থের সংকলক), হেমাঙ্গ বিশ্বাস, শ্রীমতী নীহার বড়ুয়ারা, যতদূর আমার সংবাদ, এই মতের পরিপোষক। অন্যপক্ষে, আরেক দল আছেন—এই দলই সংখ্যায় ভারী—যাঁরা মনে করেন লোকসংগীতের পরিবেশনায় যুগোচিত পরিবর্তন-পরিবর্ধন আদিকে ঠেকিয়ে রাখবার কোন উপায় নেই। কৃষি-সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এখন সমাজে শিল্পবিপ্লবের হাওয়া বইছে, শিল্পবিপ্লবের অপরিহার্য আনুষঙ্গিক নাগরিকতা ও নগরায়িত-করণের ছাপ একদা গ্রামীণ লোকসংগীতের শিল্প প্রকরণের উপর না পড়েই পারে না। এবং তদনুযায়ী লোকগীতির পরিবেশনার রূপ ও রীতির সময়োচিত বদল ঘটতে বাধ্য।

এই মতের অনুবর্তীদের মধ্যে একাধিক বিশিষ্ট লোকসংগীতশিল্পীকে পাই। তাঁদের গায়ন ও বাদন রীতিই তাঁদের মতটির জানান দিচ্ছে। একদা আব্বাস-উদ্দিন আহমেদ, নবনী দাস বাউল, অনন্তবালা বৈষ্ণবী, হরিমতি, শচীন দেববর্মণ প্রমুখ যে-ধারায় লোকগীতি গাইতেন এঁরা সে-ধারায় লোকগীতি গান না, শহরের

কেতা ও রুচি মাফিক এঁরা এঁদের গায়নপ্রণালীতে নতুনত্ব আনয়নের পক্ষপাতী। এই শ্রেণীর শিল্পীদের মধ্যে পড়েন—পূর্ণদাস বাউল, নির্মলেন্দু চৌধুরী, দিনেন্দ্র চৌধুরী, বিষ্ণুপদ দাস, অমর পাল, অংশুমান রায়, উৎপলেন্দু চৌধুরী, বুদ্ধদেব রায় ও সম্প্রদায় এবং আরও অনেকে।

গণসংগীত

সবশেষে গণসংগীত। 'গণসংগীত' ও 'লোকসংগীত' কথা দুটি প্রায়শ সমস্বরে উচ্চারিত হলেও এই দুই শ্রেণীর গানের প্রকৃতি আলাদা। লোকসংগীত গ্রামাগত গান, পক্ষান্তরে গণসংগীতের জন্ম শহরে এবং নাগরিক আবহাওয়াতেই তার বিকাশ ও বৃদ্ধি। যাঁরা বলেন গণসংগীত একক কণ্ঠে গাওয়া চলে এবং যে-গানের mass base আছে সেই গানই গণসংগীত, আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই। গণ-সংগীত একটি বিশেষ ধরনের সম্মেলক গান এবং তার বিষয়বস্তুতে সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শের দ্যোতনা থাকা আবশ্যিক। স্বাধীনতা লাভের আগের কালে কোরাস গান স্বদেশপ্রেমের উদ্দীপনা সঞ্চারে যে-ভূমিকা পালন করেছে, স্বাধীনতা লাভের পরে, এখন পরিবর্তিত অবস্থায়, গণসংগীত ঠিক একই ভূমিকা না হলেও অনুরূপ ভূমিকা পালনের চেষ্টা করছে। 'অনুরূপ ভূমিকা' বলতে বোঝাচ্ছে স্বদেশপ্রেমের বিকল্প হিসাবে গানের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রচার। গণসংগীত এই কাজটি বিধিমতেই সাধন করছে।

চল্লিশের দশকে দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের গর্ভ থেকে বাংলা গণসংগীতের জন্ম হয়েছিল। এই ক্ষেত্রে ধাত্রীর কাজ করেছিল ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ। সঙ্ঘের শিল্পীরা চারদিকের আবহ থেকে নতুন কালের সংকেত গ্রহণ করে জাতীয় ভাবোদ্দীপক কোরাস গানের বদলে সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শসম্মত এই নতুন রীতির গানের প্রবর্তন করেন। স্বাধীনতা যে আর দূরবর্তী নয় এবং মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকেই সম্মেলক গানের বাণীতে ও সুরে নতুন রূপ দিতে হবে এই ভাবটি তাঁদের রচিত ও সুরারোপিত গানে প্রকট হয়ে ওঠে। কোরাস অর্থাৎ সমষ্টির গান এবার প্রকৃত অর্থেই সমষ্টির গান হয়ে ওঠে।

গণসংগীতের বাণী রচনায় সুকান্ত ভট্টাচার্য, বিমলচন্দ্র ঘোষ, দিনেশ দাস, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কবি একদা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। বাণী ও সুর এককালীন রচনাকার হিসাবে যাঁদের ভূমিকা সবিশেষ অগ্রবর্তী ছিল

সেইসব অগ্রণী শিল্পীর মধ্যে ছিলেন ও আছেন—বিনয় রায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, সলিল চৌধুরী, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, পরেশ ধর, শম্ভু চৌধুরী প্রমুখ সুরকার ও গীতিকার। ইদানীংকালে এই যুগ্ম ভূমিকায় আমরা দেখতে পাচ্ছি অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ সেনগুপ্ত, মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, শুভেন্দু মাইতি, স্বপ্না ভট্টাচার্য, অলক সান্যাল প্রমুখকে। নিছক গায়ক হিসাবে পাচ্ছি নরেন মুখোপাধ্যায়, রঞ্জন প্রসাদ, গীতা চৌধুরী প্রমুখকে।

এঁদের মধ্যে সলিল চৌধুরী নিঃসংশয়ে সবচেয়ে প্রতিভাবান ও সবচেয়ে সৃষ্টিশীল। তবে তাঁর গান ও সুররচনা দুইই একটু হাল্কা প্রকৃতির। তাঁর সংগীত সৃষ্টি রাগসংগীতের ভিত্তির উপর আরও একটু সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হলে তাঁর গানের আর লয় ক্ষয় ছিল না।

লোকসংগীতের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

লোকসংগীত একটি প্রবহমান শিল্প। অতীতে তার শিকড়, বর্তমানে তার ডালপালার বিস্তার, ভবিষ্যতে তার অজানিত সম্ভাবনা। বর্তমান ডালপালার পাতা ঝরে গিয়ে যখন তারই পচনোর্বর মৃত্তিকায় নতুন বৃক্ষের অঙ্কুরোদ্গম হবে, তখন তারই ফলনকে আশ্রয় করে ঘটবে লোকসংগীতের ভবিষ্যতের সমৃদ্ধি। সে সমৃদ্ধির রূপ কেমন হবে তা এখনি জোর করে বলা যায় না, কেননা সম্ভাবনাটা আজ পর্যন্ত অনুমানের স্তরে নিবদ্ধ, তার সুষ্ঠু রূপরেখা কী হতে পারে বা কী হওয়া উচিত তা এখনও খতিয়ে দেখা হয়নি। আমরা শুধু এখানে লোকসংগীতের অতীত আর বর্তমান নিয়েই আলোচনা করতে পারি। ভবিষ্যতের জল্পনা আপাতত মুলতুবি থাকুক। যদিবা জল্পনা করা প্রয়োজন হয়, সূত্রাকারে ছাড়া তাকে উপস্থাপিত করা অসম্ভব।

খুব প্রাচীন কালে ভারতীয় বা বাংলা লোকসংগীতের রূপ কেমন ছিল তা আজ আর নিরূপণ করার উপায় নেই। তবে একটা জিনিস বোধহয় স্বচ্ছন্দেই বলা যায়। বিগত সমাজ আজকের ধাঁচ-ধরন অনুযায়ী যখন শ্রেণীবিভক্ত হয়নি বা নানান অর্থনৈতিক সম্প্রদায়ে বা গোষ্ঠীতে থাক-বিশিষ্ট হয়নি, তখন সব দেশেই লোকসংগীতের রূপ কমবেশী একরকম ছিল। প্রাচীন কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় লোকসংগীত সব দেশেই মোটামুটি এক ধারা অবলম্বন করে বাহিত হয়েছে। তার সুর ছিল মন্থর, শান্ত, ধীর লয় বিশিষ্ট। তার সুরে যৌথ জীবনের সংগ্রামের আভাস পাওয়া যেত নিশ্চয় তবে সে সংগ্রাম আজকের মত উত্তাল, সংক্ষুব্ধ, অস্থির প্রকৃতির ছিল না। কৃষি সভ্যতার সংস্কারের মধ্যে যে শান্ত নিরুদ্বিগ্ন অচঞ্চল জীবনযাত্রার আভাস মেলে, ফুটে ওঠে idyllic স্বপ্নালুতার ছবি, তারই রস প্রাচীন লোকসংগীতের সাধারণ লক্ষণ ছিল এরকম অনুমান করা কঠিন নয়—কি এদেশে কি বিদেশে। এ কথার প্রমাণস্বরূপে আমাদের দেশের যে কোন অঞ্চলের পুরাতন দেহাতী সুর, বাংলার ভাটিয়ালি ও বাউল, দক্ষিণ-সমুদ্র দ্বীপের ঘুম-পাড়ানিয়া সুরের গান, জাভা-বালি-শ্যাম-কম্বোজ-ভিয়েতনাম-চীন প্রভৃতি দেশের প্রাচীন লোকগীতির সুর, ইউরোপের জিপসী-যাযাবরদের কিংবা রুশী মাঝি-মাল্লাদের কিংবা স্পেন-দেশীয় মুরদের গান, প্রাচীন মিশরীয়

গান, আমেরিকার 'নিগ্রো স্পিরিচুয়াল'-এর সুর প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়। মনে হয় এসব গানের সুরের উৎস এক—পরে অঞ্চল ভেদে, প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য-ভেদে সুরগুলি বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়েছে।

আমাদের ভাটিয়ালির কথাই ধরা যাক। এটি নদীপথের গান, একক প্রেম সংগীতের পর্যায়ভুক্ত। এ গানের বিষয়বস্তুতে বিরহের আর্তিটাই প্রধান, হতাশার বিলাপে কথা ভরপুর। সুরের ঢঙ মন্থর, স্থির লয় যুক্ত, তালের বিক্ষেপহীন। এ গান কৃষি সভ্যতার কোলে লালিত শান্ত স্থির অজটিল জীবনের ছন্দটিকেই মুখ্যত মনে করিয়ে দেয়। ভাটিয়ালির উদ্ভবের একেবারে গোড়াকার ইতিহাস বলতে পারব না, তবে সুরটি যে কমপক্ষে সাতশো-আটশো বছরের পুরনো তার নজীর আছে। বড়ু চণ্ডীদাস রচিত 'কৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থে এই সুরের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। ভাটিয়ালির আদিরূপের মধ্যে নিশ্চয়ই রাধা-কৃষ্ণের প্রসঙ্গ ছিল না, নর-নারীর চিরন্তন প্রেমকামনার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত বিরহের ব্যক্তিগত অনুভূতিই ছিল তার প্রাণ এইরকম অনুমান করতে পারা যায়, কিন্তু গোটা বাংলাদেশ বৈষ্ণবীয় ভাবরসে নিমজ্জিত হওয়ার পর থেকে ভাটিয়ালির বিষয়-বস্তুর পরিবর্তন হলো, সাধারণ মানুষের প্রেমের আর্তি রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের রূপকে প্রকাশিত হতে লাগলো। মানুষকে হটিয়ে ধর্মীয়তার তথা আধ্যাত্মিকতার জায়গা দখল করার এ একটা মোক্ষম উদাহরণ স্থল। জবর-দখল ছাড়া একে আর কিছু বলা যায় না।

বাউল, মুর্শিদ্যা, মারাফতী প্রভৃতি গানকে দেহতত্ত্বের গান বলে মনে করা হয়। বাউল গানের দার্শনিক দিকটাই নাকি বাউল গানের প্রধান অঙ্গ। এখানেও ঠিক ভাটিয়ালির বেলায় যেমনটা হয়েছে, বাউলকে তার মানবিক অনুষঙ্গ থেকে বিচ্যুত করে আধ্যাত্মিক কুয়াসায় জড়াবার চেষ্টা করা হয়েছে। লালন শাহ ফকির, গগন হরকরা, মদন বাউল, হাসন রাজা, দুদ্দু শাহ প্রমুখ বাউলদের রচিত গানের পদ বিচার করলে কিন্তু উল্টো কথাই মনে হয়। মনে হয় তাঁরা দেহতত্ত্বের দার্শনিক কূটকচালি করার জন্য এসব গান বাঁধেননি, বেঁধেছিলেন লোক-প্রচলিত আনুষ্ঠানিক ধর্মাচারসমূহের ফাঁকি ও মেকি ধরিয়ে দেবার জন্য। ধর্ম-প্রচারের জন্যে নয়, পরন্তু ধর্মকে সংহার করবার জন্যেই তাঁদের বাউল সংগীতের অভিযান। যদি বলেন 'ধর্মসংহার' কথাটা একটু বাড়িয়ে বলা হলো, তাহলে তার উত্তরে বলবো, প্রচলিত ধর্মমতগুলির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করাই ছিল তাঁদের

সাধনার অন্যতম মূল লক্ষ্য। হিন্দুদের মন্দির এবং মুসলমানদের মসজিদ তাঁদের সমান কোপদৃষ্টিতে পড়েছিল। তাঁরাও হয়ত একটা ধর্মমতের কথা বলতেন, তবে সে ধর্মের নাম 'সহজিয়া ধর্ম', মানবতাতেই যার ভিত্তি। হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক মিলন বাউলদের প্রচারিত মানবতাবাদের এক মৌল উপাদান।

এসব কথা এখানে উদাহরণযোগে আরও বিস্তারিত করে বলা যেতে পারত কিন্তু তার আবশ্যকতা দেখি না। প্রথমত আমার বর্তমান প্রবন্ধের এটি মূল প্রতিপাদ্য নয়, প্রাসঙ্গিক বক্তব্য মাত্র ; দ্বিতীয়ত পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা এড়াতে চাই। লোকসংগীত বিশেষজ্ঞ শ্রীহেমাঙ্গ বিশ্বাস তাঁব 'লোকসংগীত সমীক্ষা : বাংলা ও আসাম' গ্রন্থেব "পল্লীসমাজেব সংগীত ও সংঘাত" এবং "বাংলার লোক-সংগীতে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের সাধনা" প্রবন্ধদ্বয়ে এই বিষয়টি নিয়ে উদ্ধৃতি সহ-যোগে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠক অবশ্যই সে বইখানা নেড়েচেড়ে দেখবেন।

লোকসংগীতের প্রবক্তাদের মধ্যে একটি বিষয়ে সুস্পষ্ট মতপার্থক্য দেখতে পাই। এক দল আছেন যাঁরা মনে করেন লোকসংগীতের পুবাতন সুবগুলিকে তাঁদেব অবিকৃত পুরাতন সুরেই বাঁচিয়ে বাখা চাই। অর্থাৎ এঁরা সুরের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধিবাদী বা purist। পূর্ববঙ্গের প্রয়াত কবি জসীমউদ্দিন, আমাদেব এখানকার লোকসাহিত্যের গবেষক প্রয়াত ডঃ আশুতোষ ভটাচার্য এবং হেমাঙ্গ বিশ্বাস—এঁরা এই তন্ত্রের মানুষ। জসীমউদ্দিন অধুনালুপ্ত 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর এক প্রবন্ধে এ বিষয়ে এতটাই আপসহীন মত প্রকাশ করেছেন যে, তিনি পুরাতন ভাটিয়ালি সুরের পানটি থেকে চুনটি পর্যন্ত খসতে দিতে নাবাজ। পুরনো গ্রামের সমাজে ভাটিয়ালি যেমন ভাবে গাওয়া হতো এখনও তেমন ভাবেই অর্থাৎ তেমনি কথা ও সুরের ঢঙ বজায় রেখে গাইতে হবে এই তাঁর দাবি। এদিকে ডঃ ভট্টাচার্যেব মতও প্রায় অনুরূপ। তাঁর বক্তব্য হলো এই যে, পূর্ববঙ্গের পরিবেশ থেকে বিচ্যুত করে পশ্চিমবঙ্গে পূর্ববঙ্গের ভাটিয়ালি এনে গাইলে তার আর জাত থাকে না—জাত নষ্ট হয়। গ্রাম থেকে শহরে এনে গাইলেও একই অবস্থা। একে তিনি "শহুরে ভাটিয়ালি" বলে তার মূল্যাপকর্ষ করতে চেয়েছেন। (বাংলার লোকসংগীত ২য় খণ্ডের ভূমিকা দ্রষ্টব্য। প্রকাশক বেঙ্গল মিউজিক কলেজ, গবেষণা বিভাগ)

এই দুজনার তুলনায় শ্রীযুক্ত হেমাঙ্গ বিশ্বাসের মত আরও বেশী আপসহীন।

তিনি বিশুদ্ধির একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়ে এমত ধারণা প্রচার করেছেন যে, ভাটিয়ালিকে তার গ্রামীণ পটভূমি থেকে উৎপাটিত করে শহরে এনে স্থাপন করলে তার জাত তো নষ্ট হয়ই, ভাটিয়ালির বিশেষ উপভাষা সঞ্জাত উচ্চারণ, স্বরক্ষেপের ভঙ্গিমা, কণ্ঠস্বরের বিশেষ ভৌগোলিক ধ্বনিবৈশিষ্ট্য—এগুলির ব্যত্যয়েও ভাটিয়ালির জাত চলে যায়। (পূর্বোল্লিখিত একই গ্রন্থের "লোকসংগীত, উপভাষা, উপমা ও উচ্চারণ" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। এইজন্য তিনি পূর্ববঙ্গের ভাটিয়ালি-গায়ক শচীন দেববর্মণকে ভাটিয়ালিতেই তাঁর কণ্ঠের স্বরকে সীমিত রাখতে বলেন, উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া গায়ক আব্বাসউদ্দিনকে ভাওয়াইয়ার সীমা ছাড়িয়ে না যাবার পরামর্শ দেন। দুইয়ের ভূমিকার বদল হলে অনর্থ অনিবার্য, কেননা ভাটিয়ালির উচ্চারণ আর স্বরক্ষেপের প্রণালীর সঙ্গে ভাওয়াইয়াব উচ্চারণ আর স্বরক্ষেপের প্রণালীর মিল নেই—পূর্ববঙ্গ আর উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক আবহের পার্থক্য থেকে ওই দুই শ্রেণীর গানেরও পার্থক্য ঘটে গিয়েছে। পূর্ববঙ্গ আর উত্তরবঙ্গেই যেখানে এত বেমিল, সেখানে পূর্ববঙ্গ আর পশ্চিমবঙ্গের লোকসংগীতের পরিবেশনার রীতির মধ্যে যে আরও অনেক পার্থক্য ঘটবে, সে কথা বলাই বাহুল্য।

এই গেল মতের এক প্রান্ত। মতের অন্য প্রান্তে আছেন সেইসব সংগীততত্ত্বজ্ঞ যাঁরা মনে করেন যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লোকসংগীতের কথায় ও সুরেও যুগোচিত পরিবর্তন ঘটতে বাধ্য। কৃষি ব্যবস্থার আওতায় যে-জাতীয় লোক-সংগীতের জন্ম হয়েছিল তার ভাব ভাষা সুর সুরপরিবেশনার রীতি শিল্প সভ্যতার আওতায় বর্ধিত গ্রামীণ ও নাগরিক সমাজের গানে পরিবর্তিত হতে বাধ্য। কোন কোন ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তনের ঝোঁক অপরিহার্য, কারণ পরিবেশ ও পরিপার্শ্ব আগের তুলনায় একেবারেই বদলে গেছে।

পূর্বে গ্রামের যে চেহারা ছিল, এখন আর গ্রামের সে চেহারা নেই। গ্রামের ভিতর নাগরিক জীবনের সাজসরঞ্জাম, উপকরণ উপাদানাদির ক্রমপ্রবেশ ঘটছে: গ্রামে বিদ্যুৎ, টিউবওয়েল, জলসেচের পাম্প, রেডিও-টিভি, সাইকেল-স্কুটার, মোটর-ট্যাক্সি-বাস-রিক্সা ইত্যাদি আজ আর বিরল দৃশ্য নয়, গ্রামজীবনের সঙ্গে এসব প্রকরণ ওতপ্রোতভাবেই জড়িয়ে গেছে বললে চলে। অন্যদিকে শহরে গ্রামের মানুষের আনাগোনা পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। রাস্তাঘাটের সুবিধা, যানবাহনের প্রাচুর্য, শহর ও গ্রামের মধ্যে আদান-প্রদানের

উপলক্ষ্যের বহুলতা, নাগরিক জীবনের বিবিধ আকর্ষণের প্রতি দুর্নিবার টান, সর্বোপরি, এটাই সবচেয়ে গুরুতর কারণ, জীবিকার সমস্যা—এই সমস্ত নানা অবস্থার মিলিত ফলস্বরূপ গ্রাম-শহরের পূর্বতন কৃত্রিম ভেদরেখা লোপ পেতে বসেছে। শিল্প বিপ্লবের সংস্পর্শ ও সংঘাতের প্রভাবের দরুন ইউরোপ খণ্ডে একদা গ্রাম ও শহরের পার্থক্যসীমা যেমন ঘুচে যাবার উপক্রম হয়েছিল, এখানেও ঠিক সেই পরিমাণ পরিবর্তন এখনও দেখা না গেলেও অনুরূপ প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়ে গিয়েছে বলা যেতে পারে। সনাতন কৃষি সভ্যতার আওতায় বেড়ে ওঠা বহির্জগতের স্পর্শ বর্জিত পুরনো ধাঁচের এদো গ্রাম আর আজকের শহর-বন্দরের ছোঁয়া লাগা নয়া ধাঁচের গ্রামের চেহারায় আকাশ-পাতাল তফাত। পশ্চিমবাংলার কথাই ধরা যাক। রাজধানী শহর কলকাতা আর জেলাগুলির মধ্যে এখন নিত্য চলাচল, নিত্য আসা-যাওয়া। অজ পাড়াগাঁর ধারণাটাই মুছে যাবার যো হয়েছে বলা চলে।

এই যেখানে অবস্থা সেখানে গম্ভীরা কিংবা গাজন গানের বাঁধুনিতে পুরনো দিনের অনুকরণে ভোলা মহেশ্বরের দুই সতীনকে ঘিরে কোঁদলের পাঁচালি কিংবা ধর্মঠাকুরের গানে একালের পক্ষে সম্পূর্ণ বেমানান বাতিল দেবতা ধর্মঠাকুরের নামে বাখানা অথবা বাউলের পদে জোর করে আধ্যাত্মিক কূট তত্ত্ব ঢুকিয়ে দেওয়া অথবা ভাটিয়ালি গানে জীবনযুদ্ধে পরাজয়ের স্বীকৃতি স্বরূপ ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণের বিলাপমুখরতা (মনমাঝি তোর বৈঠা নেরে আমি আর বাইতে পারলাম না, ইত্যাদি) —এসব এখন অচল। এ যুগ সংগ্রামের যুগ, গণমানুষের জাগরণের যুগ। চারদিকে কায়েমী স্বার্থবাদীদের বিরুদ্ধে নিপীড়িত শোষিত-জনদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে, দিকে দিকে তারই জয়ধ্বনি উঠেছে। কাজেই পুরনো জমানার ধরনে লোকগীতির পদে ভোলা বাবা, রাম, কৃষ্ণ, ধর্মঠাকুর, ভাঁদো কন্যা, ভাদুঠাকুর ইত্যাদি প্রসঙ্গ আর নয়, যুগের প্রয়োজনের সঙ্গে তাল রেখে লোকসংগীতের কথায় যুগোচিত বিষয়বস্তুর অনুপ্রবেশ বাঞ্ছনীয়। মালদহের গম্ভীরা আর মুর্শিদাবাদের আলকাপের কথায় আজকাল কিছু কিছু করে সামাজিক প্রসঙ্গের অবতারণা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে (সরকারী কর্মচারী শ্রীদিলীপ মুখোপাধ্যায়ের লোকসংগীত বিষয়ক সংগ্রহ গ্রন্থখানির গানগুলি দ্রষ্টব্য)। এই ঝোঁকটিকে আমাদের সকলেরই উৎসাহিত করা উচিত। লোক-সংগীতের কথায় মান্ধাতার আমলের ধরনে কারণে-অকারণে ধর্মের বাতাবরণ সৃষ্টি

করার দিন চলে গিয়েছে। যুগ পাল্টাচ্ছে অথচ অভ্যাসগত সংস্কারবশে পুরাতনের জাবর কেটে চলারই অপর নাম হলো যাকে বলে কালবারণজনিত দোষ ('অ্যানাক্রনিজম')।

সুরেও এই কালবারণজনিত দোষের ছাপ স্পষ্ট। এখন পর্যন্ত বেশীরভাগ লোকগীতির সুরই অনাবশ্যক রকম অমার্জিত ও রুচিমলিন, গেঁয়ো। ইচ্ছাপূর্বক সুরগুলিকে প্রকট গ্রাম্যতার স্তরে ধরে রাখা হয়েছে। কিন্তু এরকম হওয়ার কোন হেতু নেই। যেহেতু লোকসংগীতের ঐতিহ্য গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থায় সৃষ্ট ও পুষ্ট হয়েছে সেই কারণে গ্রাম্য সুরের বেড়ের মধ্যেই তার সুর চিরকাল আটকে রাখতে হবে তার কোন মানে নেই। তার ভিতর প্রয়োজনবোধে শহুরে সুরের অনুপ্রবেশ ঘটানোর চেষ্টায় কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয় বলে আমি মনে করি না। কেননা এ কথা আমাদের খেয়াল রাখা দরকার যে, লোকসংগীত একটি বহমান শিল্পের ধারা, সেই ধারা বইতে বইতে কবেই পল্লীর সংকীর্ণ গণ্ডী ছাপিয়ে গিয়েছে এবং শহুরে গণ্ডীতে এসে প্রবেশ করেছে। তার উপর, ওই শিল্পের উপর যুগ-প্রভাবের ছাপ পড়েছে। যা ছিল একদিন কৃষি সংস্কারকে কেন্দ্র করে আবর্তিত, তার উপরে এখন শিল্প সভ্যতার ছাপটিও অলক্ষ্য নয়। আমরা চাই বা না চাই লোকগীতির বিষয়বস্তুতে অর্থাৎ কথায় এবং রূপরীতিতে অর্থাৎ সুরে নতুন কালের রুচির ছাপ পড়তে বাধ্য।

এ সম্পর্কে আরও একটি কথা বিবেচনা করবার আছে। লোকসংগীত এখন আর কেবল গ্রামের মানুষেরই একলার সম্পত্তি নয়, তার ভোগদখলের চৌহদ্দি অনেক বেড়ে গিয়েছে, শহরের মানুষও এখন সমপরিমাণে লোকসংগীতের উপভোগী। কি গ্রামবাসী কি শহরবাসী দুই ধরনের সম্প্রদায়ই যখন এখন লোকসংগীতের উপভোগের অংশীদার, তখন লোকসংগীত জনসমাজের সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত হতে চলেছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। লোকসংগীত কথাটির মাধ্যেই লোকসংগীতের লৌকিকতার অর্থাৎ ব্যাপ্তির ছাপ স্পষ্ট।

তা যদি হয় তো এখনও লোকসংগীতের সুরকে পুরাতন ঢঙে পরিবেশন ও প্রচার করতে হবে তার কী কথা? ভাটিয়ালি গানের উচ্চারণ ও স্বরক্ষেপের কায়দায় কিছু ব্যত্যয় ঘটলেই মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বে এমন আশঙ্কার কী কারণ থাকতে পারে? উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া অথবা চটকা গানে কোন সুরকার যদি প্রখ্যাত কবিয়াল নিবারণ পণ্ডিতের অনুসরণে সংগ্রামী সুরের সংযোজনা

অথবা মুর্শিদাবাদ কিংবা বীরভূম জেলায় প্রচলিত বাউলের বাণীতে যদি গণ-গীতিকার কবিয়াল শেখ গুমানি দেওয়ানের রীতিতে গণবিক্ষোভের ভাষা জুড়ে দেওয়া হয় তাহলেই লোকসংগীতের জাত নষ্ট হয়ে গেল এরকম মনে করার কারণ আছে কি ? যুগটা গণতন্ত্রের সে কথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। যুগ-সম্মত গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রভাবে কোন শিল্প যখন জনসাধারণের অবাধ উপ-ভোগের বস্তুতে পরিণত হয়—যেমন রবীন্দ্রসংগীত আর লোকসংগীত হয়েছে বলে আমরা মনে করি—তখন আর কৃত্রিম ফতোয়ার অনুশাসন জারী করে তার অগ্রগমন রোধ করা সম্ভব বলে বিশ্বাস করি না। সেটা বাঞ্ছনীয়ও বোধহয় নয়। যুগোচিত গণতান্ত্রিকীকরণের ঝোঁক অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট শিল্পটির সীমা যত বাড়ানো যায় ততই ভালো। তার উপভোগের মাত্রায়ও কোন কৃত্রিম বিধিনিষেধ আরোপ করা সমীচীন নয়। সেরকম নিষেধ যদি আরোপিত হয়ও, কেউ তা মানা করবে বলে বোধ হয় না।

লোকসংগীতের এই গণতান্ত্রিক বিস্তারমুখী প্রবণতাকে যে সব লোকযানী পণ্ডিত গ্রাহ্য বলে মনে করেন এবং তাকে স্বাগত জানান তাঁদের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি হলেন পূর্ব জার্মানীর হাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত ভারততাত্ত্বিক ডক্টর হানস মোদে। মোদে সাহেবের সুস্পষ্ট অভিমত হলো, শিল্পায়িতকরণের যুগে প্রাচীন লোকসংস্কৃতির তথা লোকসংগীতের যুগোচিত রূপান্তর ঘটা অবশ্যম্ভাবী। রূপান্তরণের এই প্রক্রিয়া রোধ করাও সাধ্য নয় (Institute of Folklore কর্তৃক প্রকাশিত Folklore নামক সংকলনগ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। আমাদেরও একই বক্তব্য। হেমাঙ্গ বিশ্বাসেরা এই বক্তব্য মানতে চান না এবং চিন্তায় প্রগতিবাদী হয়েও নিজস্ব অধিকারের সীমানায় এসে লোকসংগীতের কথা ও সুরের পূর্বতন বিশুদ্ধি রক্ষায় যত্নপর হন। এটা শুধু পশ্চাদ্‌মুখী মনোভাবেরই পরিচায়ক নয়, প্রগতিবিরোধী মনোভাবেরও পোষক বটে। সকলপ্রকার রাষ্ট্রিক ও সামাজিক প্রশ্নে প্রগতিশীলতার জয়ধ্বনি করব অথচ নিজের একান্ত চর্চার বিষয়ের ক্ষেত্রে এলেই নিকষ-কুলীন সেজে লোকসংগীতের আদিম পবিত্রতাকে যাবতীয় স্পর্শদোষ থেকে বাঁচিয়ে কৌলীন্য প্রথা টিকিয়ে রাখার চেষ্টার ত্রুটি করব না—এ জিনিস পরস্পরবিরোধী এক দৃষ্টিভঙ্গী। দুটি মনোভাবের মধ্যে সামঞ্জস্য করা কঠিন। একই কালে অগ্রসর চিন্তার উদার প্রসন্নতায় অবারিত হব আবার ছুঁৎমার্গী মনোভাবে সংকুচিত হয়ে থাকব—এ হয়

না। এ জিনিস নিজেকেই খণ্ডন করবার সামিল।

আসলে হেমাঙ্গবাবুরা এই শতকের প্রথম দিকে সেসিল শার্প প্রমুখ ইংলণ্ডীয় লোকযানীরা লোকসংগীতের আদিম উৎসে ফিরে যাওয়ার জন্য যে-প্রক্রিয়ার অবলম্বন করেছিলেন—লোকসংগীতের প্রাচীনতম অবিকৃত রূপের সন্ধান—তারই অঞ্চলসংলগ্ন হয়ে আছেন বলে সন্দেহ হয়। তার পরে এই ষাট-সত্তর বছর কালমধ্যে লোকসংগীতের বিবর্তনের নদী বেয়ে কত যে জল গড়িয়ে গেছে তার আর হিসাব করেননি। এ কথাও তাঁদের খেয়াল হয়নি যে, আমাদেরই দেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামক এক ব্যক্তি এই শতাব্দীর গোড়াকার বৎসরগুলিতে স্বদেশী গান রচনার ছলে বাংলা লোকসংগীতের সুরের বহুল ব্যবহার করেছিলেন এবং তা করতে গিয়ে বাংলা লোকসংগীতের প্রচলিত রূপের গোত্রান্তর ঘটিয়ে দিয়েছিলেন। বাউল ও ভাটিয়ালির সুরকে তিনি শহরের sophisticated গানের কাঠামোয় এমন কৌশলে ও নিপুণ ভাবে graft করেছিলেন যে নাগরিক সংগীতেরও চেহারা বদলে গিয়েছিল, এদিকে বাউল-ভাটিয়ালিরও পুরনো পরিচিত রূপেরও আর লেশমাত্র অবশেষ ছিল না। এ যদি যুগের সঙ্গে তাল রেখে লোকসংগীতের সময়োচিত পরিবর্তন বিধানের প্রয়াস না হয় তাহলে তাকে যে আর কী বলা যায় জানি না। রবীন্দ্রনাথ যদি বাউল-ভাটিয়ালির ক্ষেত্রে তাঁর নিত্যনবনবোন্মেষশালিনী সৃষ্টিশীল প্রতিভার জাদুদণ্ড প্রয়োগ না করতেন এবং মৌলিকতার স্বাধীনতা না নিতেন তাহলে বাউল-ভাটিয়ালির পুরাতন অচলপ্রতিষ্ঠ রূপের আর পরিবর্তন হতো না, প্রাচীন লোকগীতির সুর তাদের প্রাচীনত্বের অহংকার নিয়ে একঠাঁয়েই দাঁড়িয়ে থাকতো। রবীন্দ্রনাথ সুরযোজনায় গ্রামকে শহরের কাছে এনেছিলেন শহরকে গ্রামের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন—তবেই বাংলা গানে নবীনত্বের উদ্বোধন করতে পেরেছিলেন। দেওয়া-নেওয়া সব সময় দ্বিমুখী হতে হয়, নয়তো সৃষ্টির সমৃদ্ধি বিধান হয় না। পল্লী নগরের কাছে আসবে নগর পল্লীর কোলে গিয়ে ধরা দেবে—এইটেই আদর্শ সম্মিলন। কৃষি-সভ্যতা শিল্প-সভ্যতার পথে বিবর্তিত হতে হতে এগিয়ে চলবে এটা শুধু অর্থনীতিরই নিয়ম নয়, শিল্প-সংস্কৃতিরও নিয়ম। শিল্প সাহিত্য সংগীত প্রভৃতির অগ্রগতির তত্ত্ব এই পথেই নিহিত আছে বলে মনে করি।

সাধারণত বাংলা লোকসংগীতের সুরে কাফি খাম্বাজ ঝিঁঝিট বিভাস পিলু ভীমপলশ্রী ধানী পটদীপ পাহাড়ী মাঁঢ় বিহারী প্রভৃতি সুরের প্রয়োগ হয়ে থাকে।

সব কটি হাল্কা রাগের সুর—ভারী রাগ খুব কম ক্ষেত্রেই ব্যবহার হয়। প্রয়াত সংগীতশাস্ত্রী সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় ভাটিয়ালির সুররূপের বিশ্লেষণ করে বলেছেন ভাটিয়ালিতে যে-রাগের আমেজ প্রকাশ পায় তা কসৌলি ঝিঁঝিট-এর আমেজ। এ রাগের সুরভঙ্গী এইরূপ: স র ম I প ম গ র ণ্‌ ধ্‌ I ধ্‌ স স র গ, র গ স I অন্যদিকে 'বাংলা সংগীতের রূপ' গ্রন্থের প্রণেতা বিশিষ্ট সংগীতবিদ সুকুমার রায় মনে করেন ভাটিয়ালিব সুরভঙ্গীতে বিলাবল রাগেব ছায়াপাতই বেশী লক্ষ্য করা যায় (বাংলা সংগীতের রূপ, পৃ ১১৬)। পক্ষান্তরে ডক্টর শ্রীমতী পূর্ণিমা সিংহ An Introduction to the Study of Indian Music গ্রন্থে পুরুলিয়ার করম ও টুসু গানের রাগরূপ বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, এই দুটি গানের সুবভঙ্গিতে খাম্বাজ রাগের প্রভাবই সবচেয়ে বেশী। এইরূপ রামপ্রসাদী বা মালসী গানের গঠনে পাওয়া যায় হাম্বীর রাগের প্রভাব। বাউলের সুবে কখনও ভৈরবী কখনও বেহাগ কখনও কাফি কখনও বিভাস। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে প্রচলিত লোকগীতির সুবে রয়েছে মাঁঢ়, পাহাড়ী, ভীমপলশ্রী, পটদীপ, ধানী, বিহারী প্রভৃতি। পাঞ্জাবের দেহাতী গানেও অনুরূপ হাল্কা রাগগুলির সুরের ঝিলিমিলি লক্ষ্য করা যায়। মোট কথা, কি বাংলার লোকসংগীতে কি বাংলার বাইরের লোকগীতিতে সুর সবসময় হাল্কা রাগগুলিকে সম্বল করে লীলায়িত হয়ে উঠেছে দেখা যায়। বিদেশী লোকসংগীতের সুরেও নানান হাল্কা রাগরাগিণীরই সাক্ষ্য স্পষ্ট অনুভব করা যায়। এর থেকে এরকম একটা ধারণা বোধকরি করে নেওয়া চলে যে, ভারী রাগে কখনও লোকসংগীত হয় না। ভারী রাগ বলতে বোঝায় দরবারী কানাড়া, টোড়ী, ইমন, কল্যাণ, মালকোষ, ভৈরোঁ, পূরবী, পুরিয়াধানেশ্রী, শ্রী, পরজ, বসন্ত প্রভৃতি। ভারী রাগে লোকগীতি হয় না তার কারণ লোকগীতির আবেদন ভাবাবেগময়; সেইহেতু কমবেশী রোমান্টিক। পক্ষান্তরে ভারী রাগগুলির গঠনে ক্লাসিক উপাদানই বেশী। সেইজন্য লোকগীতির সুররচনায় ভারী রাগগুলির উপযোগিতা তেমন স্পষ্ট নয়।

তবে এটা সাধারণ নিয়ম হলেও সবসময়ই যে এই নিয়মকে কঠোর ভাবে অনুসরণ করে চলতে হবে তার কোন কথা নেই। সুরের জগতে ধরা-বাঁধা বিধান বলে কোনও বস্তু নেই। আজকের যুগের আবহকে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে প্রয়োজন হয তো ভারী রাগেরও শরণ নিতে হবে বইকি। সুরের গঠনে যুগোচিত পরিবর্তন আনা কিছু দোষাবহ ব্যাপাব নয়। যেমন গানের বাণীতে তেমনি সুর রচনায়,

তেমনি গানের পরিবেশনায় বর্তমান কালের ভাবের প্রতিফলন ঘটাতে হবে নিশ্চয়। এবং তা করতে গিয়ে যদি পুরাতন নিয়মের ব্যত্যয় ঘটাতে হয় তো সেই ব্যতিক্রমকেও শিরোধার্য করা ছাড়া উপায় নেই। বস্তুত, নতুন সুরসৃষ্টির বেলায় হাল্কা রাগ এবং ভারী রাগ এই দুটি স্বতন্ত্র কোঠা তৈরী করে দুটি পরস্পর-নিরপেক্ষ, জল-অচল প্রকোষ্ঠ বানিয়ে তোলার কোন যুক্তি নেই। বানিয়ে তুলতে চাইলেও সেটা গ্রাহ্য হবে বলে মনে হয় না।

তবে এটা ঠিক যে, ভাবাবেগময় কথার সুর সংযোজনায় হাল্কা রাগই সমধিক প্রশস্ত। বিশেষত যেসকল গানে wailing বা বিলাপের ভাব আছে সেইসব ক্রন্দনপ্রবণ সুরে হাল্কা রাগ প্রয়োগ করাই যুক্তিযুক্ত। হাল্কা রাগের মধ্যেও আবার ভীমপলশ্রী, পটদীপ, পানী, পাহাড়ী, মাঁঢ সমধিক উপযোগী। কান্নার ভাব ফুটিয়ে তুলতে ভীমপলশ্রী ও পটদীপ রাগ দুটির জুড়ি নেই।

লোকসংগীতের কথাবস্তুর বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এলে দেখতে পাই, বাংলার লোকসংগীত যতবেশী সমতলভূমি ত্যাগ করে আদিবাসী অধ্যুষিত সীমান্ত এলাকায় অথবা পাহাড়ী এলাকায় প্রবেশ করেছে তত সেইসব গানের কথা-বস্তুতে ধর্মের বা আধ্যাত্মিকতার কুয়াশা কমে গিয়ে জাগতিকতা বা সাংসারিক অভাব-অভিযোগের বার্তাটাই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুরুলিয়ার আদিবাসীদের করম বা টুসু গানে অথবা সাঁওতালী ঝুমুর গানে অথবা আসামের চা বাগিচার গানে আধ্যাত্মিক কুয়াশার ছিটেফোঁটাও নেই। সেইসব গানের ভাব একান্ত ভাবেই জীবন-সংগ্রামের দ্যোতক, গার্হস্থ্য সুখদুঃখের আকৃতিতে পূর্ণ, ভাত-কাপড়ের স্বাচ্ছন্দ্য সমেত সোয়াস্তিতে ঘরসংসার করবার কাতরতা এসব গানের কথার মধ্য দিয়ে ছত্রে ছত্রে ফুটে বেরুচ্ছে। এমনকি সমতল ক্ষেত্র বিশিষ্ট উত্তর-বঙ্গের কুচবিহার জেলার চটকা গানেও এই ইহমুখীনতার পরিচয় অতি স্পষ্ট। এছাড়া, সারি গানে, ছাতপিটানো গানে, ধান ভানার গানে এবং এই ধরনের আরও অন্যান্য কর্মভিত্তিক সম্মেলক গানের কথাতেও এমনিতর মর্ত্যভাবের ছড়াছড়ি। কোচ যুবা কোচকন্যাকে বিয়ে করবার সময় নানা মনভুলানো প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এখন ঘর করতে এসে মেয়ে দেখল এবেলা ভাত জোটে তো ওবেলা ভাত জোটে না। পরনের শাড়ীখানা ত্যানারও অধম। তাই ভাঁওতা দিয়ে বিয়ে করার জন্য স্বামীকে শাপশাপান্ত করে স্ত্রীর জবানীতে তীব্র শ্লেষাত্মক চটকা গান—

নাক ভাঙ্গেরার বেটা টা
চোখ ভাঙ্গারীর নাতিটা
মোক ভোলালু সতের খাড়ু দিয়া।
তকনে না কইচিস্ তুই রে
মোটা চাউল খাইনা
সরু চাউলের নেকায় জোকায় নাই।
ওরে বাড়ি আসিয়া দ্যাখোং মুই
চাতুরালি করিলু তুই
ঘরৎহীনা তোর খুদির গুড়ায় নাই॥

কিংবা, বাপভাইয়ের প্রতি কন্যার দারুণ আক্রোশ, যেহেতু টাকা খেয়ে মাতাল স্বামীর হাতে তাকে সঁপে দেওয়া হয়েছে—

বাপ ভাই মোব তুরাচার
বেচেয়া খাইছে মোর দূরান্তর রে
বেচেয়া খাইছে মোক মদকিয়ার ঘবেরে॥

কিংবা আসামের চা-বাগিচার গানে পাই আড়কাঠি যতুরামেব বিরুদ্ধে ছোট-নাগপুরের সাঁওতাল চা-শ্রমিকের বিক্ষোভ—

যতুরাম, ফাঁকি দিয়া পাঠাইলি আসাম।
সাহেব বলে কাম, কাম,
বাবু বলে ধরি আন,
সর্দার বলে লিব পিঠের চাম রে।
ফাঁকি দিয়া পাঠাইলি আসাম॥

কিংবা, সাঁওতালী ঝুমুরের মধ্যে পাওয়া যায় এমন ভাব যাকে বাংলায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায়—

বাবা, দয়াও করলে না, মায়াও করলে না,
পনের টাকা নিয়ে
সরষে তিলের মত বেচে দিলে।
মাগো, দয়াও করলে না. মায়াও করলে না,
কুটুম লোভে লোভেই
বিদায় দিলে॥

অর্থাৎ বাপমায়ের বিরুদ্ধে অযোগ্য পাত্রে সমর্পিতা কন্যার তীব্র রোষের অভিব্যক্তি ভাষা পেয়েছে এই গানটিতে। যেমন উত্তরবঙ্গের বহু ভাওয়াইয়া ও চটকা গানে 'বেচেয়া খাওয়া' অর্থাৎ টাকার লোভে বিয়ে দেওয়ার প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়ে উঠেছে কন্যার কণ্ঠে।

এইসব আর কিছুই নয়, মানুষের বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা এবং দারিদ্র্যদৈন্যদশার প্রতি বীতরাগের প্রতীক। জীবনপ্রীতিতে এইসকল গানের কথা ও সুর প্রতি পদে নিষিক্ত। সুখে-স্বচ্ছন্দে বাঁচবার কামনা জীবনে খণ্ডিত হওয়ায় সে বেদনার অভিব্যক্তিও বড় কম নেই গানগুলিতে। ধর্মীয়তায় আচ্ছন্ন লোকগীতিগুলির সঙ্গে এইসব গানের কতইনা তফাত। গানগুলির ঐহিকতার দিকে ঝোঁক তাদের গভীর বাস্তবধর্মিতার সংস্কার মনে করিয়ে দেয়।

পরিশিষ্ট—ক

["যুগান্তর' পত্রিকার ১৭. ১. ১৯৩৩ তারিখের সংখ্যায় আমি "বাংলা লোকসংগীত: কয়েকটি সমস্যা" নামে একটি নিবন্ধ লিখেছিলাম। সেই রচনাটির সমর্থনে ও প্রতিবাদে ওই পত্রিকার পৃষ্ঠায় কিছু বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়। আমার বক্তব্যকে সমর্থন করে যাঁরা পত্র প্রকাশ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন সাংবাদিক শ্রীপরেশ সাহা ও জলপাইগুড়ির শ্রীসুকুমার বিশ্বাস। বিপক্ষে লেখনী ধারণ করেছিলেন প্রখ্যাত লোকসংগীততাত্ত্বিক ও শিল্পী শ্রীহেমাঙ্গ বিশ্বাস। হেমাঙ্গ-বাবুর মতামত বিতর্কিত হলেও গভীর অভিনিবেশপূর্বক অবধানযোগ্য। এইখানে মূল প্রবন্ধ ও হেমাঙ্গবাবুর প্রতিবাদ-নিবন্ধ দুটি পর পর ছাপানো হলো পাঠকের বিচার-বিবেচনার জন্য।
—লেখক]

১

বাংলা লোকসংগীত: কয়েকটি সমস্যা

নারায়ণ চৌধুরী

বাংলা লোকসংগীতের প্রবক্তাদের মধ্যে দুটি স্পষ্ট ভাগ দেখতে পাওয়া যায়। এক ভাগে আছেন তাঁরা যাঁরা লোকসংগীতকে তার পুরাতন বিশুদ্ধরূপে বাঁচিয়ে রাখতে চান, তার ভিতর কোনোরূপ যুগোচিত মিশ্রণ বা পরিবর্তন সমর্থন করেন না। এঁরা এতটাই বিশুদ্ধিবাদী যে, শুধু যে তাঁরা পুরাতন লোকসংগীতের কথা, সুরভঙ্গী, ভাবানুষঙ্গ ইত্যাদিকেই রক্ষা করতে চান তা-ই নয়, সেই সঙ্গে যে-অঞ্চলের যে-গান, সেই অঞ্চলের গ্রামীণ শ্রমজীবনের সংস্কার, গাইবার ধরন, উচ্চারণ-পদ্ধতি, স্বরক্ষেপ-প্রণালী, এক কথায় আঞ্চলিক 'টোনাল কোয়ালিটি' বা স্বরগত বৈশিষ্ট্যগুলিকেও অবিকৃত রাখতে চান। দৃষ্টান্তস্বরূপ, উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া কিংবা চটকা গানের সঙ্গে কৃষি ও গোচারণ জীবনের যে-সংস্কার ওতপ্রোত হয়ে আছে, তার ছবিটি এঁরা হুবহু প্রতিফলিত দেখতে চান ভাওয়াইয়া কিংবা চটকা গান পরিবেশনার সময় সেই সেই শিল্পীর কণ্ঠে। অথবা ভাটিয়ালি ও সারি গানের সঙ্গে রয়েছে নদীজপমালাধৃতপ্রান্তর পূর্ববঙ্গের জলপথের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক; ভাটিয়ালি আর সারিগানের রূপায়ণে ওই সম্পর্কের অবিকল

প্রতিভাস দেখতে না পেলে এইসব বিশুদ্ধিবাদীর অন্তর অতৃপ্ত থেকে যায়।

এই শ্রেণীর প্রবক্তাদের মধ্যে কয়েকজন হলেন—পরলোকগত প্রসিদ্ধ লোক-সংগীতশিল্পী আব্বাসউদ্দিন, কবি জসীমউদ্দিন এবং একাধারে লোকসংগীতশিল্পী ও লোকসংগীততাত্ত্বিক হেমাঙ্গ বিশ্বাস। শ্রীবিশ্বাস পত্র-পত্রিকায় তাঁর একাধিক প্রবন্ধে ও গানের আসরের আলোচনায় বিগত দিনের লোকসংগীতের সর্ববিধ বিশুদ্ধিরক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর খুবই জোর দিয়ে আসছেন কিছুকাল যাবৎ। বলতে গেলে এই ক্ষেত্রে তিনি 'ক্রুশেডার'-এর উদ্যম নিয়ে নেমেছেন। তাঁর উদাহরণযোগে বিস্তারিত বক্তব্য একটা প্রণিধান করবার মতো বস্তু।

অন্যপক্ষে, দ্বিতীয়ভাগে আছেন সেইসব লোকসংগীতবিশেষজ্ঞ, যাঁরা মনে করেন লোকসংগীতকে আর তার পুরনো রূপে জীইয়ে রাখা সম্ভব নয়—সমাজ-তাত্ত্বিক কারণেই সম্ভব নয়। এঁরা লোকসংগীতের কথা ও সুরভঙ্গীর কালোচিত পরিবর্তনের পক্ষপাতী, অন্তত অনিবার্য পরিবর্তনের এঁরা বিরোধী নন। সমাজ-বিবর্তনেব গতিমুখে অন্যান্য শিল্পশাখার মতো এই শিল্পশাখাতেও যদি কিছু পরিবর্তন—রূপান্তর সংসাধিত হয়ে থাকে, তাকে প্রসন্নচিত্তে মেনে নেবার দিকেই এঁদের মনের ঝোঁক। পরিবর্তনবাদী এইসব প্রবক্তার বক্তব্য হলো: চারদিকে সমাজক্রান্তির হাওয়া বইছে। কৃষিকেন্দ্রিক গ্রামীণ সমাজের পুরনো কাঠামো ভেঙে গিয়ে তার জায়গায় দেখা দিচ্ছে নতুন উৎপাদন-বিন্যাস; শ্রম-জীবনের স্বরূপ যাচ্ছে বদলে। আজ কৃষির পাশে পাশে দেখা দিয়েছে বড় ও ছোট নানা আকারের শিল্পোদ্যোগ, এমনকি গ্রামের মধ্যেও প্রবেশ করেছে এই নতুন শিল্পায়িতকরণের হাওয়া। উৎপাদন-ব্যবস্থার রূপান্তরের ফলে গ্রাম আর শহরের পুরাতন সীমারেখা যাচ্ছে মুছে—গ্রামের লোক শহরে আসছে, শহরের লোক গ্রামে যাচ্ছে, এককালের প্রায় বিচ্ছিন্ন দুই জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঘটছে হামেশা মিশ্রণ। একদা চাষাবাদ করত এমন কত মানুষ যে আজ শহরের কল কারখানায় কাজ করছে তার লেখাজোখা নেই।

এমতাবস্থায় লোকসংগীতের প্রাচীন রূপ হুবহু বাঁচিয়ে রাখতে বললেই তাকে হুবহু বাঁচিয়ে রাখা যায় না, তার উপর পরিবর্তনের ছাপ পড়বেই। নিরবচ্ছিন্ন কৃষিকেন্দ্রিক সমাজে পল্লীগীতির যে রূপ ছিল, আজকের শিল্প আর কৃষিতে জড়ানো-মেশানো সমাজে সেই রূপ অপরিবর্তিত থাকবে এমন আশা করা যায় না। কিন্তু লোকসংগীতের কথায় ও সুরে, কিংবা তার আঞ্চলিক বাগ্‌ভঙ্গী ও

স্বরক্ষেপের ধরনের মধ্যে অল্পবিস্তর নাগরিক প্রভাবের অনুপ্রবেশ অপ্রতিরোধ্য বলা যায়।

বিদেশের 'লোকযানী' (ফোক্‌লোরিস্ট)-দের মধ্যে এই মতের প্রবক্তা একাধিক আছেন, দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রসিদ্ধ লোকযানী জার্মান পণ্ডিত ডক্টর হ্যানস মোদের নাম করা যায়; তবে আমাদের দেশে এই শ্রেণীর তাত্ত্বিককে এখনও চিহ্নিত করা কঠিন, কেননা এই দৃষ্টিভঙ্গী এখনও কারও মতের ভিতর সুনিশ্চিত আকার লাভ করেনি, তা আকাশে-বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে মাত্র। তবে পরিবেশিত গানের ধরন থেকে যদি সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে হয় তো বলতেই হয় যে, লোকসংগীতশিল্পী আর লোকসংগীত-অনুরাগীদের মহলে এখন এই মতেরই প্রাধান্য। বিশিষ্ট লোকগায়ক নির্মলেন্দু চৌধুরী, অপরেশ লাহিড়ী, অমর পাল, পূর্ণদাস বাউল, বিষ্ণুপদ দাস, অংশুমান রায় প্রমুখেরা ইদানীং যে-ভঙ্গীতে ও যে-পদ্ধতিতে লোকসংগীত পরিবেশন করছেন তার ভিতর পুরাতন দিনের গায়ন-পদ্ধতি কতটা টিকে আছে সে বিষয়ে সংগতভাবেই সন্দেহ করা চলে। বরং এঁদের গান সম্পর্কে এই বললেই ঠিক বলা হয় যে, এঁরা লোকসংগীতের সুপরিচিত শিল্পী হলেও, যেহেতু এঁদের গানের অধিকাংশ শ্রোতাই হলেন শহরের বাসিন্দা, সেই কারণে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক এঁদের নাগরিক সমাজের রুচি অনুযায়ী স্বরভঙ্গীর স্থানোচিত বদল করতে হয়ই। এমনকি কখনও কখনও গানের অমার্জিত শব্দ বা শব্দ-সমষ্টিকেও এঁদের বদল করে নিতে দেখা যায় শহুরে শ্রোতাদের মুখ চেয়ে।

উদাহরণত, ভাটিয়ালি গান হলো একান্তভাবেই 'সোলো' বা একক গান, সারি গানের মতো যৌথ গান নয়। দিনের শেষে ভাটির স্রোতে নৌকা বাইতে বাইতে সারাদিনমানের কর্মক্লান্ত নাওয়ের মাঝি নিতান্ত মন্থর ক্রন্দনকরুণ সুরে, টানা লয়ে, ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ বেদনা ও আর্তির যে গান গায়, তারই নাম ভাটিয়ালি। এ গান স্পষ্টত ব্যক্তিকেন্দ্রিক, সমষ্টির ভূমিকা এতে অনুপস্থিত। অথচ দেখতে পাই নির্মলেন্দু চৌধুরী 'মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে, আমি আর বাইতে পারলাম না' এই প্রসিদ্ধ ভাটিয়ালিটির রূপ দেবার সময় কখনও কখনও একাধিক শিল্পীর কণ্ঠের সাহায্য গ্রহণ করে থাকেন। তাতে 'এফেক্ট' যে খুব খারাপ হয় তা বলি না, তবে গানটি যে আর পুরাতন-পরিচিত ভাটিয়ালির কাঠামোয় আবদ্ধ থাকে না তা বোধহয় প্রতিবাদের শঙ্কা না করেই বলা যায়।

খুব সম্ভব নাগরিক শ্রোতাদের চিত্ত-বিনোদনের জন্যই গানে এই নাটকীয়তার অবতারণা।

'আল্লা ম্যাঘ দে, পানি দে, ছায়া দেরে তুই, আল্লা ম্যাঘ দে' গানটি হলো একটি সুবিদিত জারি গান। কারবালার মরুপ্রান্তরে জলাভাবে মৃতপ্রায় হাসানের অনুচরদের মেঘের জন্যে প্রার্থনাসংগীত। অথচ এই গানটিকেই তার অনুষঙ্গ বদল করে ভিন্ন পরিবেশে এনে যখন গাওয়া হয় 'আল্লা মেঘ দে, পানি দে' ইত্যাদি ('ও আমার দেশের মাটি' ছায়াছবির গান) রূপে তখন মার্জিত শব্দপ্রয়োগে নাগরিক রুচিরোচন কর্ণের হয়তো তৃপ্তিবিধান হয়, কিন্তু গানটি আর জারি গান থাকে না, হয়ে দাঁড়ায় তার বিকৃতি। 'ম্যাঘ'কে 'মেঘে' রূপান্তরিত করলে মেঘ শহরের আকাশে ভেসে আসে, গ্রামের আকাশে আর থাকে না।

এম্নিধারা পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত আরও দেওয়া যায়। তবে বক্তব্য প্রতিপাদনের পক্ষে এই দুই দৃষ্টান্তই বোধকরি যথেষ্ট। কথা হলো, এজাতীয় পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় হোক বা না-হোক, তাকে ঠেকানো যাবে কিনা। যে-হারে শহর-জীবনের মধ্যে গ্রামের অনুপ্রবেশ ঘটছে আর গ্রামে শহরের, সেই অনিবার্য দ্বিমুখী গতিবেগ আর পারস্পরিক লেনদেনের মুখে লোকসংগীতের পুরাতন বিশুদ্ধ রূপ অবিকৃত রাখা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। বেশীরভাগ লোকগায়কই আজ শহরে কেন্দ্রীভূত, আরও স্পষ্ট করে বললে কলকাতায়। যে-সব খাঁটি গাইয়ে এখনও ভিটামাটির মায়ায় গ্রামজীবনকে আঁকড়ে রয়েছেন তাঁদেরও অনেকে প্রাণান্তকর জীবিকার তাড়নায় ক্রমেই শহরে এসে ভিড় করছেন। শহরের আবহাওয়ায় লোকগীতি পরিবেশন করা হবে অথচ তাতে শহরের ছাপ পড়বে না—এমন হয় না। লোকগীতি তো পরের কথা, এমন যে নাগরিক বৈদগ্ধ্যের আবহাওয়ায় সৃষ্ট রবীন্দ্রসংগীত, ক্রম-বর্ধমান জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যেই কত রকমের সুরের ভ্যাজাল প্রবেশ করছে, রবীন্দ্রসংগীতের ন্যাসরক্ষকেরা শতবিধ আটঘাট বেঁধেও তার স্থূল হস্তাবলেপ থেকে রবীন্দ্রসংগীতের স্বরবিশুদ্ধি রক্ষা করতে পারছেন না। বোধহয় শিল্পের উত্তরোত্তর গণতান্ত্রিকীকরণের ক্ষেত্রে এটা অপরিহার্য। আমরা চাই বা না-চাই, পছন্দ করি আর না-করি, শিল্পের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের আদিম মৌলিক রূপের বিবর্তন ও পরিবর্তন ঘটতে বাধ্য। রবীন্দ্রসংগীতের বেলায় যখন এটা হচ্ছে, লোকগীতির বেলায়ই বা হবে না কেন।

উপরে যে দুই বিপরীত বক্তব্যের রূপরেখা দেওয়া হলো, সে দুটি মতের

সামঞ্জস্য করতে পারলে বড় ভালো হয়। সামঞ্জস্য মানেই রফা, নিজ নিজ পক্ষের কতক দাবি ছেড়ে দিয়ে মধ্যপন্থা গ্রহণ। যেমন ভাষায় নতুন নতুন শব্দ প্রবেশ করে, যেমন শিল্পকলায় বিদেশী প্রভাব অন্তরস্থ হয়, যেমন সৃষ্টিশীল সাহিত্যের রূপ আধুনিকতার সঙ্গে তাল রেখে বিবর্তিত হয়ে চলে ; ঠিক তেমনিভাবে যদি লোকসংগীতের সুরভঙ্গীর মধ্যে অবলীলায় নাগরিক কিছু কিছু সুরের লীলা প্রবেশ করে তাকে প্রতিরোধ না করে স্বাগত জানানোই বোধকরি বিধেয়। তবে দেখতে হবে মিশ্রণটা যেন কৃত্রিম না হয়, মিশ্রণের স্বতঃস্ফূর্ত তাগিদেই যেন মিশ্রণটি সাধিত হয়। 'অবলীলায়' কথাটি এই অর্থেই বিচার্য।

অন্যপক্ষে, পুরাতন লোকগীতিসমূহের কথা ও সুর সংরক্ষণের জন্য বিধিবদ্ধ চেষ্টা হওয়া উচিত। 'টেপ', গ্রামোফোন রেকর্ড, স্বরলিপি ইত্যাদির সাহায্যে যত বেশীসংখ্যক প্রাচীন লোকগীতি ধরে রাখা যায় ততই ভালো। ব্যক্তিগত চেষ্টায় এ কাজ হয় তো কথা নেই, কিন্তু কাজটা এতই বিশাল ও ব্যাপ্ত যে, কোনো সুগঠিত প্রতিষ্ঠান মাধ্যমে নিষ্পন্ন হলেই বোধহয় দায়িত্বটা সুষ্ঠুভাবে পালিত হওয়া সম্ভব। আমাদের দেশে এখনও এজাতীয় প্রতিষ্ঠানের অভ্যুদয় হয়নি। লোকযান সংস্থা (ফোক্‌লোর সোসাইটি) একাধিক আছে কিন্তু লোকসংগীত সংরক্ষণ সংস্থা আদৌ নেই। বছর পাঁচ-ছয় আগে অনুরূপ উদ্দেশ্যে এক সংস্থার জন্ম হয়েছিল এবং সে সংস্থার পক্ষ থেকে 'ফোক্‌লোর' নামে ইংরেজীতে একটি চমৎকার সংকলনও প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় সে সংস্থার কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। প্রতিষ্ঠানটিও সম্ভবত আর জীবিত নেই।

লোকসংগীতের সংরক্ষণের জন্য এইজাতীয় একটি সংস্থা অচিরে গড়ে তোলা আবশ্যক। তার থাকবে নিজস্ব টেপ ও রেকর্ডের লাইব্রেরী, স্বরলিপি সংগ্রহ, পুস্তকালয় ও প্রদর্শনী-গৃহ। প্রদর্শনী-গৃহে টেপ বাজিয়ে শোনানো হবে এবং মাঝে মাঝে খাঁটি লোকশিল্পীদের এনে গান গাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। লোক-সংগীতের সর্ববিধ গবেষণার সুযোগ এই সংস্থায় উন্মুক্ত থাকবে। মোট কথা, পুরাতন লোকগীতির আদর্শ নমুনার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য এই সংস্থা হবে একটি অপরিহার্য মিলনস্থল। লোকসংগীতের বিকৃতি বন্ধ করতে হলে এইজাতীয় এক বা একাধিক প্রতিষ্ঠানের উপযোগিতা কোনোমতেই অস্বীকার করা যায় না।

২

লোকসংগীতের বিকৃতির বিরুদ্ধে

হেমাঙ্গ বিশ্বাস

কিছুদিন আগে (১৭ জানুয়ারি) যুগান্তরে 'বাংলা লোকসংগীত : কয়েকটি সমস্যা' এই শিরোনামায় শ্রীনারায়ণ চৌধুরী যে সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধটি লিখেছেন, আমার কাছে এবং প্রত্যেক লোকসংগীতজ্ঞের কাছে তার গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমানে লোকসংগীতের প্রবক্তাদের তত্ত্বগতভাবে 'যুগোচিত মিশ্রণ বিরোধী বিশুদ্ধিবাদী' এবং 'অনিবার্য কালোচিত পরিবর্তন পক্ষপাতী' এই দুই পরস্পরবিরোধী শিবিরে বিভক্ত করে আমাকে প্রথম শিবিরের 'ক্রুসেডার' বলে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি কয়েকজন আকাশবাণী প্রচারিত পরিচিত লোকসংগীত শিল্পীকে দ্বিতীয় দলে ফেলেছেন। কিন্তু তাঁদের কোনো লিখিত তত্ত্ব বা বক্তব্য তিনি উপস্থিত করেননি। প্রবন্ধটি খুঁটিয়ে পড়লেই বুঝতে পারা যায় নারায়ণবাবু নিজেই দ্বিতীয় দলের তত্ত্ববিদ্ হিসাবে দাঁড়িয়েছেন। কাজেই অন্যদের ছেড়ে নারায়ণবাবুর নিজের বক্তব্যের সামান্য বিশ্লেষণ করবো।

'পরিবর্তনকামীদের' ব্রিফ হাতে নিয়ে নারায়ণবাবু প্রথমেই গ্রামীণ অর্থনীতির যে বিশ্লেষণ হাজির করেছেন তা হলো 'চারদিকে সমাজক্রান্তির হাওয়া বইছে। কৃষিকেন্দ্রিক গ্রামীণ সমাজের পুরনো কাঠামো ভেঙ্গে গিয়ে তার যায়গায় দেখা দিচ্ছে নতুন উৎপাদন-বিন্যাস—শ্রমজীবনের স্বরূপ যাচ্ছে বদলে। আজ কৃষির পাশে দেখা দিয়েছে নানা আকারের শিল্পোদ্যোগ, এমনকি গ্রামের মধ্যেও প্রবেশ করেছে এই নতুন শিল্পায়িতকরণের হাওয়া। উৎপাদন ব্যবস্থার রূপান্তরের ফলে গ্রাম আর শহরের পুরাতন সীমারেখা যাচ্ছে মুছে। গ্রামের লোক শহরে আসছে, শহরের লোক গ্রামে যাচ্ছে, এককালের প্রায়-বিচ্ছিন্ন দুই জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঘটছে হামেসা মিশ্রণ। একদা চাষাবাদ করত এমন কত মানুষ যে আজ শহরের কলেকারখানায় কাজ করছে তার লেখাজোখা নেই। এমন অবস্থায় লোকসংগীতের প্রাচীন রূপ হুবহু বাঁচিয়ে রাখতে বললেই তাকে হুবহু বাঁচিয়ে রাখা যায় না।'

ভারতের কৃষিসংকটের স্বরূপ সম্পর্কে নারায়ণবাবু যা বলেছেন অর্থনীতিবিদ্‌রা

কিন্তু তা বলছেন না। বিশ্ববিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ ডঃ লাডেজিন্স্কি থেকে আরম্ভ করে ন্যাশনেল স্যাম্পল সার্ভের রিপোর্ট (১৯১১-২৫) কিংবা সারাভারত কৃষক সভার সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট (১৯১১-২৫) প্রভৃতি থেকে আমরা যে বিশ্লেষণ পাচ্ছি তাতে পুরানো কাঠামোর ভাঙনের চিত্র থাকলেও মূল উৎপাদন ব্যবস্থার রূপান্তরের কোনো চিত্র পাই না। সামন্ত ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কগুলির ভিত্তির উপরেই জমি কেন্দ্রীভূত হচ্ছে এক শ্রেণীর বেনামী ও ধনী কৃষকের হাতে। জমিহারা ক্ষেতমজুরের সংখ্যা গত ১০ বছরে (১৯১৫-২৫) ১৫·৩ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২৫·৭৫ শতাংশ, কিন্তু তারা কলেকারখানায় নিযুক্ত হয়নি। দ্বীপের মতো কৃষিতে যে সামান্য ধনতন্ত্রী ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, তাতে 'উৎপাদন ব্যবস্থার রূপান্তরের' কোনো চেহারা পাওয়া যায় না। গ্রাম ও শহরের পুরাতন সীমারেখা মুছে যাচ্ছে বলে নারায়ণবাবু যে উক্তি করেছেন তা মোটেই তথ্যনিষ্ঠ নয়। এ বিষয়ে অকাট্য পরিসংখ্যান দিয়ে বিশ্বভারতীর 'এ্যাগ্রোইকো-নোমিক রিসার্চ সেণ্টাব'-এর শ্রীসুনীল সেনগুপ্ত যে মন্তব্য করেছেন তা প্রণিধান-যোগ্য। তিনি বলছেন মহানগরী কলকাতা ঔপনিবেশিক নগরী। এবং এই অতিকায় নগরী ধীরে ধীরে গ্রামে মিলিয়ে যাবার পরিবর্তে সহসা মহানগরী ও গ্রামগুলির মধ্যে এক গভীর ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। দুর্গাপুর সেই গভীর বিচ্ছেদকে জোড়া দিতে সামান্যই সক্ষম হয়েছে। উপসংহারে তিনি বলছেন, 'কাঠামোগত-ভাবে পৌরপ্রসার যখন পঃ বাংলায় অবরুদ্ধ, তখুনি পঃ বাংলার গ্রামগুলির শহরের মধ্যে বিস্তারিত হবার তাগিদ ও আকাঙ্ক্ষা তীব্রতম। এই দ্বন্দ্বের মধ্যেই আজ উপরিতল সমগ্র শিক্ষা সংস্কৃতি ও রাজনীতির কাঠামো পঃ বাংলায় মৌলিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে।' তিনি চমৎকারভাবে বলেছেন—নগরায়ণ অবরুদ্ধ হলেও নগরীপনা গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে। এই 'নগরীপনা'তেই নারায়ণবাবু তাঁর কালোচিত পরিবর্তন দেখতে পেয়েছেন।

শিল্পায়ন বা নগরায়ণ গ্রামাঞ্চলে হচ্ছে ধরে নিলেও সেই প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লোকসংগীতেরও পরিবর্তন ঘটতে থাকবে লোকসংগীতের ইতিহাস কিন্তু সে কথা বলে না। কোলকাতার ও উপকণ্ঠের কলকারখানায় বহু বছর যাবৎ বিহার ও উত্তরপ্রদেশের যে শ্রমিকশ্রেণী কাজ করে আসছেন তাঁদের মধ্যে যতোই ফিল্মী গানের প্রচলন হোক না কেন যখন তাঁরা কাজরী চৈতী বা হোরী গান করেন—তখন তার ঐতিহ্যবাহী সুরের ঢঙের যে বিশুদ্ধতা রক্ষা করে তা সত্যি

বিস্ময়কর। কৃষিভিত্তিক সমাজ থেকে সম্পূর্ণ উৎপাটিত হয়ে যারা প্রায় দেড়শ বছর আগে আসামের চাবাগানে শ্রমিক হয়ে গিয়েছিল, আজো এদের মধ্যে করম, টুসু, ঝুমুর ইত্যাদি যেভাবে প্রচলিত—তার সুরের সঙ্গে সীমান্ত বাংলার টুসু, করম, ঝুমুরের কোনো মৌলিক পার্থক্য সুরে নেই—যদিও কথায় অনেক যায়গায় চাবাগানের জীবনের টুকরো টুকরো ছবি মেলে।

নগরায়ণ দুরকমের। ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক। ধনতান্ত্রিক নগরায়ণে বহু জাতির লোকসংগীত বিলুপ্ত বা প্রায়-বিলুপ্ত হয়েছে কিংবা বিকৃত হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক নগরায়ণে আমরা দেখি এক ডায়ালেকটিক্যাল বা দ্বন্দ্ব-প্রগতিমূলক বিকাশ। একদিকে দ্রুত শিল্পায়ন অন্যদিকে পূর্বে অবজ্ঞাত ও অজ্ঞাত নৃগোষ্ঠী খণ্ডজাতি উপজাতি ও অধিজাতির লোকসংগীত তথা লোকসংস্কৃতির অভূতপূর্ব স্ফুরণ। সোভিয়েত মধ্য এশিয়া এবং চীনের দৃষ্টান্ত থেকে আমরা তা পাই।

নারায়ণবাবু স্বপক্ষে ডঃ হ্যানস্ মোদেকে হাজির করেছেন। লোকসংগীত বিষয়ক যে 'এ্যান্থোলজি'তে ডঃ মোদের বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে—আমি ছিলাম তার প্রধান সম্পাদক। জার্মান পণ্ডিত মোদে অকপটে আমাদের বলেছিলেন যে, লোকসংগীতের সমস্যা সম্বন্ধে তিনি কিছু বলার অধিকারী বলে নিজেকে মনে করেন না। তখন আমাদের অনুরোধে তিনি রূপকথা বা উপকথার ভূমিকা নিয়ে মূল্যবান আলোচনা করেন। কিন্তু পরিশেষে অতি আধুনিক যন্ত্রশিল্পসমৃদ্ধ জার্মানীতে লোকসংস্কৃতির ভূমিকা নিয়ে তিনি কিছু মন্তব্য করেন এবং বলেন 'আমার দেশ জার্মানীর অভিজ্ঞতা থেকে আমি যা বলছি অন্যদেশে তা প্রযোজ্য না-ও হতে পারে।' কিন্তু দুঃখের বিষয় নারায়ণবাবু ডাঃ মোদের কথাকে টেনে এনে বাংলাদেশে তা অত্যন্ত যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগ করেছেন।

ডঃ মোদের প্রবন্ধ আমরা ছাপলেও—শিল্পায়ন ও লোকসংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে আমি একমত ছিলাম না। পরবর্তী সময়ে পূর্ব জার্মানীর খ্যাতনামা লোকসংগীতজ্ঞা মাদাম জাল্‌দেতি যখন কোলকাতা আসেন তখন তাঁর সঙ্গে যতটুকু আলাপ আলোচনা হয়েছিল এবং তিনি যে কয়েকটি জার্মান লোকসংগীত উপস্থিত করেছিলেন তা ডাঃ মোদের ধারণার বিরোধী। আধুনিক শিল্পসমৃদ্ধ আমেরিকার ৫০ দশক থেকে যে লোকসংগীতের নবজাগরণ এসেছে তাতেই ডঃ মোদের বক্তব্য ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের সেই এ্যান্থোলজিতে প্রকাশিত বিশ্ববিখ্যাত আমেরিকার লোকগীতিকার পিট সিগারের ছোট্ট প্রবন্ধটি

মন দিয়ে পড়লে নারায়ণবাবু শিল্পায়ন ও লোকসংগীতের সমস্যা এবং তার পরিবর্তনের ধারাটি সম্পর্কে একটা ধারণা পেতেন।

জীবন প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে লোকসংগীতেও পরিবর্তন হচ্ছে। কিন্তু তার বিষয়বস্তু যেভাবে এবং যে গতিতে বদলায়—তার সুরের কাঠামো সেভাবে ও সে গতিতে বদলায় না। শুধু লোকসংগীত কেন রাগসংগীতের বেলাও নগবায়ণ বা শিল্পায়ন তার মৌলিক কাঠামোকে আঘাত করতে পারে না। লোকসংগীতের সুরে যে পরিবর্তন—তা অতি ধীর প্রবাহী, অন্তঃশীলা।

লোকসংগীতের পরিবর্তনেব যে সূত্রটি ১৯৫৪ সনে আমেরিকায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক লোকসংগীত সম্মেলনে বহু আলোচনার পর গৃহীত হয় সংক্ষেপে তা হল Continuity—Variation—Selection. অর্থাৎ ধারাবাহিকতা—বৈচিত্র্য—নির্বাচন। এককভাবে বা দলবদ্ধভাবে প্রচলিত ধারায় যদি কোনো বৈচিত্র্য আনা হয় তবে জনসমাজের গ্রহণ-বর্জনেব চালুনীতে ছাঁকাই হয়ে ধারাবাহিকতায় তা মিশে যায়। আদিবাসী সমাজ যখন সংহত কৃষি সমাজে রূপান্তরিত হয়েছে তখন বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীব মিলন সুবের গঠনও বদলেছে—ত্রিস্বরিক চতুঃস্বরিক সুর হয়েছে পঞ্চস্বরিক বা ঔডব। একটি বিশেষ নৃগোষ্ঠী একটি বিশেষ সুরের কাঠামেতে আত্মপ্রকাশ করে। তাদের মিশ্রণে সুরেও মিশ্রণ আনে যৌথ গ্রহণ-বর্জনে। আবার জনজীবনে যখন ধর্মকেন্দ্রিক নতুন সমাজসংস্কারমূলক বা অন্য কোনরকম আন্দোলন এসেছে তখন নতুন বিষয়বস্তুর সাথে সুরের ধারাবাহিকতাতেও বৈচিত্র্য এসেছে। এই ছোট্ট প্রবন্ধের পরিসরে সে আলোচনা সম্ভব নয়।

এই যুগে শ্রেণীচেতনাসম্পন্ন কৃষক আন্দোলনের হাত ধরে গণনাট্য আন্দোলন লোকসংগীতের সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এক রূপান্তর এনেছিল। বিহারের ভোজপুরী দেহাতী সুরে আমরা শুনলাম :

কেকরা কেকরা নাম বাঁতাউ
জগমে বড়া লুটেরোয়া-হো
মালিক আউর মহাজন লুটে
লুটে ঘুষখুরোয়া—হো। ·· ইত্যাদি

যাঁরা আমাকে পরিবর্তন বিরোধী বলে প্রচার করছেন—তাঁরা হয়ত জানেন না কিংবা জেনেও জানেন না যে, সে সময় গণনাট্য আন্দোলনে লোকসংগীতের

রূপান্তরের ক্ষেত্রে অতি সামান্য হলেও আমার কিছু দান আছে। আমার বেশ কিছু গান লোকসংগীতের অঙ্গ হয়ে বেঁচে আছে। 'সাবধানে গুরুজীর নাম লইওরে সাধুভাই'—ধরনের সারিগানে রূপান্তর এনেছিল 'কাস্তেটারে দিও জোরে শান, কিষাণ ভাইও' ধরনের সারিগান।

নারায়ণবাবু জসিমুদ্দীনের সাথে আমাকে পরিবর্তনবিরোধী দলে রেখেছেন। কিন্তু তা ঠিক নয়। জসিমুদ্দীনকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তিনি ওলাইচণ্ডী ও বনদুর্গার গ্রামবাংলার জন্য হাহুতাশ করেন—আমি তা করি না। আজকের এক তীব্রতর শ্রেণীসংগ্রামে আন্দোলিত গণজীবনের গর্ভে লোকসংগীত তথা জাতীয় সংস্কৃতির রূপান্তরের তাগিদ আমি লক্ষ্য করি। নারায়ণবাবু যে পরিবর্তন দেখছেন তা গণজীবনের তাগিদে আসেনি—আসছে ব্যবসায়ের তাগিদে। ধন-তান্ত্রিক চাহিদা ও সরবরাহের নিয়মে এই লোকসংগীত তৈরী হচ্ছে। নাগরিক কারখানায়—পাবলিসিটির বিশেষ লেবেল দিয়ে সবচেয়ে বড় কারখানাটি হলো আকাশবাণী। এই ভেজাল ব্যবসায়ের বহু পদ্ধতি আছে—উচ্চগ্রামে চীৎকার করে, বাদ্যযন্ত্রের হল্লাবাজী করে, আঞ্চলিক ভাষা ও উচ্চারণকে মার্জিত করে, গায়কী পালটিয়ে, সংগৃহীত গানের কথা সামান্য বদল করে নিজের নামে চালিয়ে, ঐতিহ্যবাহী সুর কারও রচিত গানে সংযোজিত করে—সুর অমুক, বলে নিজের নামে চালিয়ে—নানাভাবে এই ভেজাল ব্যবসা জমে উঠেছে। কিন্তু আজকাল সব ব্যবসায়েরই একটি বুলি বা তত্ত্বের প্রয়োজন হয়। সমাজতন্ত্রের তত্ত্বকথা বলে ধনতন্ত্র গড়তে হয়। লোকসংগীতের বিকৃতিও যুগোপযোগী পরিবর্তনের তত্ত্বের আশ্রয় নিতে চাইছে। আমার দুঃখ, শ্রদ্ধেয় নারায়ণ চৌধুরীর মতো একজন বিবেকবান নির্ভীক লেখক নিজের অজ্ঞাতে এই বিকৃতির তত্ত্ববিদ্ হয়ে উঠেছেন। তিনি পরিহাসছলে আমাকে বিশুদ্ধতার 'ক্রুসেডার' বলে আখ্যা দিয়েছেন। এই বিকৃতির বিরুদ্ধে 'বিশুদ্ধতার ক্রুসেডার' আখ্যা দিয়ে আমাকে যে কী সম্মানিত করেছেন—তা তিনি হয়ত একদিন উপলব্ধি করবেন। সেজন্য তাঁর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

পরিশিষ্ট—খ

[সংগীতে কথা ও সুরের তুলনামূলক অগ্রপ্রাধান্যের প্রশ্নে বাদবিতণ্ডা বহুদিনের। বিতর্কটির প্রাসঙ্গিকতা আজও অটুট। —লেখক]

"কথা ও সুর" এবং নারায়ণ চৌধুরী

শ্যামল সেন

তৌর্যত্রিকের ৩য় বর্ষের রবীন্দ্র সংখ্যায় "কথা ও সুর" প্রবন্ধটিতে নারায়ণ চৌধুরী সুর সম্বন্ধে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করেছেন। মতটি মূল্যবান। তিনি ঠিকই বলেছেন যে, "সংগীত তার সংজ্ঞানুযায়ী সুরপ্রধান হবে এটাই প্রত্যাশিত। বাংলা গানে কথার প্রভাব অত্যন্ত বেশী, চৌধুরী মহাশয় এ ব্যাপারেও তাঁর স্পষ্ট মত ব্যক্ত করেছেন, কথাকে আজ্ঞাবহ করে সুরকে প্রধান করতে বলেছেন তিনি। কিন্তু সুরকে প্রধান করতে বলে তিনি সেই সুরে দরবারী আমেজ আনতে চেয়েছেন—অলংকারের বহুল প্রয়োগ সমর্থন করেছেন। এদিক্ থেকে আমাদের কোন আপত্তি নেই। বাংলা গান হিন্দুস্থানী গানের মতো করে অনেক দিন থেকেই লেখা হচ্ছে এবং তাতে অলংকৃত সুরবিস্তারও ব্যবহার করা হচ্ছে,—রাগপ্রধান গানের সৃষ্টিই তো হয়েছে এই ভাবে। বস্তুত, আর্টের ক্ষেত্রে রূপের প্রাধান্য প্রত্যেকেই স্বীকার করতে বাধ্য।

কিন্তু—আর্ট অদ্বৈতবাদী নয়, এতে রূপও যেমন আছে, ভাবও তেমন আছে, সুতরাং রূপ প্রকাশের জন্য কথাকে অপ্রধান করে বা বর্জন করে সুরের বৈচিত্র্য প্রদর্শন যেমন গানের একটা দিক্, ভাব প্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতে কথার সঙ্গে সুরের অঙ্গাঙ্গী মিলনও তেমন আর একটা দিক্—যেখানে কথাগুলির বক্তব্যটিই প্রধান, যাকে সুর ফুটিয়ে তুলবার কাজে সহায়তা করে।

নারায়ণ চৌধুরী দরবারী সংগীতের ভক্ত। মানুষ জন্মসূত্রে, পরিবেশসূত্রে, অভিজ্ঞতাসূত্রে এক এক বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে; কিন্তু সেইটাই সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে, এ যুক্তি কি সমর্থনযোগ্য? নারায়ণবাবুর ভাল-লাগা, মন্দ-লাগা নিজস্ব ব্যাপার, সেই ব্যাপারটিকে সমস্ত বিষয়ে টেনে আনা কি সঙ্গত? হিন্দুস্থানী সংগীতেও তো যেমন ধ্রুপদ, খেয়াল আছে, তেমন ভজন

আছে, গীত আছে , যে যাব ক্ষেত্রে স্বকীযতা নিয়ে বিরাজ করছে, ধ্রুপদ তো বলছে না—"গীতকে আমাব অলংকাবে সাজিয়ে তুলতে হবে।" দরবারী সংগীতেব শরিক টপ্পাও তো বলে না "ধ্রুপদে মুরক-রেরক না লাগালে ন্যাডা ন্যাডা লাগে।"

দেখা যাচ্ছে, বহু প্রকৃতিব বিভিন্ন গান আছে যারা নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য নিযে অনন্য , তাদেব ভেঙেচুরে এক প্রকৃতিব করলে তাদেব বৈশিষ্ট্য চিরদিনের জন্য লোপ পায়। এতে আমাদের দিক থেকে স্বস্তির অভাব ঘটে—কারণ কোনও নির্দিষ্ট ভাল-লাগা, মন্দ-লাগাকে আমরা বায়াস হিসাবে গ্রহণ করিনি। আজও প্রাচীন মার্গ সংগীতের রূপ হাবিয়ে গিয়েছে ভেবে আমরা দুঃখিত হই, কি ছিল জানবাব জন্য আমাদের ব্যাকুলতা জ গে।

চৌধুরী মশায়ের হয়তো জাগে না, তাই তিনি সমস্ত বাংলা গানে স্বরবিহার চান। যেখানে কথা-বহুলতা আছে সেখানে ধ্রুপদের মতো আলাপ ও অলংকবণ আশা করেন ,—না হলে তিনি তৃপ্তি পান না।

বেশ তো তিনি যাতে তৃপ্তি পান তাই করুন। দববারী ভঙ্গীর গান লিখে স্বর সংযোজনা করুন—একটি নতুন গীতরীতির জন্ম হোক। কিন্তু যা আছে তাকে আর নষ্ট নাই-বা করলেন। নষ্ট বলছি এই কারণে যে, লেখক চেয়েছেন গাযকেব স্বববিহারের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা, আব নিবঙ্কুশ স্বাধীনতা মানেই বেশীবভাগ ক্ষেত্রে স্ব-কীযতা,—যথেচ্ছ অলংকরণ, অসমঞ্জস বিস্তার।

এ প্রসঙ্গে চৌধুরী মশায সর্বভারতীয় আদর্শের কথা তুলেছেন, বলেছেন "বাংলা গানের আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের নামে তাকে অতিরিক্ত সহজ-সরল করে তোলার চেষ্টার মধ্যে কাব্যপ্রেম প্রকাশ পেতে পারে, লোকসংগীতের আদর্শেব প্রতি অনুরাগ প্রকাশ পেতে পারে, কিন্তু ভারতীয সংগীতের ঐতিহ্যের বিরুদ্ধাচবণ করা হয।" "শিল্পী আপন খেয়াল-খুশী অনুযায়ী নতুন নতুন রসেব সংযোজনার দ্বারা গানকে লীলায়িত করে তুলবেন এইটেই ভারতীয় সংগীতের অভিপ্রেত আদর্শ।"

আমাদের জিজ্ঞাস্য—সর্ব ভারতীয় আদর্শ বলতে কি বুঝায়? স্বরকার যে স্বর দিয়েছেন তাকে ভেঙেচুরে যথেচ্ছ স্বর-সংযোজন? গানের সঙ্গে অবাধ স্বরবিহার? অফুরন্ত তানকর্তব? লেখক কি স্বীকার করেন না,—অক্ষমের হাতে, মিডিযকারের হাতে, ঐ স্বর-সংযোজন, স্বরবিহাব, তানকর্তব, ভাষা-সংগীতে কী

সর্বনাশ ডেকে নিয়ে আসে? ফর্ম্ বা রূপ কি এতোই ছেলে-খেলা? আর্কিটেক্চারের অ আ ক খ ভালো করে না শিখে আর্কিটেক্ট নাম নেওয়া অতি সহজ ব্যাপার, কিন্তু সৃষ্টির গাঁথুনিতে ফাটল হলে যে সৌধটিই ভেঙে পড়ে! গানকে অলংকৃত করলেই গান রসঘন হয়ে ওঠে? একটি মেয়েকে যে কোনো অলংকারে সাজালেই সে সুসম্পূর্ণ, অপরূপ হয়? লেখক তো বহু গুণীর গান শুনেছেন, একই রাগের বিভিন্ন রসের বা ভাবের গান শুনেছেন কি? সুরবিহার, সেই একই প্রকার তানকর্তব, সেই বাঁধা ছকের লয়কারী তেহাইও সুনির্দিষ্ট? লেখক বহু কন্যাকে সাজতেও দেখেছেন;—গৌরবর্ণ বা কৃষ্ণাঙ্গী, সবাই কি একই সাজে সেজেছে, পাশাপাশি চলেছে? সবাই কি অপরূপ হয়েছে?

প্রকৃত কথা—সাজাতে জানতে হয়, কিন্তু কজন জানে? "পিয়া নহী আয়ে"-তে যখন তানকর্তব শুরু হয় তখন তো দেখি পিয়া ভয়ে সন্ন্যাসী হয়ে হিমালয়ের গুহায় বসে আছে; "বসন্ত রুত আয়ী"-তে যখন ধ্রুপদের গমক ধমক-এর বর্ষণ লাগে তখন বসন্ত ঋতু কুঁকড়ে শীতে পরিণত হয়। এই মিডিঅক্রিটির কথাই তো রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন। যাঁরা সত্যিকারের স্রষ্টা তাঁদের সংখ্যা কটা? যোগ্যপাত্র সুরসংযোজন করবেন তাতে তো আপত্তি নেই!

কিন্তু—ভারতের আদর্শ কি সত্যই চৌধুরীমশায় যা বলেছেন, তাই? কোন্ আদর্শ? মুসলিম আমলের না হিন্দুযুগের? মার্গ সংগীতে পাছে এতোটুকু সুরচ্যুতি হয় সেই ভয়ে প্রবীণ গায়ককে আঙুল-এর সংকেতে প্রতিটি সুর বলে দিতে হত এবং তালের এতোটুকু খুঁত এড়াবার জন্য ঘাত-পাত-কলার ব্যবহার ও কর-তালের মাত্রাভিত্তিক আঘাত শোনাতে হত। কোথায় পেলেন গায়কের স্বাধীনতা? ঐতিহ্যের কথা ভুলেছেন না নারায়ণবাবু? এই ঐতিহ্যটুকুর খোঁজ করে দেখবেন কি? দেখবেন গানে কোনদিন স্বাধীন সুরবিহার ছিল না, —যা ছিল তা যন্ত্রে এবং ভরতের সময় থেকেই তার পত্তন হয়েছিল। এই ভরতের গ্রন্থখানি খুললেই দেখতে পাবেন, ভাষা কী ভাবে ছন্দের অধীন এবং এই ছন্দের পথ বেয়ে বেয়ে কি ভাবে সুর অনুগমন করছে;—স্বাধীনতা নেই, সুরকারকে নস্যাৎ করে "সম্পূর্ণ নতুন সুরে গেয়ে আনন্দ পাওয়া নেই"! বহুযুগ পরের সংগীত রত্নাকরের প্রবন্ধ অধ্যায়টিই খুলুন—দেখিয়ে দিন তো কোথায় স্বাধীন সুরবিহার আছে? ঐতিহ্যকে বিনাশ করেই আমরা আধুনিক

নতুন ঐতিহ্য গড়েছি,—কিন্তু সে-ই বা কত বছরের পুরানো ? ভরতের সময়ের যন্ত্রসংগীতের ইম্প্রোভাইজেশন্‌কে সংগীত রত্নাকরের আমলে, দেশীরীতির রূপকে একটু একটু করে স্থান দেওয়া আরম্ভ হয়। এই বস্তুটি অন্তত একশ বছর পরে ধ্রুব প্রবন্ধে স্থান পায় এবং তার ফলস্বরূপ ধ্রুপদে এসে বাসা বাঁধে। এই তো সুরবিহারের প্রথম ইতিহাস।

কিন্তু সে তো মুসলিম যুগের ব্যাপার। কর্ণাটকদের মতো মুসলিমদের দেশী সংগীত বা লোকসংগীতে গলা কাঁপানো একটা জাতীয় বৈশিষ্ট্য। সেই বৈশিষ্ট্য অলংকার নাম নিয়ে ভারতীয় ঐতিহ্যকে পরিবর্তিত করেছে। নইলে লেখক যাকে অলংকার বলেছেন তা অলংকার নয়—ভারতীয় অলংকার সম্পূর্ণ অন্য বস্তু যা রাগের রূপ রচনায় স্বাভাবিক ভাবে ব্যবহৃত হয়—গানের সুরেও হয়, যন্ত্রের গতেও হয়। বাকী যা দেওয়া হয় তা গমক। যাই হোক্, এই যে মুসলিম বৈশিষ্ট্য এ তো লোকসংগীতের বৈশিষ্ট্য এবং লোকসংগীত মানেই স্থানীয় সংগীত।

স্থানীয় সংগীত কেন অন্যস্থানের বা সর্বভারতীয় বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করবে ? কে বলেছে ধ্রুপদ, খেয়াল সর্বভারতীয় ? কর্ণাটকে এগুলি কি গাওয়া হয় ? বাংলায় কতদিন আগে এর প্রচার হয়েছে ? মহারাষ্ট্রে খেয়াল চর্চার বয়স কত ? মুসলিম শাসনে মধ্যদেশীয় স্থানীয় সংগীত ছড়িয়ে পড়বার সুযোগ পেয়েছিল, সহায়তা পেয়েছিল এবং তার মাঝে সাংগীতিক রঞ্জনা, সাংগীতিক চমৎকারিতা ছিল বলেই সে ক্রমে অপর প্রান্তে নিজের আসন কায়েম করে নিয়েছিল। সর্বভারতীয় বলে যা আমাদের ছিল তা বহুদিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, যা বেঁচে আছে তা নিরঙ্কুশ দেশী, স্থানীয় সংগীত।

স্থানীয় সংগীত নিজ বৈশিষ্ট্য রাখবেই,—না হলে সে আর স্থানীয় থাকবে না। ক্ল্যাসিকাল জন্মেছে এই স্থানীয়কে রূপান্তরিত করে। লেখকরা তেমন রূপান্তর চান, করুন না, কেউ তো আপত্তি করছি না। কিন্তু বাংলার গানকে বাংলার বৈশিষ্ট্য নিয়ে বাঁচতে দিন। স্থানের একটা মাহাত্ম্য আছে. জাতির একটা অনন্যতা আছে,—তাই জার্মানদের উচ্চারণ বা ভাষা ফরাসীদের মতো নয়, তাই আরবের জনসাধারণ অত কণ্ঠবর্ণ ব্যবহার করে, কর্ণাটিকরা অত মূর্ধ্বাজনিত অক্ষরের প্রাধান্য দেয়, তাই আরবীয় লোকসংগীতে অত আন্দোলন, কর্ণাটক লোকসংগীতে অত কম্পন, তাই বাংলা-বিহারে অত টান বা দম। এগুলো নিজস্ব ব্যাপার তাই বাঙালী ভাষাও চায়, সুরও চায় এবং দুটিকে সমান প্রাধান্য দিতে

চায়। কীভাবে প্রাধান্য দেবে সেটা তো সুরকারের কল্পনার উপর নির্ভরশীল। সে কল্পনা আপনার ভাল না লাগে আপনি গ্রহণ করবেন না, আমার ভাল লাগে আমি নেব। তাই বলে সে কল্পনাকে লঘু করবার আপনার অধিকার নেই, রাগ-সংগীতের সঙ্গে মিশিয়ে দেবার দাবীরও আপনার যৌক্তিকতা নেই। নিজে গান লিখুন, কাব্যাংশ ভাল আছে এমন গান জোগাড় করুন, রাগের বৈশিষ্ট্য যত পারেন যোগ করুন—আপত্তি নেই, কারণ আপনি বাংলাগানে ক্ল্যাসিকাল এলিমেন্ট্ পছন্দ করেন এবং তাকে কাজেও লাগাতে চান। কিন্তু বলব বাংলা গান অথচ হিন্দুস্থানী পোশাক দাবী করব এ হয় না। কর্ণাটক বলুন, রাজস্থান বলুন, আসাম বলুন, উত্তরপ্রদেশ বলুন, তাদের নিজস্ব গানে হিন্দুস্থানী রাগসংগীতের বৈশিষ্ট্য নেই। যাতে আছে তা ক্ল্যাসিকাল ও মিশ্র ব্যাপার। বাংলায় উচ্চাঙ্গ কীর্তনে তার সামান্য উদাহরণ পাওয়া যাবে। আধুনিক রাগপ্রধান গানেও তো ঐ বস্তুই আমদানী হয়েছে।

শেষ কথা, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে। কিছুকাল ধরেই দেখছি, লেখক সুযোগ পেলেই রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করছেন। কবি যে সুরকার হিসাবে অতি সাধারণ স্তরের হয়ে পড়েছিলেন সে কথাটা বার বার শুনিয়েও চৌধুরীমশায়ের আশ মিটছে না। "কথা ও সুর" প্রবন্ধ বাংলা গানের আলোচনা দিয়ে আরম্ভ করলেও লেখকের মূল লক্ষ্য ছিল কবির সুর-সংযোজনার সাধারণত্বের উপর। অন্য সুরকারকে বর্জন করে, এমনকি দিলীপ রায়ের শ্রদ্ধেয় পিতা দ্বিজেন্দ্রলালকে বাদ দিয়ে শুধু রবীন্দ্রনাথের ওপর এই ভাবে আক্রোশ প্রকাশের কোনো কারণ আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। সাদামাঠা গান প্রত্যেকেই লিখেছেন, কিন্তু—"রবীন্দ্রনাথ সুরকার হিসাবে বাংলা গানে যে আদর্শের প্রচলন করতে চেয়েছিলেন সেটি ভারতীয় আদর্শ সম্মত নয়, ওটি ইউরোপীয় সংগীতাদর্শের অনুসরণে গঠিত"; "এ গানে সাধারণ শ্রোতার মন ভরতে পারে, কিন্তু ভারতীয় রাগসংগীতের ঐতিহ্যপুষ্ট বিচক্ষণ শ্রোতার প্রত্যাশা স্পষ্টতই অতৃপ্ত থেকে যায়", "জানি এক্ষেত্রে অনেকেই এসকল গানের অসামান্য কাব্যসমৃদ্ধির প্রসঙ্গ উত্থাপন করবেন"; ইত্যাদি মন্তব্য করে রবীন্দ্রনাথের সাদামাঠা গানের সুরেরই বিরূপ সমালোচনা করেছেন।

এ সমালোচনা সার্থক হত, যদি রবীন্দ্রনাথ রাগপ্রধান গান লিখতেন; কিন্তু তিনি লিখেছেন খাঁটি বাংলা গান, এবং তিনি চেয়েছেন, সে গান রাগভিত্তিক

হয়েও রাগকে ছাপিয়ে বাংলার গান হোক। বাংলার গান চিরকালই ভাষা ও সুরের সমন্বয় করে চলেছে, তার জন্য ইউরোপের "রোসিতাতিভো"-র অনুকরণ করবার প্রয়োজন তাঁর হয়নি, কারণ বাংলা গানে ভাষার মূল্য চিরদিনই আছে, নতুন করে রবীন্দ্রনাথ সে দাম যোগ করেন নি। কাজেই তাঁর ওপর দোষারোপ করা অসমীচীন। তা ছাড়া, যখন গান হয় তখন কি ভাষার দিকে খুব বেশী নজর থাকে?—সুরই তো মন ভরে রাখে। লেখকের মন তাতে ভরেনি, এবং সেইজন্য আমাদের মতো রবীন্দ্রভক্তদের তিনি মিডিয়কার বলেছেন! ভাবপ্রবণতাই রবীন্দ্রগীতির বৈশিষ্ট্য সুতরাং আমরা দেখি ভাবটুকু কথা ও সুরে ঠিকমতো প্রকাশ পেয়েছে কিনা—কতটুকু অলংকার লাগল না লাগল তা লক্ষ করি না, [রবীন্দ্রনাথও করতেন না], তাই কি আমরা মিডিয়কার?

নারায়ণ চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার : প্রসঙ্গ সংগীত

প্রশ্ন। সেকালের কবিদের একটি জিনিস লক্ষ্য করা যাচ্ছে তাঁরা কমবেশি অনেকেই সংগীতচর্চা করতেন। এর কারণ কী ?

উত্তর। সেকালের কবিদের অনেকেই সংগীতচর্চা করতেন তার কারণ তাঁদের সময়ে কবিতা ও সংগীতের মধ্যে কৃত্রিম ব্যবধানের প্রাচীর গড়ে ওঠেনি, যা পরবর্তীকালে গড়ে তোলা হয়েছে। কবিতা ও সংগীত দুয়েরই মূলে আছে ধ্বনি—এই ধ্বনির যোগসূত্রে কবিতা ও সংগীত রূপকর্মের দিক থেকে আলাদা হলেও মূলত অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়েছিল। আগেকার কবিরা কবিতার সঙ্গে সংগীতের এই মৌলিক অভেদের কথা জানতেন। এখন কবিতাকে এক খোপে, সংগীতকে অন্য এক খোপে বিভাজন করে নেওয়া হয়েছে। এই বিভাজন ধ্বনিতত্ত্বের মূলসূত্রের বিরোধী, সুতরাং অস্বাভাবিক।

প্রশ্ন। রজনীকান্ত-অতুলপ্রসাদ-দ্বিজেন্দ্রলাল-নজরুল-রবীন্দ্রনাথ—এঁদের গানের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য কী ? পরস্পরের মধ্যে কোনো প্রভাব লক্ষ্য করা যায় কি ?

উত্তর। রজনীকান্ত-অতুলপ্রসাদ-দ্বিজেন্দ্রলাল-নজরুল-রবীন্দ্রনাথ এঁদের গানের বৈশিষ্ট্য এককথায় ব্যাখ্যা করে বোঝানো কঠিন। তবে সূত্রাকারে এইমাত্র বলা যেতে পারে যে, কান্তকবি রজনীকান্তের গান বাণীর দিক দিয়ে ভক্তিরসপ্রধান, সুরের দিক দিয়ে একরাগভিত্তিক প্রাচীন বাংলা গানের চালে রচিত। অতুল-প্রসাদের গানের বাণী রবীন্দ্রানুসারী কিন্তু সুর রবীন্দ্রনাথ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। অতুলপ্রসাদ বাংলা গানে সজ্ঞানত "লচা ঠুংরী" অর্থাৎ লক্ষ্ণৌ অঞ্চলের ঠুংরীর মেজাজ আমদানী করতে চেয়েছিলেন। ঠুংরীর সুরমিশ্রণ অবশ্য নয়, ঠুংরীর সূক্ষ্ম কারুকার্য যথা মীড়, খোঁচ, রুণ ইত্যাদির দ্বারা বাংলা সুরকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের গানের ভিত্তি ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপখেয়াল। ইউরোপীয় চার্চ মিউজিকের উচ্চাবচ স্বরক্ষেপের ভঙ্গীতে ভারতীয় রাগ-রাগিণীকে আশ্রয় করে

কোরাস গান রচনা তাঁর সংগীতসৃষ্টির আরেকটি লক্ষণীয় দিক। কাজী নজরুলের গান সুরে ভরপুর। এই সুর এসেছে উত্তর-ভারতীয় মুসলমানী সংগীত, যথা কাওয়ালি নাত গজল গীত হাল্কা চালের খেয়াল টপ্পা ঠুংরী কাজরী হোরী লাউনী প্রভৃতি অপরূপ সুরসমৃদ্ধ গানের ধারা থেকে। সবশেষে রবীন্দ্রনাথ। তাঁর গানের অবয়ব বাণী ও সুর উভয়ত ধ্রুপদের আঙ্গিকে গঠিত। মধ্য ও শেষ বয়সের গানে অবশ্য ধ্রুপদের ঋজু আদর্শ থেকে সরে গিয়ে দেশজ বাউল গানের সুর ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছিলেন তাঁর রচনায। রবীন্দ্রসংগীতে শিল্পীর (গায়কের) স্বাধীনতা কম, সেখানে সুরকারই সর্বেসর্বা। অন্য চারজনার গানের বেলায় তেমন নয়।

এঁদের পরস্পরের গানে যেটুকু মিল লক্ষ্য করা যায় সেটা একই ভাষাতে একই পরিবেশে একই ঐতিহ্যের অবলম্বনে রচিত গানে যা না ঘটেই পারে না। তবে একের উপর অন্যের উল্লেখযোগ্য প্রভাব তেমন আছে বলে মনে হয় না। বরং বেমিল অনেক।

প্রশ্ন। সম্প্রতি রবীন্দ্রানুরাগীদের মধ্যে কেউ কেউ প্রমাণ করবার চেষ্টা করছেন নজরুলের বাণী ও সুরে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব আছে। সে-সম্পর্কে আপনার মতামত কী?

উত্তর। নজরুলের বাণী ও সুরে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব আছে এ কথা যাঁরা বলেন তাঁরা রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলসংগীত এ দুয়ের কোনটাই জানেন না। রবীন্দ্র-সংগীত আর নজরুলগীতিতে আকাশ পাতাল পার্থক্য। আমি অল্প কথায উপরে পার্থক্যটি নিরূপণ করবার চেষ্টা করেছি, তবু আরেকবার বলি, রবীন্দ্রনাথের গান ধ্রুপদাঙ্গ-প্রধান, পক্ষান্তরে নজরুলের গানে খেয়াল-টপ্পা-ঠুংরী ইত্যাদি উত্তর-ভারতীয় হাল্কা চালের রাগসংগীতের আমেজটাই বেশী। রবীন্দ্রসংগীতে সুরের বিশুদ্ধি বেশী, মাদকতা কম। নজরুলের গানে ঠিক তার বিপরীত। রবীন্দ্রসংগীত ধ্রুপদাঙ্গ বিধায় কথাপ্রধান, আবৃত্তিভঙ্গিম (কখনও কখনও সুরে আবৃত্তি বলে ভ্রম হয়), সেই তুলনায় নজরুলের গানে সুরবিস্তারের অবকাশ অনেক বেশী। নজরুলের সুরের মাতোয়ারা ভাবটির কোন তুলনা হয় না। নজরুলের গানের প্রকৃতি রোমান্টিক।

এর বেশী এখানে আর কিছু বলা যাবে না। পাঠকদের মধ্যে যাঁরা সমধিক অনুসন্ধিৎসু তাঁরা আমার 'কাজী নজরুলের গান' বইটি নেড়েচেড়ে দেখতে পারেন। সেখানে রবীন্দ্রসংগীত আর নজরুলসংগীতের মধ্যে সুরগত পার্থক্যের

বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা আছে।

প্রশ্ন। ত্রিশের দশক থেকে শুরু করে স্বাধীনতার প্রারম্ভ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে নজরুলের গান রেকর্ড-রেডিয়ো এবং চলচ্চিত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। স্বাধীনতার কয়েক বছরের মধ্যে এমন কী কারণ ঘটল যার ফলে নজরুল আড়ালে পড়ে গেলেন। এমনকি তাঁর জনপ্রিয় রেকর্ডগুলোও বাজারে দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেল! এর জন্য দায়ী কে?

উত্তর। নজরুলের গানের জনপ্রিয়তা কমানোর মূলে কায়েমী স্বার্থের পোষকতা আছে এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। কায়েমী স্বার্থ বলতে এখানে আমি সংগীতের কায়েমী স্বার্থের কথাই বলছি, অন্যবিধ কায়েমী স্বার্থ নয়। আমার কেমন যেন মনে হয়, রবীন্দ্রসংগীতকে কেন্দ্র করে এদেশে বিবাট একটা স্বার্থচক্র গড়ে উঠেছে, যাকে ক্রমাগত পুষ্ট করে তুলছে গ্রামোফোন কোম্পানী, রেডিও, রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মিলিত প্রয়াস, একটি বাজারী পত্রিকার প্রচারক ভূমিকা। এঁদের যৌথ অভিযানের চাপে নজরুলগীতি একটা সময়ে কোণঠাসা হবার উপক্রম হয়েছিল কিন্তু সে গানের প্রাণশক্তি এবং সুরের ঐশ্বর্য এমন যে, তাকে বেশীদিন চেপে রাখা সম্ভব হয়নি। নজরুলগীতি তার নিজের জোরেই আবার বাংলা গানের জগতে তার প্রাপ্য স্থান অধিকার করে নিতে বসেছে। তাকে দাবিয়ে রাখা কঠিন।

প্রশ্ন। স্বাধীনতার পর থেকেই দেখা গেল নজরুলের জায়গা নিয়েছে রবীন্দ্রনাথের গান। কলকাতা সেন্টাব খুললেই দেখা যাবে রেডিয়োতে শতকরা ৮০ ভাগই রবীন্দ্রসংগীত বাজানো হয়। এর অর্থ কি নজরুলের জনপ্রিয়তা হ্রাস এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে রবীন্দ্রনাথই জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন? নাকি অন্য কোনো কারণ আছে?

উত্তর। আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্র খুললেই এই যে দেখা যায় সকাল দুপুর সন্ধ্যা অষ্টপ্রহর রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া হচ্ছে বা রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ড বাজানো হচ্ছে—এর মূলে আছে রবীন্দ্রসংগীতে যাঁদের স্থিতস্বার্থ নিহিত তাঁদের এবং রেকর্ড-ব্যবসায়ীদের হাত। রেডিও কর্তৃপক্ষ নিজেকে এঁদের স্বেচ্ছা-শিকারে পরিণত হতে দিয়েছেন। অথবা, এঁদের ধারণা, রবীন্দ্রনাথ যেহেতু বঙ্গীয় সংস্কৃতির অপ্রতিবাদ্য প্রধান পুরুষ এবং অসামান্য সৃষ্টিশীল কবি, সেই কারণে তাঁর গানও সেই সুবাদে সর্বাপেক্ষা অগ্রাধিকার লাভের উপযুক্ত সংগীত। এঁরা রবীন্দ্রনাথের

সর্বাতিশায়ী সৃজনী ব্যক্তিত্বের সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীতের তথ কথিত উৎকর্ষকে অহেতুক গুলিয়ে ফেলে গানের ক্ষেত্রে একটা উৎকট রকমের মাত্রাসাম্যের অভাবের সৃষ্টি করেছেন, যার সংশোধন হওয়া উচিত। আমাদের সমাজে রবীন্দ্রসংগীত অনেকেরই চোখে একটা 'স্ট্যাটাস-সিম্বল', আভিজাত্যের সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠার একটা বেশ সুবিধাজনক উপায়। রেডিওর কর্তারা জেনে না জেনে, বুঝে না বুঝে, তাঁদের আচরণের মধ্য দিয়ে এই ধারণাটিকে আবও বেশী মদদ্ দিয়ে চলেছেন।

প্রশ্ন। ভারতীয় সাংগীতিক ঐতিহ্যে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের গানকে আপনি কীভাবে স্থাপন করবেন ?

উত্তর। ২ আর ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই আমি আপনার এই প্রশ্নেরও উত্তর দেবার চেষ্টা করেছি। তবু আরও একটু যোগ করে বলি, ভারতীয় সংগীতের ঐতিহ্যে রবীন্দ্রনাথ হলেন রক্ষণশীল বিষ্ণুপুরী ঘরানার শাস্ত্র-ঘেঁষা ধ্রুপদ সংগীতাদর্শের ধারাবাহী একজন সুরকার ; অন্যপক্ষে নজরুল হলেন, অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যাকে বলেছেন "আমীরী সংগীত", মুঘল দরবারের আওতায় লালিত সৃষ্টিশীল রঙ-রসের গান, সেই ধারার সংগীতের একজন বিশ্বস্ত প্রতিনিধি। সুরের আবেদনের দিক দিয়ে বিচার করলে রবীন্দ্র-সুরে পাই স্বরগাম্ভীর্য, নজরুলের সুরে স্বরবৈচিত্র্য। তুলনায় নজরুলের সুরের চিত্তাকর্ষক ক্ষমতা বেশী। তবে বাণীর ঐশ্বর্যে রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই অপ্রতিদ্বন্দ্বী। রবীন্দ্রনাথের গানের বাণীর সূক্ষ্ম অনুভব, সৌকুমার্য, মাধুর্য, লালিত্য, চিক্কণতা ইত্যাদির তুলনায় নজরুলের গানের বাণী অপেক্ষাকৃত অমার্জিত, স্থূল সে-কথা মানতেই হয়। তবে ভারতীয় সংগীতে কথার ঐশ্বর্যকে কে কবে বেশী গুরুত্ব দিয়েছে ? গানের বিচারে সুরকানারাই কেবল কথা নিয়ে বেশী মাতামাতি করেন।

প্রশ্ন। সংগীতে 'কথা'র কি স্বতন্ত্র ভূমিকা নেই আপনার কাছে ? কেন, কথা ও সুরের সার্থক সমন্বয় হযেছে বলেই তো বোধকরি রবীন্দ্রনাথের গান বাঙালীর কাছে প্রিয় ?

উত্তর। গানের সৌষ্ঠব বিধানে কথার একেবারেই কোন ভূমিকা নেই একথা বললে আমার অরসিক বলে সোপর্দ হবার সম্ভাবনা আছে। আমি ততদূর পর্যন্ত যাব না। বিশেষত বাংলা গানের বেলায় তো নয়ই। তবে আমার কথা হলো, আলোচনাটা যখন গান নিয়ে হচ্ছে, আর সুরই যখন গানের প্রাণ, তখন

গানের উৎকর্ষ নিরূপণ-মুখ্যত সুরের মানদণ্ডে হওয়াই ভাল। অনেক সময় ভাল কথা ভাল গান হওয়ার পথে সহায়ক না হয়ে বরং বাধক হয়ে দাঁড়ায়। একটি গানের রচনা কবিতার মাপকাঠিতে উৎকৃষ্ট বিবেচিত হলেও সুরের বিচারেও উৎকৃষ্ট হবে এমন কোন কথা নেই। বরং বিপরীতটাই প্রায়শ সত্য হয়ে উঠতে দেখা যায়। উৎকৃষ্ট বাণীর সঙ্গে উৎকৃষ্ট সুরের একটা অহি-নকুল সম্পর্ক আছে বোধ হয়।

রবীন্দ্রনাথের গানে কথা ও সুরের সার্থক সমন্বয় সম্বন্ধে একটা মত বাংলার সংস্কৃতি-জগতে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই মতের অনুকূলে অনেক লিখেছেন। তিনি তাঁর গানে কথা ও সুরের সমন্বয়কে "গঙ্গা-যমুনা সংগমের" সঙ্গে উপমিত করেছেন ('সংগীত চিন্তা' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু এই "গঙ্গা-যমুনা" তত্ত্ব একটা কিংবদন্তী মাত্র। খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে, কোন গানে কথা ও সুরের অঙ্গাঙ্গী সামঞ্জস্য হলে সুর ক্ষতিগ্রস্ত হতে বাধ্য। কথার আধিক্যের ফাঁক গলে সুর সেখানে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারে না। কথাকে অতিমাত্রায় কুর্নিশ জানাতে গিয়ে সুরসেখানে ঠুঁটো হয়ে পড়ে—সে আর নিজেকে বিস্তার করবার অবকাশ পায় না। ফলে গোটা ব্যাপারটাই একটা সুরের আবৃত্তিতে পর্যবসিত হয়, যার ইঙ্গিত আমি আগের একটা প্যারাগ্রাফে করেছি।

এ বিষয়ে এখানে বিশদ আলোচনার সুযোগ কম। অনুসন্ধিৎসুদের আমি অনুরোধ করব তাঁরা যেন এবারকার 'সত্যযুগ' শারদীয়ায় প্রকাশিত সংলিখিত "ভারতীয় সংগীত, ইউরোপীয় সংগীত, রবীন্দ্রসংগীত" প্রবন্ধটি পড়ে দেখেন। (এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট—লেখক)। ওই প্রবন্ধে বর্তমান প্রসঙ্গের বিস্তারিত সমীক্ষণ আছে।

প্রশ্ন। রবীন্দ্রনাথের গানে শিল্পীর কোনো স্বাধীনতা নেই বলে শুনেছি। এটা ভালো কী মন্দ জানিনে। তবে একথাও ঠিক প্রতিভাবান শিল্পীর নিজস্ব সৃজনশীল গায়কী ভঙ্গি আছে। সেখানে সমস্যাটাকে তিনি কীভাবে সমাধান করবেন?

উত্তর। আমি আগেই বলেছি রবীন্দ্রনাথের গানে শিল্পীর স্বাধীনতা খুবই কম, প্রায় নেই বললেই চলে। রবীন্দ্রসংগীতের ছকের ভিতর সুরকারই মুখ্য, গায়ক একটি রাবার-স্ট্যাম্প মাত্র। সুরকারের নির্দেশিত সুরের রেখাচিহ্নের উপর দিয়ে অন্ধভাবে দাগা বুলিয়ে যাওয়াই রবীন্দ্রসংগীতের গায়কের কাজ, একটু এদিক-

ওদিক হলেই মহাভারত অশুদ্ধ। সুরকারের (কম্পোজার) কাছে সুর রূপায়ণকারীর (এক্সিকিউট্যান্ট) এইজাতীয় দাস্য ভারতীয় সংগীতের spirit-এর সম্পূর্ণ বিরোধী। এটি ইউরোপীয় সংগীতের আদর্শের অনুসারী ব্যাপার, ভারতীয় সংগীতের ঐতিহ্যে এর কোন সমর্থন নেই। কি কণ্ঠসংগীত কি যন্ত্রসংগীত— ভারতীয় ক্লাসিকাল সংগীত শিল্পীর স্বাতন্ত্র্যের আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে, সেখানে সুরকারের স্থান গৌণ।

রবীন্দ্রনাথের গানে এর ঠিক উল্টোটি চোখে পড়ে। তাই এই গানের অঙ্গনে দেবব্রত বিশ্বাসের মতো স্বাধীনতাপ্রিয় শিল্পীর জায়গা হয় না, কেবল মামুলী মাপের শিল্পীদেরই সেখানে ভিড়। বশ্যতা যাঁর যত বেশী তাঁর তত রবরবা। তবু যে এরই মধ্যে কোন শিল্পী একটু বেশী জনপ্রিয় হন, অন্য কোন শিল্পী একটু কম জনপ্রিয়, সে কেবল তাঁদের কণ্ঠস্বরের মাধুর্যের তারতম্যের কারণে। কারও গলা একটু বেশী মিষ্টি, কারও একটু কম। জনপ্রিয়তা ওরই দ্বারা নির্ধারিত হয়, অন্য কোন হেতু নেই এর পিছনে। ভারতীয় সংগীতে সুরের স্বাধীন বিস্তার ছাড়া সৃজনশীল গায়কী ভঙ্গি কথাটার অর্থ হয় না। সুতরাং রবীন্দ্রসংগীতের অনুষঙ্গে ওই কথাটার প্রয়োগযোগ্যতা কম বলে মনে করি।

প্রশ্ন। অনাদিবাবু, শৈলজারঞ্জনের গায়কী ঢঙ কী একরকম? তাহলে কণিকা ও সুচিত্রার সংগীত-পরিবেশন ভিন্নরকম কেন?

উত্তর। এ বিষয়ে আমার সঠিক ধারণা নেই। তবে ব্যক্তিগত শ্রুতিগত অভিজ্ঞতার নিরিখে বলতে পারি শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্রের সংগীত-পরিবেশনা রীতিতে যেটুকু ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায় তা তাঁদের কণ্ঠস্বরের বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতার কারণে। শ্রীমতী কণিকার গলা একটু সানুনাসিক হলেও সমধিক মিষ্ট ও পেলব; অন্যদিকে শ্রীমতী সুচিত্রার কণ্ঠস্বর বলিষ্ঠ, উচ্চারণ স্পষ্ট, আওয়াজের ভিতর একটা বোলন্দ্ বা rotund ভাবের আমেজ পাওয়া যায়, একটু পুরুষালি, যাতে তাঁর শিল্পী-ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। তবে গায়কীর কথা যদি বলা হয়, আমি এঁদের দুজনার একজনকেও পাসমার্ক দিতে রাজী নই। কারণ এঁদের গলা সুরবিস্তারের অনুপযুক্ত। লেপাপোঁছা ধরনের এঁদের গলা, গলায় কোন 'কাজ' নেই। এঁদের গান শুনলে মনে হয় না রাগ-রাগিণী সম্বন্ধে এঁদের গভীর কোন চর্চা আছে।

প্রশ্ন। রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে তাঁরই কাছে তালিম-প্রাপ্ত শিল্পীদের যে

পুরনো রেকর্ড পাওয়া যায় তার সঙ্গে আধুনিক গাইয়েদের রেকর্ডের কোন মিল পাওয়া যায় না কেন ? পুরনো গায়কীরীতিই শুদ্ধ, না আধুনিক রীতি ?

উত্তর। পুরনো গাইয়ে আর আধুনিক গাইয়েদের গাইবার ধরনে মিল নেই তার কারণ, পুরনো গাইয়েদের একাধিক জন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কিংবা কবির "গানের ভাণ্ডারী"-স্বরূপ দিনু ঠাকুর কিংবা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর কাছ থেকে সাক্ষাৎ শিক্ষাপ্রাপ্ত। আর এখনকার গাইয়েদের বেশীর ভাগই স্বরলিপি থেকে শিখে গান পরিবেশন করেন। প্রত্যক্ষশ্রুতিনির্ভর তালিম আর স্বরলিপিনির্ভর তালিমে স্বভাবতই প্রভূত পার্থক্য ঘটতে বাধ্য।

প্রশ্ন। দেবব্রত বিশ্বাস -বিতর্কে আপনার কী মতামত ?

উত্তর। দেবব্রত বিশ্বাসের রবীন্দ্রসংগীতের অতিরিক্ত বাঁধাবাঁধির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মনোভাবকে আমি শতমুখে তারিফ করি। তাঁর মতো স্বাতন্ত্র্যপ্রয়াসী নির্ভীক শিল্পী যদি রবীন্দ্রসংগীতের এলাকায় আরও দু'চার জন থাকতেন তো বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডের কর্তামোগিরি ঘুচে যেত। দেবব্রত বিশ্বাসের স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর অতি উচ্চাঙ্গের ছিল, তাঁর মতো এমন গম্ভীর অথচ সুমিষ্ট নিঃস্বনযুক্ত উদারার আওয়াজ পঙ্কজ মল্লিকের পর আর কারও হয়নি। তবে যে অভিযোগ আমি রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী মাত্রের বিরুদ্ধে কমবেশী করে থাকি, সে অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধেও প্রযোজ্য। তাঁর রাগের জ্ঞান মোটেই পাকা ছিল না, রাগসংগীতে তালিম ছিল না, গলায় 'কাজ' ছিল না। উদাত্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর তাঁর সম্পদ, কিন্তু ওই পর্যন্ত।

প্রশ্ন। সেদিনও পর্যন্ত কলকাতায় উচ্চাঙ্গ কণ্ঠ বা যন্ত্রসংগীতের অধিবেশন-গুলোতে একটি সর্বজনীন চেহারা ছিল। আজকাল আর সেগুলি তেমনভাবে আয়োজিত হচ্ছে না কেন ?

উত্তর। উচ্চাঙ্গ সংগীত সম্মেলনগুলি যে আজকাল আর তেমন জমছে না তার মূলে আছে রুচির অপকর্ষ। সবাই রবীন্দ্রসংগীতের আসর এবং / অথবা তথাকথিত আধুনিক গানের ওই কী বলে 'বিচিত্রানুষ্ঠান' না 'নাইট' তাই নিয়ে ব্যস্ত, কাজেই কেমন করে মিউজিক কনফারেন্সগুলিতে জোর ধরবে ? উচ্চাঙ্গ সংগীতের অনুশীলন আর অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকে কোনরকম গানেরই কোন ভবিষ্যৎ নেই এই সাদা কথাটা যতদিন না আমরা বুঝতে পারব ততদিন বাংলা গানের জগতে কমবেশী নৈরাজ্য চলতেই থাকবে। ভিত্ গাড়তে গেলে বনিয়াদ মজবুত করে

গাঁথা চাই। সেই বনেদেই গলদ, কেমন করে কী হবে?

প্রশ্ন। আজকাল রেডিয়োতে 'লঘু সংগীত' বলে একটা বস্তু আমদানি হয়েছে। সেটা কী?

উত্তর। রেডিওর 'লঘু সংগীত' হচ্ছে 'সুগম সংগীত' জাতীয় গান—যাকে বলে 'লাইট ক্লাসিকাল মিউজিক' সেই গোত্রের বস্তু। যেমন, নাত গজল ভজন কাওয়ালি কাজরী লাউনী বিহারী অথবা পাঞ্জাবী দেহাতী সুরের গান। এসব গান হাল্কা চালের হলেও সুরে ভরপুর। একজন স্ট্রীটসিঙ্গার কাঁধে ঝোলানো ভাঙা সিঙ্গল রীডের হারমোনিয়ম বাঁ-হাতে বাজিয়ে এইজাতীয় গানে যে-সুর তোলেন আমাদের পঞ্চাশটা ড্রয়িং-রুমের গান এক করলেও তাব সমান হয় না।

প্রশ্ন। আধুনিক সংগীতের ভবিষ্যৎ কী? বাণী, সুর এবং শিল্পীর সহযোগিতা এক্ষেত্রে কতখানি উপযোগী হচ্ছে?

উত্তর। এখনকার 'আধুনিক সংগীতের' কোন ভবিষ্যৎ নেই। বাজারে আজকাল আধুনিক সংগীত নামে যেগুলি চলে সেগুলিতে সুর বলে কোন বস্তু নেই। বিদেশী রক-অ্যাণ্ড রোল কিংবা পপ মিউজিকের ধরনে, কতকগুলি শব্দের কোলাহল মাত্র। সুরই গানের প্রাণ বা জান। স্বরূপত আধুনিক সংগীতের বিরুদ্ধে আমার কোন নালিশ নেই, তার সুরহীনতার সম্পর্কেই আমাব যা-কিছু আপত্তি। আধুনিক গান সুরসমৃদ্ধ হলে নিশ্চয় তাকে স্বাগত জানাতে দ্বিধা করব না।

প্রশ্ন। উচ্চাঙ্গ সংগীত, লোকসংগীতের সামাজিক প্রয়োজনীয়তা কীভাবে বিচার হবে?

উত্তর। কঠিন প্রশ্ন। এককথায় উত্তর দেওয়া শক্ত। উচ্চাঙ্গ সংগীত এবং লোকসংগীত দুটিবই সামাজিক প্রয়োজনীয়তা সবিশেষ। এবং প্রকৃতপ্রস্তাবে, এই দুটিই আসল সংগীত—মধ্যবর্তী স্তরের শ্রেণীরূপগুলি মিশ্র সংগীতের দৃষ্টান্ত মাত্র। উচ্চাঙ্গ সংগীত এবং লোকসংগীত, দরবারী সংগীত এবং হাঠ-মাঠ-বাটের সংগীত—এই দুই উৎস থেকেই আমাদের দু'হাতে উপকরণ সংগ্রহ করে মধ্যবর্তী শ্রেণীর গানের সুরকে সমৃদ্ধ করতে হবে। এই দুই প্রান্তীয় সংগীতের সামাজিক উপযোগিতার প্রশ্নটি এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বিবেচ্য।

প্রশ্ন। 'গণসংগীত' কাকে বলে? বাজারে গণসংগীত বলে যা প্রচারিত হচ্ছে তা কি গণসংগীত? সার্থক গণসংগীতের দৃষ্টান্ত দিন।

উত্তর। 'গণসংগীত' হলো সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শযুক্ত সম্মেলক গান। জাতীয় ভাবোদ্দীপক কোরাস গানের সঙ্গে এইখানেই এর পার্থক্য। আজকাল বাজারে যে ধরনের গণসংগীত প্রচারিত হচ্ছে তার ভাব আমার অপছন্দ না হলেও সুর একেবারেই পছন্দ নয়। বড়ই সাদামাঠা সুর এবং প্রায়শ শব্দের কোলাহল। গানের ছন্দে হেঁচকি দিয়ে দিয়ে ভাবের উত্তেজনা সৃষ্টি করবার চেষ্টা করা হয়। এই 'স্টাক্কাটো স্টাইল'-এর সুরে বড়জোর নৌকাবাইচের গান, ছাদ-পেটানো গান, কিংবা ফসল-কাটার গান গাওয়া চলতে পারে কিন্তু আরও গভীর ভাবের গান নয়। আমার বিবেচনায় গণসংগীতের সুরের কাঠামোয় রাগসংগীতের সুরের আরও বেশী ভর চাপানো উচিত। তাতে সুরেরও সমৃদ্ধি, ভাবেরও সমৃদ্ধি।

কিছু কিছু ভাল গণসংগীত রচনা করেছেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, সলিল চৌধুরী, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, পরেশ ধর প্রমুখ শিল্পিগণ।

প্রশ্ন। তথাকথিত ভক্তিসংগীতগুলির গীতিকাররা মনেপ্রাণে সাধকপুরুষ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সে-অর্থে সাধক ছিলেন না, তাহলে তাঁর ব্রহ্মসংগীত ও পূজাপর্বের আধ্যাত্মিক গানগুলির ব্যাখ্যা সমাজপবিবর্তনে বিশ্বাসী প্রগতিশীল মানুষ কীভাবে করবেন?

উত্তর। এটি একটু ভিন্ন ধরনের প্রশ্ন। আগেকার যুগের ভক্তিগীতির রচয়িতারা, যথা রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, দেওয়ান রঘুনাথ রায় প্রমুখ সাধক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন নিঃসন্দেহে। রবীন্দ্রনাথ সে-অর্থে সাধক পুরুষ না হলেও তাঁরও ভক্তিভাবের আকুতি কিছু কম ছিল না। তবে তাঁর ভক্তিভাবের গানগুলি কিছু অতিমাত্রায় পরিশীলিত, সুমার্জিত, সূক্ষ্মভাববাহী। ব্রহ্মসংগীত অপেক্ষা মধ্য বয়সের পূজা পর্বের গানগুলিতে এই সূক্ষ্ম অনুভবের কর্ষণা সমধিক লক্ষ্য করা যায়। এইসব গানের সরলতা, আন্তরিকতা গুণ যত না, তার চেয়ে বেশী তাদের ভাবসৌকুমার্য ও কাব্যসৌন্দর্য। বরং সরলতা ও আন্তরিকতা গুণে রবীন্দ্রসংগীতের উপরে রজনীগীতি ও অতুলগীতির জিত। এযুগে রজনীকান্ত হলেন আমাদের শ্রেষ্ঠ ভক্তিগীতিকার।

এই প্রশ্নোত্তরে আমি গানের সুরের দিকটাই মুখ্যত আলোচনা করলাম। প্রগতিশীলতা প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রশ্নটি আপাতত না হয় উহ্য থাকলো।

ধন্যবাদ।

—

নির্ঘণ্ট

(এই বইয়ে উল্লেখিত গীতিকার, সুরকার, কণ্ঠশিল্পী, যন্ত্রী ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নাম)

—